প্রতিচিন্তা

খতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

ষষ্ঠ বর্ষ ● দ্বিতীয় সংখ্যা ● ঢাকা ● এপ্রিল-জুন ২০১৬

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ : সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার ঢাকা-১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১

পরিবেশক : প্রথমা প্রকাশন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

প্রতি চিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ২০১৬

সম্পাদক
মতিউর রহমান, সম্পাদক, প্রথম আলো

নির্বাহী সম্পাদক
খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; ফেলো, পিপিআরসি

উপদেষ্টা পর্ষদ
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা পর্ষদ
নজরুল ইসলাম, ঊর্ধ্বতন অর্থনীতিবিদ, জাতিসংঘ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-বিষয়ক বিভাগ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
হাসান ফেরদৌস, জাতিসংঘে কর্মরত
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, প্রথম আলো

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

সহকারী সম্পাদক
খলিলউল্লাহ্ ও গোলাম মুস্তাফা

দাম : ৫০ টাকা
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : protichinta.com, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
April-June Issue, 2016; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 50 Taka
100 Kazi Nazrul Islam Avenue (CA Bhaban), Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81

সূ চি প ত্র

স ম্পা দ কী য় ৬

অ র্থ নী তি

দুর্নীতি, দুর্নীতির নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবর্তনের চালকেরা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ৯
নুরুল ইসলাম

নৃ ত ত্ত্ব

নিম্নবর্গের সমুদ্র-জিজ্ঞাসা ৭১
বাংলাদেশের সমুদ্র প্রতিবেশ, বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে
এক নিম্নবর্গীয় বয়ান
পাভেল পার্থ

আ ঞ্চ লি ক স হ যো গি তা

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী অববাহিকায় বাঁধ নির্মাণ প্রতিযোগিতা এবং পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ ৯৫
মোহাম্মদ আতিক রহমান

স মা জ চি ন্তা

ঢাকায় বাংলাদেশি নবীন এবং শিক্ষিতদের মধ্যে অভিবাসন আকাঙ্ক্ষা ১১৯
অ্যালেন ব্যাল

কালান্তরের ঘূর্ণিপাকে ১৪১
আবুল মোমেন

ব ই আ লো চ না

বাংলাদেশের স্বাধীনতার উৎসমূলে প্রতিবাদ ১৫৩
আসজাদুল কিবরিয়া

মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধাপরাধ ও জেনোসাইড : অমীমাংসিত বিষয় ও মানবতার দায় ১৬৭
মো. ফজলে রাব্বি

লেখক পরিচিতি ১৯০

সম্পাদকীয়

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্যের ওপর সরকারি দপ্তর ব্যবহার ও ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট দুর্নীতির প্রভাব সম্পর্কে বেশ আলোচনা চলছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ সেবাগুলো প্রদান করে, যার ওপর দরিদ্র জনগোষ্ঠী নির্ভরশীল। দুর্নীতি এসব সেবাকে বাধাগ্রস্ত করে এবং এসব সেবার মান ও পরিধি কমিয়ে দেয়। প্রাত্যহিক জীবনে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সরকারি যে সেবাগুলো লাভ করে তার অধিকাংশই দুর্নীতিগ্রস্ত, যার প্রভাব পড়ে সরাসরি মানুষের জীবনে। সরকারি সেবা খাতগুলোতে এই দুর্নীতি, ঘুষের লেনদেন এবং এর প্রতিবাদে জনপরিসরে দুর্নীতিবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিস্তৃত উঠে এসেছে নুরুল ইসলামের 'দুর্নীতি, দুর্নীতির নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবর্তনের চালকেরা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রবন্ধে।

বাংলাদেশ ২০১২ সালে মিয়ানমারের সঙ্গে এবং ২০১৪ সালে ভারতের সঙ্গে তার সমুদ্রসীমা-সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা ঘটায়। এরপর থেকে জাতীয় অর্থনীতিতে সমুদ্রের গুরুত্বের বিষয়টি পুনরায় আলোচনায় আসে। বাংলাদেশ নদীবিধৌত দেশ হলেও, এর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সমুদ্র নানা মাত্রায় সম্পৃক্ত। এই বিষয়গুলো বহুল আলোচিত। কিন্তু বিস্তীর্ণ হাওরাঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে সমুদ্রের সম্পর্ক কী? এদের অনেকেই কখনো সমুদ্র দেখেইনি, তারপরও তাদের সাহিত্য, জীবনাচরণ, ধর্ম, কৃষি এবং লোককথার সঙ্গে সমুদ্র মিশে আছে। নিম্নবর্গের এসব মানুষের জীবনাচরণে সমুদ্র সম্পর্কিত কল্পনার প্রতিফলনকে তুলে ধরেছেন পাভেল পার্থ। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম 'নিম্নবর্গের সমুদ্র-জিজ্ঞাসা : বাংলাদেশের সমুদ্র প্রতিবেশ, বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে এক নিম্নবর্গীয় বয়ান'।

১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে শুরু থেকেই বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে পানির ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করে আসছে। অন্যদিকে, গত মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে ফারাক্কার ফিডার ক্যানেলে পানির নাব্যতা কমে যাওয়ায় ভারতকে ফারাক্কার তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের ছয়টি ইউনিট বন্ধ রাখতে হয়। ফলে দেখা যাচ্ছে, গোটা বিশ্বের মতোই দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রগুলোতে পানিকেন্দ্রিক সংকট ক্রমেই প্রকট হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ এশিয়ার এই অঞ্চলে বিশ্বের মোট দরিদ্রের ৪০ শতাংশের বসবাস। বর্তমানে রাষ্ট্রগুলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দ্রুত শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে পানিসম্পদের ওপর অব্যাহত চাপ মোকাবিলা করছে। এই চাপ সামলাতে প্রতিনিয়ত হাতে নিচ্ছে নতুন নতুন বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা। এই বাঁধগুলো একদিকে বিদ্যুৎসহ কৃষিতে আমূল পরিবর্তন নিয়ে এলেও, ভাটির রাষ্ট্রগুলোর জন্য তৈরি করছে পরিবেশ ও প্রতিবেশগত নানান ঝুঁকির। এসব সংকট, দ্বন্দ্ব ও সম্ভাবনার বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন মোহাম্মদ আতিক রহমান। প্রবন্ধটির শিরোনাম 'গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী অববাহিকায় বাঁধ নির্মাণ প্রতিযোগিতা ও পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ'।

মেধাপাচার বা ব্রেইন ড্রেইন আলোচিত একটি বিষয়। সাধারণভাবে এটা বিশ্বাস করা হয় যে মেধাবীরা বাংলাদেশে থাকতে চায় না। তবে এর নেপথ্যের কারণগুলো সম্পর্কে সবার একটা সাধারণ ধারণা থাকলেও, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে তাদের কাঙ্ক্ষিত জীবনাচরণ এবং বাংলাদেশে বিরাজমান পরিস্থিতির মধ্যে বিদ্যমান বিরোধগুলো স্পষ্ট হচ্ছে। চাহিদা ও প্রাপ্তির মধ্যে অসামঞ্জস্যের ফলে দেশের সঙ্গে সম্পৃক্ততা হ্রাস পাচ্ছে এবং একই গতিতে অন্য দেশে চলে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বিষয়টির জটিলতা এবং গুরুত্ব অনুধাবন করে এই সংখ্যায় অ্যালেন ব্যালের 'ঢাকায় বাংলাদেশি নবীন এবং শিক্ষিতদের মধ্যে অভিবাসন আকাঙ্ক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধ ছাপা হলো।

মানুষের প্রয়োজনে এবং কালের প্রবাহে সমাজে পরিবর্তন ঘটে। সব পরিবর্তনের মতোই সমাজের পরিবর্তনেরও ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক থাকে। এই উপমহাদেশে তেমনই এক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল ইংরেজদের শাসন প্রবর্তনের পর। হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায় এই পরিবর্তনগুলোকে বিবেচনা করেছে তাদের নিজস্ব ঐতিহাসিক ও সামাজিক বাস্তবতায়। অন্যদিকে বর্তমানেও পৃথিবীব্যাপী এক বিপুল ও অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগছে অর্থনীতি, রাজনীতি, ভাষা, সংস্কৃতিসহ জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই। রবীন্দ্রনাথের সমাজ-ভাবনার আলোকে এসব পরিবর্তন এবং গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন আবুল মোমেন। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম 'কালান্তরের ঘূর্ণিপাকে'।

বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা হচ্ছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন-শোষণ থেকে স্বাধীনতা লাভ। তাই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমের বিশ্লেষণ সব সময়ই জাতীয় গুরুত্বের বিষয়। এরই ধারাবাহিকতায় *প্রতিচিন্তার* এই সংখ্যায় ছাপা হলো দুটি গ্রন্থ-আলোচনা। প্রথম গ্রন্থ-আলোচনাটি মোকাররম হোসেনের *ফ্রম প্রোটেস্ট টু ফ্রিডম : দ্য বার্থ অব বাংলাদেশ* নামক গ্রন্থটির। এই বই আলোচনায় একজন মুক্তিযোদ্ধা কীভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস এবং মুক্তিযুদ্ধকে দেখেছেন, তা উঠে এসেছে। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার উৎসমূলে প্রতিবাদ' শিরোনামের গ্রন্থ-আলোচনাটি লিখেছেন আসজাদুল কিবরিয়া। এর পরেরটি যুদ্ধাপরাধের বিচারসংশ্লিষ্ট। স্বাধীনতার ঠিক পরের কয়েক বছরে যুদ্ধাপরাধের বিচার বিষয়টি কীভাবে আলোচনায় উঠে এসেছিল তা এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়। 'পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের অসমাপ্ত বিচার আলেখ্য : প্রাকপর্ব' শিরোনামের গ্রন্থ-আলোচনাটি লিখেছেন মো. ফজলে রাব্বি।



দুর্নীতি, দুর্নীতির নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবর্তনের চালকেরা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

নুরুল ইসলাম

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্রীয় খাতে দুর্নীতি একটি বহুল আলোচিত বিষয়। এই দুর্নীতির উৎসমুখগুলো চিহ্নিত করার তাগিদ থেকেই প্রতিনিয়ত দুর্নীতি নিরূপণ এবং নিবারণের কৌশল খুঁজতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। সেই প্রচেষ্টারই ধারাবাহিকতায় এই গবেষণাভিত্তিক প্রবন্ধটি প্রাথমিকভাবে নীতিপত্র হিসেবে জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএস কর্তৃক ইংরেজিতে ছাপা হয়েছিল, যার অনুবাদ ছাপা হলো। এই প্রবন্ধে প্রবৃদ্ধি ও দুর্নীতির সামষ্টিক সম্পর্কের আর্থগাণিতিক বর্ণনার পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি এবং সুনির্দিষ্ট খাতের পারফরম্যান্সের ওপর এসব দুর্নীতির প্রভাব বিশ্লেষণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এটিকে দুর্নীতির প্রভাব বিশ্লেষণের এবং দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলপ্রসূ উপায় হিসেবে দেখা হয়েছে। সে জন্য দুর্নীতির ধারণা সূচকের মতো সমন্বিত দুর্নীতি নিরূপণ সূচকের পাশাপাশি প্রয়োজন পড়েছে অর্থনীতির সুনির্দিষ্ট খাতে দুর্নীতির ব্যাপকতা বোঝার জন্য সম্পূরক বিশ্লেষণের। এটি করা হয়েছে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মতামতভিত্তিক জরিপের ভিত্তিতে। দুর্নীতির সামগ্রিক বিষয়গুলো বোঝার জন্য প্রবৃদ্ধি ও দুর্নীতির সম্পর্ক, ঘুষের লেনদেন, উন্নয়ন প্রকল্পে দুর্নীতি, নির্বাচনে দুর্নীতি, সেবা খাতে দুর্নীতি এবং তৃণমূলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের মতো বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

দুর্নীতি, সেবা খাত, ঘুষ, দুর্নীতির সূচক, বাংলাদেশ, স্বচ্ছতা, নির্বাচন, মধ্যবিত্ত শ্রেণি, দুদক।

ভূমিকা : দুর্নীতি, প্রবৃদ্ধি এবং ন্যায্যতা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্যের ওপর সরকারি অফিস ব্যবহার ও ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট দুর্নীতির প্রভাব সম্পর্কে বেশ আলোচনা চলছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংখ্যাবাচক সূচক ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে দুর্নীতির প্রভাব বিশ্লেষণে কিছু গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। প্রবৃদ্ধির ওপর দুর্নীতির প্রভাব পরিমাপে পরিচালিত ১০০টি আর্থগাণিতিক গবেষণা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে : প্রথমত : সেগুলোর ৬২ শতাংশই পরিসংখ্যানগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়; দ্বিতীয়ত : ৩২ শতাংশ গুরুত্বপূর্ণ ও নেতিবাচক এবং ৩.৬ শতাংশ গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক।[১] এসব গবেষণায় ঘুষ কিংবা তহবিল তছরুপের মতো দুর্নীতির ব্যক্তিগত উপাদানগুলো বারবার ব্যবহৃত হলেও স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে রাষ্ট্রীয় সম্পদ দখলের মতো বিষয়গুলো সংখ্যাবাচক সূচকের অভাবে প্রায় বাদ পড়ে গেছে। কিছু গবেষণা দেখিয়েছে, দুর্নীতি ও প্রবৃদ্ধি নেতিবাচকভাবে সংযুক্ত। তবে এ দুটি বিষয়ের মাঝে যে সম্পর্ক সেটি কিন্তু অবধারিতভাবে বোঝাচ্ছে না একটির কারণে অপরটি ঘটছে। অধিকন্তু কোনটির কারণে কোনটি ঘটছে তা-ও নিশ্চিত না। উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দুর্নীতির মাত্রা কমাতে পারে। মানুষের আয়ের প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, জনগণের দিক থেকে দুর্নীতি দমনের জোর দাবি ছিল এবং একই সঙ্গে সরকারের কাছে যথেষ্ট সম্পদ ছিল দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং দুর্নীতি দমনের বিভিন্ন পদক্ষেপ প্রয়োগে নানা উদ্যোগ নেওয়ার। ব্যাপক দুর্নীতি সত্ত্বেও দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, এমন দেশের উদাহরণ ইতিহাসে রয়েছে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উঁচু হারের সঙ্গে মিলে উন্নয়নধর্মী সামষ্টিক ও খাতওয়ারি নীতিমালা উঁচু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে।[২] প্রবৃদ্ধির ওপর দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব যা-ই হোক না কেন, সাধারণভাবে তা মানুষের মাঝে দেখার মতো সে রকম কোনো উদ্বেগ তৈরি করেনি। এসব ক্ষেত্রে দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব অনেকটাই প্রশমিত হয়েছে বিনিয়োগের উঁচু হার এবং প্রবৃদ্ধিবান্ধব নীতিমালার মাধ্যমে। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরুদ্ধে তোলা এসব 'দাবি' পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

প্রবৃদ্ধি ও দুর্নীতির সামষ্টিক সম্পর্কের আর্থগাণিতিক গবেষণার পরিবর্তে অব্যাহতভাবে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি এবং সুনির্দিষ্ট খাতের পারফরম্যান্সের ওপর এসব দুর্নীতির প্রভাব বোঝার জন্য বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। এটিকে দুর্নীতির প্রভাব বিশ্লেষণের এবং দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণে ফলপ্রসূ পদ্ধতি হিসেবে দেখা হয়েছে। সে জন্য দুর্নীতির ধারণা সূচকের মতো সমন্বিত দুর্নীতি সূচকের পাশাপাশি দরকার পড়েছে অর্থনীতির কোনো সুনির্দিষ্ট খাতে দুর্নীতির

ব্যাপকতা বোঝার জন্য সম্পূরক বিশ্লেষণের, যেটি করা হয়েছে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মতামতের জরিপের ভিত্তিতে। দুর্নীতির ঘটনা (মাঝেমধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি বিভাজন) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মতামত জরিপের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সেবা খাতের দুর্নীতির ব্যাপকতা বিশ্লেষণের জন্য সংশ্লিষ্ট খাতের সেবা গ্রহণকারীর মতামতের ভিত্তিতে জরিপ করা হয়েছে। উৎপাদন খাতের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের মতামতের ভিত্তিতে জরিপ করা হয়েছে। এ খাতের ক্ষেত্রে যেসব আইনবিধি সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষমতার অপব্যবহারে উৎসাহিত করে এবং যেসব বিধি বেসরকারি বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করে, তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

একটু ভেঙে বললে বলা যায়, খাতওয়ারি দুর্নীতির একটি নমুনা হলো কর ফাঁকি, যা সরকারের সম্পদ কমায়। হারানো কর-আয় হয়তো কোনো উৎপাদনশীল প্রকল্পে বিনিয়োগ হচ্ছে। তবে, কর ফাঁকি প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত করে। কেননা অপর্যাপ্ত করের কারণে সরকার জনকল্যাণে সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে পারে না, যা কখনোই বেসরকারি খাত করে না। অধিকন্তু অবকাঠামো খাতে অপর্যাপ্ত সরকারি বিনিয়োগ উৎপাদনশীল খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করে।

একইভাবে প্রবৃদ্ধির ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তারকারী দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো খনিজ সম্পদ যেমন : তেল, গ্যাস ও কয়লা উত্তোলনের ও বণ্টনের নীতিমালা নিয়ে দুর্নীতি। প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন ও বণ্টনের এই অনুমতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ একচেটিয়া রেন্ট এবং মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা সৃষ্টি করতে পারে। দুর্নীতির কারণে সংশ্লিষ্ট ওই খাতের ওই একচেটিয়া রেন্ট বিনিয়োগের জন্য সরকারি খাতের সম্পদকে বঞ্চিত করে অনুমতি প্রদানকারী এবং অনুমতি গ্রহণকারীর মধ্যে বণ্টিত হয়। সরকারি ভূমির কেনাবেচার ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তারা যেসব নীতি তৈরি করেন, সেখানেও এ ধরনের ঘটনা ঘটে। কোনো ভূমি কেনা বা বেচার ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য বিধিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ দুর্নীতির সুযোগ রয়েছে। বর্ধিত জনসংখ্যার উন্নয়নশীল দেশে ভূমির মতো স্থিত সম্পদের বেশ চাহিদা থাকার কারণে ভূমির দাম বেশ চড়া এবং এ কারণে ভূমি কেনাবেচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এর ফলে এখানে ব্যক্তিগত লাভের জন্য সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে এবং একই সঙ্গে বিকল্প ব্যবহারের পরিবর্তে সম্পদের ভুল বণ্টন হতে পারে। ভূমি অধিকার, মালিকের নিরাপত্তা, ভূমি অধিগ্রহণ এবং এর ক্ষতিপূরণের সঙ্গে যে অনিশ্চয়তা জড়িত তা শিল্প, ব্যবসা এবং অবকাঠামোর বিনিয়োগে প্রতিকূল প্রভাব ফেলে।

সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতির কারণে অবকাঠামো এবং সেবায় নিম্ন মান লক্ষ করা যায়। এটা সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে জনকল্যাণ নিশ্চিত না করে ঘুষের সুযোগ সৃষ্টি করে। বৃহৎ প্রকল্প যেখানে সঠিক নজরদারি কঠিন, সেখানে দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়। টেক্সট বই প্রকাশনা বা শিক্ষকদের বেতনের মতো ছোট সরকারি প্রকল্পের চেয়ে প্রযুক্তি প্রতিরক্ষা পদ্ধতি বা অবকাঠামোগত প্রকল্পের মতো বড় প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঘুষ গ্রহণ তুলনামূলকভাবে সহজ। এভাবে বড় বড় প্রকল্পে বড় ধরনের বা 'পাইকারি' দুর্নীতি হয়, আর ছোট প্রকল্প যার বিনিয়োগ অনেক খাতে ছড়ানো থাকে, সেখানে হয় ছোট ছোট 'খুচরো' দুর্নীতি। ব্যবসা এবং বেসরকারি খাতের আচরণ নির্ণয়কারী অনুপুঙ্খ জরিপ নিশ্চিত করে, পুরো ব্যাপারটায় জড়িত গোপনীয়তা এবং ঘুষ গ্রহণকারী তার কথা রাখবে তা নিয়ে যে অনিশ্চয়তা রয়েছে সেটিকে বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, দুর্নীতি ব্যবসার ওপর একধরনের করের মতো, যা প্রকারান্তরে বিনিয়োগের প্রণোদনা কমায়। ঘুষ প্রদানকারীর অর্থাৎ ঘুষ যিনি প্রদান করছেন তাঁর তরফ থেকে চুক্তি বা সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কয়েক ধরনের অনিশ্চয়তা রয়েছে। একটি অনিশ্চয়তা হলো, কাকে ঘুষ দিতে হবে অর্থাৎ সরকারের কোন যথাযথ ব্যক্তিকে ঘুষ দিতে হবে। দ্বিতীয় অনিশ্চয়তা হলো, একটি চুক্তি বা অনুমোদন পেতে কী পরিমাণ ঘুষ দিতে হবে। যদি ঘুষ প্রদানকারী যথাযথ ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে না পারে কিংবা ঘুষের টাকার সঠিক অঙ্ক না জানে, তখন ঠিকাদারি চুক্তি সম্পন্ন করতে তাঁকে বেশ কয়েকজন ব্যক্তিকে বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ দিতে হয়। এটা কোনো একটি চুক্তি বা অনুমোদনের প্রদত্ত মূল্যের জন্য দুর্নীতির খরচ বাড়ায়। এর ফলে দুর্নীতির খরচ তুলতে গিয়ে প্রকৃত প্রকল্প ব্যয় বাড়ে যদি প্রকল্পের গুণগত মান ঠিক রাখতে হয় অথবা প্রকল্পের গুণগত মানে ঘটে বড় ধরনের পরিবর্তন, যদি প্রকল্পটিকে নির্ধারিত ব্যয়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়। সুতরাং অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় এসব ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগের প্রতিযোগিতামূলক চাহিদা থেকে সরকারি সম্পদ ভিন্ন খাতে যাওয়ার সুযোগ বেশি। অধিকন্তু ঘুষগ্রহীতার দিক থেকে ঘুষ প্রদানকারী চুক্তি মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়ন করবেন কি না এ ধরনের অনিশ্চয়তা থাকে। এই তিন ধরনের অনিশ্চয়তা কেন্দ্রায়িত স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থায় তুলনামূলকভাবে কম, এই ব্যবস্থা কোন ব্যক্তিকে কী পরিমাণ ঘুষ দিতে হয় সে-সংক্রান্ত দুর্নীতির চ্যানেল নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। ঘুষ গ্রহণকারী এবং প্রকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সঠিকভাবে চিহ্নিত হওয়ার ফলে টাকা প্রদানের মাধ্যমে চুক্তি নিশ্চিতভাবেই সম্পন্ন হয়। একই সঙ্গে এ রকম ব্যবস্থায় ঘুষ প্রদানকারী যদি প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যর্থ হন, তবে তাঁকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদান করা হয়। উঁচু প্রবৃদ্ধির দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ায়, এ ধরনের উদাহরণ রয়েছে। এসব দেশে বড় আকারের সরকারি

ক্রয় বা প্রকল্পের ভাগ্য সরকার/রাষ্ট্রপ্রধানের হাতেই থাকে। তাদের পক্ষে কাজ করার জন্য রয়েছে সুপরিচিত এজেন্ট। দক্ষিণ কোরিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় ঘুষ সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে দেওয়া হতো এবং চুক্তি সরকারের একবারে উপরের মহলে সম্পাদন করা হতো, তাই প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি ঠিকাদার বা ঘুষ প্রদানকারীর কোনো ধরনের শৈথিল্য বা বরখেলাপের ফলে তাকে ভোগ করতে হতো মারাত্মক পরিণতি : তাকে দেউলিয়া ঘোষণা থেকে কারান্তরীণ করা হতো। গণতন্ত্র এমনকি অর্ধগণতন্ত্রেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের হাতে থাকে। একই সঙ্গে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের আলাদা আলাদা কাজ থাকে। মন্ত্রীদের সমাজের বিভিন্ন অংশকে সন্তুষ্ট করতে হয়; সমাজের এই বিভিন্ন অংশ জাতিসত্তা, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা এবং আঞ্চলিক আনুগত্যের ভিত্তিতে প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্ক দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়। ফলে বহু প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী থাকে এবং প্রতি প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর আবার বহুসংখ্যক এজেন্ট থাকে।[৩] এ কারণে ঘুষ প্রদানকারীর দিক থেকে কাকে কী পরিমাণ ঘুষ দিতে হবে এবং ঘুষ গ্রহণকারী কথা অনুযায়ী কতটুকু কাজ করতে পারবেন, সে সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা থাকে। আর এ কারণে ঘুষ প্রদানকারী বহু এজেন্টকে বিভিন্ন পরিমাণ ঘুষ প্রদান করে থাকেন। সম্ভবত বড় বিনিয়োগ প্রজেক্ট/চুক্তির ক্ষেত্রে এসব দেশে সরকারপ্রধানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকে; কিন্তু তা নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সহযোগিতার ভিত্তিতে। এমনকি তারপরও সেখানে একটি চরম অনিশ্চয়তা থাকে যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা শেষ পর্যন্ত চুক্তিটি সম্পন্ন করতে পারবেন কি না।[৪] তবে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে ক. প্রজেক্টের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং খ. ঘুষ গ্রহণ করার ব্যাপারে কর্তৃত্বের মাত্রার তফাত আছে। কর্তৃত্ব যত বেশি বিকেন্দ্রায়িত থাকে, ঘুষ প্রদানকারীকে তত বেশি অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হতে হয় আর বেশি পরিমাণে দুর্নীতির ব্যয় বহন করতে হয়।

এসব ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যয় কমাতে অতিরিক্ত শর্ত হলো উন্নয়ন প্রকল্প যেসব চুক্তির সুনির্দিষ্ট শর্ত মেনে দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়িত হয়। এটি বিকেন্দ্রিক গণতন্ত্র বা আধা গণতান্ত্রিক দেশ, যেখানে ঘন ঘন নির্বাচন হয়, সেখানে নাও ঘটতে পারে; ফলে এসব দেশে উত্তরসূরি সরকার অনেক সময় ওই অদক্ষভাবে সম্পাদিত প্রকল্পের ফল ভোগ করে। আর এ ব্যাপারটিকে তুলনা করা হয়েছে ভবঘুরে ঠগের স্বল্পস্থায়ী দস্যুতার সঙ্গে পাড়ার মাস্তানের দীর্ঘস্থায়ী গুন্ডামির সঙ্গে।

এ প্রসঙ্গে প্রজেক্ট পর্যায়ে দুর্নীতির ক্ষুদ্র প্রভাব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করাটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হতে পারে। আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, দুর্নীতির ব্যয় উঠিয়ে আনার জন্য ঘুষ প্রদানকারীকে প্রকল্প ব্যয়ের সঙ্গে ঘুষের অর্থ যোগ করতে হয়। একটি অবস্থায় দেখা যায়, চুক্তির শর্তানুযায়ী প্রজেক্ট বাস্তবায়িত

হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সম্পদের হস্তান্তর সরকারি বাজেট থেকে ঘুষ গ্রহণকারী যিনি প্রকল্পের দায়িত্বে আছেন, হয়তোবা নির্বাচিত, তাঁর কাছে। ঘুষের মাধ্যমে এভাবে পাওয়া সম্পদ তিনি রিয়েল এস্টেট অথবা অন্য কোনো উৎপাদনমুখী উদ্যোগে বিনিয়োগ কিংবা সরকারি/বেসরকারি সিকিউরিটিজ/বন্ডে খাটান। অন্য কথায়, যে সম্পদ সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্পে ব্যবহৃত হতে পারত তা বেসরকারি বিনিয়োগে ব্যবহৃত হচ্ছে। যদি এই বেসরকারি বিনিয়োগের প্রতিদান বেসরকারি বিনিয়োগের চেয়ে কম না হয় তবে মোট সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতায় কোনো ক্ষতি নেই, সেই সঙ্গে মোট জাতীয় আয়েও কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। তবে অনেক সময় দেখা যায় ঘুষ গ্রহণকারী তাঁর ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় বাড়িয়ে দেন।[৫] এখন সরকারি সম্পদ বেসরকারি খাতে সরিয়ে নেওয়ায় সরকারি বিনিয়োগ কমে যাওয়ার কারণে এবং সেই সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বেসরকারি বিনিয়োগ না বাড়ার কারণে যদি মোট বিনিয়োগ কমে যায় (মানব উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ বাদে) আর দুর্নীতি বেড়ে যায়, তবে তা প্রবৃদ্ধির ওপর নেতিবাচক প্রভাব রাখে।

তবে, এসব ক্ষেত্রেই এটি দেখা যায় যে উন্নয়নের ওপর দুর্নীতির প্রভাবের কোনো অনুমিত উপসংহার নেই। এটি পুরোপুরি নির্ভর করছে ঘুষ গ্রহণকারী কীভাবে আত্মসাৎকৃত সম্পদ ব্যবহার করছেন সেসব পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর। তবে দুর্নীতির ব্যাপকতার কিছু স্পষ্ট ক্ষতিকর দিক রয়েছে। এর একটি হলো, যদি ঘুষ গ্রহণকারী ঘুষের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে বা সম্ভাব্য কর ফাঁকির উদ্দেশ্যে বাইরে পাচার করেন। তবে রেমিট্যান্সের মাধ্যমে এই সম্পদ দেশে ফিরে না এলে পুঁজির এ রকম স্থানান্তর প্রবৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে এর চেয়েও ক্ষতিকর দিক হচ্ছে যখন প্রকল্প অনুমোদন/ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিযুক্ত ঘুষ গ্রহণকারী শর্ত জুড়ে দিয়ে বলেন যে ঠিকাদার কোনোভাবেই নির্ধারিত প্রকল্প ব্যয় বাড়াতে পারবেন না এবং ঘুষের ব্যয় তাঁর নিজের পকেট থেকেই মেটাতে হবে; এ ক্ষেত্রে ব্যয় বাড়লেও তা ঘুষের মোট পরিমাণ থেকে কম হবে। দুটি ক্ষেত্রেই ঘুষের ব্যয় ঠিকাদার বা বেসরকারি বিনিয়োগকারীকে অংশিক বা পুরোপুরি বহন করতে হয়। তবে পরের ক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যয় ঠিক রাখতে গিয়ে নিচুমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের কারণে প্রকল্পের গুণগত মান বেশ কমে যায়। এর ফলে বিনিয়োগের প্রতিদান কমে যায় আর প্রবৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তৃতীয় দিকটি হচ্ছে যখন ঘুষ গ্রহণকারী সরকারি কর্মকর্তা স্বজনপ্রীতি এবং পক্ষপাতের বশবর্তী হয়ে প্রকল্পে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ঠিকাদার/বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের মধ্য থেকে ব্যবসায়িক ও ব্যবস্থাপনা সামর্থ্যের বিবেচনায় তুলনামূলকভাবে কম যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে নির্বাচন করেন। এর ফলে বিনিয়োগের প্রতিদান কমে যায়। প্রকৃতপক্ষে, স্বজনপ্রীতি এবং পক্ষপাতিত্ব

দুর্নীতির এমন ধরন, যা সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সততার বিরুদ্ধে কাজ করে।[৬] দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব কম রাখার জন্য খেয়াল রাখতে হবে সরকারি সম্পদ থেকে স্থানান্তরিত অর্থ যেন ব্যক্তির ভোগে বেশি ব্যয় না করা হয় বা বিদেশে পাচার না হয় অথবা সার্বিক প্রকল্পের গুণগত মানে যেন আপস করা না হয়। কাজেই, দুর্নীতি থাকা সত্ত্বেও যেসব দেশ এগিয়েছে তারা দুটি বিপরীতধর্মী লক্ষ্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে তা করতে পেরেছিল : ঘুষের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ এবং বিনিয়োগের সংখ্যা ও মানে দুর্নীতির প্রভাব কম রাখা। উন্নয়নের প্রতি দায়বদ্ধতা কম এমন দেশে দুর্নীতি সহাবস্থান করে 'বিনিয়োগে অদক্ষতা' আর 'বাইরে সম্পদ পাচারে'র সঙ্গে।

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ সেবাগুলো প্রদান করে, যার ওপর দরিদ্র জনগোষ্ঠী নির্ভরশীল। দুর্নীতি এসব সেবাকে বাধাগ্রস্ত করে এবং এসব সেবার মান ও পরিধি কমিয়ে দেয়। এটা শিক্ষার পরিমাণ ও মান হ্রাস করে। এটা পশ্চাৎমুখী কর হিসেবে কাজ করে, যা দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের জন্য খাঁড়ার ঘা হিসেবে নেমে আসে। সবচেয়ে দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য দুর্নীতি এসব সেবার সুযোগ সংকুচিত করে। সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী সরকারি সেবা যেমন: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, ক্ষমতা, পরিবহন ও সরকারি নানা বিধি ও আইনের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভোগে। যদি ঘুষ এসব সরকারি সেবা ও আইন বাস্তবায়নের সুবিধা পাওয়ার নির্ধারক হয়ে থাকে, তবে এসব জনগোষ্ঠী অসুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে, কারণ তাদের ঘুষ দেওয়ার সামর্থ্য সীমিত। অসাধুতার কারণে সরকারি সেবা হ্রাস পেলে, নিজেদের সম্পদ দিয়ে আত্মসাৎ হয়ে যাওয়া সরকারি সম্পদের ঘাটতি মেটানোর দায় গরিবদের নয়। সরকারি স্বাস্থ্য-শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে গরিবদের এসব সেবা পাওয়ার সুযোগ বেশ কম আর এ কারণে দুর্নীতির কারণে এসব সেবার সুযোগ ও মান কমে গেলে তার জন্য সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় গরিবেরা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিতি বা ডাক্তার কিংবা ওষুধ ছাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ক্ষেত্রে গরিব নন এমন পরিবার গরিব পরিবারের তুলনায় গৃহশিক্ষকের পেছনে ব্যয় ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় মেটানোর সামর্থ্য রাখেন। বাংলাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীরা গরিব শিক্ষার্থীদের তুলনায় ২ থেকে ৪ গুণ বেশি খরচ করতে রাজি। সমাজে গরিবদের অবস্থান দুর্বল হওয়ার কারণে তারা সেবা খাতের দুর্নীতির উন্মোচন আর প্রতিরোধে তেমন সক্রিয় হতে পারছে না। আর তাই সরকারি সেবা পেতে তাদের অপ্রাতিষ্ঠানিক খরচের মুখোমুখি হতে হয়।

যে সমাজে দুর্নীতি ব্যাপক, সেখানে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে টিকে থাকার জন্য সরকারি সেবার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তার তৈরি করা দুর্নীতি প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে হয়। সুবিধাবঞ্চিত লোকজন ঘুষ দিয়ে বা মর্যাদা কিছুটা বিসর্জন দিয়ে হলেও তাদের জীবিকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মকর্তা সব সময় দুর্নীতির একক উপকারভোগী হয় না। তাদের দ্বারা চুরি করা সরকারি তহবিল মাঝেমধ্যে কিছু দরিদ্র মানুষের আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করে। নির্বাচনী রাজনীতির কারণে রাজনীতিবিদদেরও তাঁদের অবৈধ সম্পদের ভাগ গরিবদের দিতে হয়।[৭]

২. বাংলাদেশে দুর্নীতি

বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের করাপশন পারসেপশন ইনডেক্স এবং বিশ্বব্যাংকের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ উভয় সূচকেই বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যতম দুর্নীতিপ্রবণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।[৮] এসব ধারণা সূচকের নিরপেক্ষতা, মান এবং এদের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। কারণ এসব সূচকের বেশির ভাগই নির্বাচিত কিছু জাতীয়/আন্তর্জাতিক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল। তবে, দুর্নীতির ক্ষেত্রে আমরা ধারণাকে বিবেচনায় না নিয়ে পারি না, কারণ দুর্নীতি কাগজে প্রমাণ রেখে করা হয় না। কিন্তু কিছু দুর্নীতি আমরা আবার পুরোপুরি পরিমাপ করতে পারি। যেমন মানুষ ঘুষের জন্য কত টাকা দেয় তা ধারণার বদলে পুরোপুরি পরিমাপ করা যায়। বিভিন্ন সরকারি খাতের নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং সরকারি ব্যয় কীভাবে করা হয়েছে, তার ওপর জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে আমরা আর্থিক অনিয়মগুলো যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে পারি। তবে এসব জরিপ প্রতিবেদন সহজেই আর্থিক অনিয়ম ধরতে পারলেও এর বড় সীমাবদ্ধতা হলো এসব অনিয়ম আদৌ দুর্নীতির ফল নাকি দুর্বল তদারকি ব্যবস্থার কার্যকরণের ফলে তৈরি তা নির্ণয় সম্ভব নয়।[৯] আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক তৈরি করা দুর্নীতির এসব ধারণা পরিমাপক সূচককে অন্যান্য গবেষণার মাধ্যমেও শক্তিশালী করা যায়। এদের মধ্যে রয়েছে সুশীল সমাজের সংস্থা, যেমন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও অন্যান্য থিংক ট্যাংক দ্বারা তৈরি করা জাতীয় জনমত জরিপসমূহ।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ভাষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ পরিচালিত অনুপুঙ্খ জরিপে যে উপাত্ত উঠে এসেছে তা অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের ব্যাপকতা নির্দেশ করে, আর এই জরিপটি করা হয়েছে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মতামতের ভিত্তিতে। ২০১০ সালের এ ধরনের জরিপের ফলাফল পরিশিষ্ট-১-এ দেখানো

হয়েছে। জরিপে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয় বিচার বিভাগে। জরিপ করা পরিবারগুলোর মধ্যে ৮৮ শতাংশ মানুষ, যারা বিচার বিভাগের সেবা গ্রহণ করেছে, তারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার। দুর্নীতির মাত্রা অনুযায়ী তারপরের অবস্থানে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী (৭৯ দশমিক ৬ শতাংশ) আর তারপর রয়েছে ভূমি প্রশাসন সেবা (৭২ দশমিক ২ শতাংশ)। একই সঙ্গে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে দুর্নীতির শিকার মানুষের হার যথাক্রমে ১৫ দশমিক ৩ শতাংশ এবং ৩৫ দশমিক ২ শতাংশ।

ঘুষ দেওয়ার ব্যাপকতা বিবেচনায় নিলে ৭১ দশমিক ৯ শতাংশ পরিবার সব ধরনের সেবা খাতে সেবা পেতে ঘুষ প্রদান করে থাকে। পর্যবেক্ষণে এটাও উঠে এসেছে যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সেবা পেতে সর্বোচ্চ হারে ঘুষ প্রদানে বাধ্য হয়েছে ৬৮ দশমিক ১ শতাংশ পরিবার। ঘুষের পরিমাণের দিক থেকে ভূমি ও বিচার বিভাগ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। এই দুই সেবা খাতে যথাক্রমে ৬৭ এবং ৫৯ দশমিক ৬ শতাংশ পরিবার ঘুষ বা অবৈধ অর্থ প্রদানে বাধ্য হয়।

সরকারের বিভিন্ন খাত আর সেবা খাত নিয়ে পরিবারগুলোর মতামতের ভিত্তিতে চালানো জরিপের বাইরেও গত কয়েক বছরে বেশ কিছু মূল্যায়ন হয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, যেমন সরকারি খাদ্য বণ্টন কর্মসূচির ওপর। এসব কর্মসূচির সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছাতে নয়ছয় হওয়া সম্পদের হিসাব, যা ভোগ করছে অনাকাঙ্ক্ষিত গোষ্ঠী, মোটামুটিভাবে দুর্নীতির হিসেবের সমান। উদাহরণ হিসেবে টানা যায় ১৯৮০-এর দশকের কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির কথা। ওই মূল্যায়নে এই খাদ্য কর্মসূচিতে সম্পদ নয়ছয়ের হিসাব ছিল ৩২-৫৫ শতাংশ। আর ১৯৯০-এর দশকে গ্রামীণ রেশনিং ও বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থায় চুরির হিসাব ৭১ থেকে ৯৮ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করেছিল। অবশ্য ওই দশকে গ্রামীণ গরিব গৃহস্থদের ভিজিডিপি কর্মসূচিতে অনিয়ম ছিল মাত্র ১৪ শতাংশ। আবার ২০০৫ সালে ভিজিএফ, ত্রাণ এবং অন্যান্য কর্মসূচি, দুর্নীতির হার ৩৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল।[১০]

এর বাইরে কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে মাথায় রেখে করা নগদ সহায়তা ও খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিতেও চুরির হিসাব ছিল। ২০১০ সালে ৪৯ শতাংশ পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কোনো কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য ঘুষ দিতে হয়েছিল। ৭৮ দশমিক ১ শতাংশ পরিবারকে তাদের প্রাপ্ত সহায়তার কিছু অংশ ঘুষ হিসেবে দিতে হয়েছিল; ১২ দশমিক ৩ শতাংশ পরিবার স্বজনপ্রীতির শিকার এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে ২০ দশমিক ২ শতাংশ পরিবারের এ ধরনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ সংকুচিত হয়েছিল।[১১]

সরকারি খাতের উন্নয়ন প্রকল্পে ঘুষের পরিমাণ বা সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক তহবিল তছরুপের প্রত্যক্ষ সংখ্যাগত প্রমাণ অবশ্য নেই। তবে ২০০৫-এর মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে চালানো জরিপে (উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে বাজেট-পূর্ব ও বাজেট-পরবর্তী বিতর্কের সময়) দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা, ভুল নিরীক্ষা, তহবিল পরিশোধ, যানবাহনের অপব্যবহারসহ নানা অনিয়মের ২১৯টি ঘটনা উঠে এসেছে।[১২]

২০০০-২০০৩ সালের কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে চুরির হার ছিল মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৩০ শতাংশ। ছোট প্রকল্পে বেশি হারে চুরি হয়েছিল ৩০-৪০ শতাংশ। আর বড় প্রকল্পের চুরির হার ছিল ১৫-২০ শতাংশ। গড় খরচ কম বলে সব ছোট প্রকল্পে চুরির হার বেশি ছিল, কেননা প্রকল্পের আকার যা-ই হোক না কেন কমপক্ষে একটি নির্দিষ্ট অংশ ঘুষ হিসেবে দিতে হতো। এ ছাড়া, ছোট প্রকল্পগুলোর অধিকাংশই দূরবর্তী এলাকায় ছড়িয়ে থাকায় সেখানে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা মুশকিল ছিল। এর ফলে ব্যাপক মাত্রায় সম্পদের অপব্যবহার হতো। বেসরকারি খাত এবং নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ও পরিদর্শন সংস্থার মধ্যে অবৈধ লেনদেনের খুব কমই হিসাব করা আছে।[১৩]

তবে তথ্য ও পদ্ধতিগত ভুলের কারণে এসব জরিপ একেবারে ত্রুটি ও অসংগতিমুক্ত নয়। তারপরও দুর্নীতির যে হিসাবগুলো পাওয়া যায় তাতে চোখ বোলালে দুর্নীতির ব্যাপকতা সেবা খাত ছাড়িয়ে বাণিজ্য ও শিল্পসংক্রান্ত নিয়মনীতি প্রয়োগে এবং সরকারি খাতের প্রকল্পগুলোতেও দৃশ্যমান হয়। এসব ফলাফল সাধারণত দেশের ভেতরে দুর্নীতি নিয়ে প্রচলিত ধারণাকেই সমর্থন করে।

বাংলাদেশে ব্যাপক দুর্নীতির ব্যাপারে দেশে-বিদেশে প্রচলিত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, এ দেশের দুর্নীতিতে তেমন কোনো স্বতন্ত্রতা নেই। পৃথিবীর অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে কিছু ক্ষেত্রে ব্যাপক মাত্রার দুর্নীতি রয়েছে। তবে উন্নত ও গরিব দেশের দুর্নীতির মাঝে কিছু পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার দ্বারা তৈরি করা বিভিন্ন দুর্নীতি সূচকে বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশগুলোর অবস্থান ক্রমসোপানে উপরের দিকে আর উন্নত দেশগুলোর অবস্থান নিচের দিকে। দ্বিতীয়ত, উন্নত দেশগুলোতে যে ধরনের দুর্নীতি দেখা যায় তা নিত্যপ্রয়োজনীয় দরকারি খাতে নয়, বরং আর্থিক খাত কিংবা বড় আকারের সরকারি ক্রয়চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উচ্চপর্যায়ের দুর্নীতি।[১৪] তারপরও, দুর্নীতির ব্যাপকতা বাংলাদেশের তুলনায় অনেক কম। সব ধরনের অর্থনৈতিক লেনদেনের বিচারে দুর্নীতির মাত্রা উন্নত দেশে কম। তৃতীয়ত, অধিকাংশ উচ্চ আয়ের দেশে আইনের শাসন আছে। একবার দুর্নীতি ধরা পড়লে বিচারের চেষ্টা চলতেই থাকে আর আইনের গতি শ্লথ হলেও তার খড়্গ অপরাধীর ঘাড়ে নামবেই।

ধরা পড়ার ও একবার ধরা পড়লে শাস্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় আইনের শাসন দুর্নীতি প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। উন্নত দেশে দুর্নীতির কারণে ব্যবসা, রাজনীতি ও শিল্পজগতের অনেক উচ্চপর্যায়ের নক্ষত্রের পতন ঘটেছে এবং শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে।

এমনকি প্রতিবেশী দেশ ভারতেও রাজনীতিবিদ এবং প্রশাসকদের দুর্নীতির দায়ে কারাবাসসহ কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়েছে, সম্ভবত তাদের যা প্রাপ্য তার চেয়ে অনেক কম সাজা তাদের ভোগ করতে হয়েছে। অনেক মন্ত্রীকে এ কারণে পদত্যাগ করতে হয়েছে এবং জনরোষে পড়তে হয়েছে। এটা অবশ্য সত্য যে ভারতে সংসদের নিম্নকক্ষের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যই কোনো না কোনো ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত।[১৫] কিন্তু তাঁরা তাঁদের অপরাধ স্বীকার করেননি এবং কোনো ধরনের শাস্তি পাননি এবং যতক্ষণ তাঁরা দণ্ডিত না হচ্ছেন ততক্ষণ তাঁরা সংসদীয় দায়িত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে, তাঁরা জনগণের আস্থার সংকটে ভুগছেন। এমনকি চীনের মতো কর্তৃত্ববাদী দেশও সেখানে বড় আকারের দুর্নীতি থাকার কথা স্বীকার করেছে। সাম্প্রতিক নেতৃত্ব (২০১৩) দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধকে তাদের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে। চীনে ইতিমধ্যে কিছু উচ্চপর্যায়ের দুর্নীতির ক্ষেত্রে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তথাপি দেশটির অগণতান্ত্রিক প্রকৃতি ও পার্টির উঁচুতলার সঙ্গে সরকারনিয়ন্ত্রিত এমনকি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যোগ থাকায়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা পার্টির উঁচুতলা পর্যন্ত পৌঁছায়নি। তবে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে দুর্নীতি সাম্প্রতিক সময়ে গভীর নজরদারির মধ্যে রয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে দোষীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে।

এটা উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশে সরকার বা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে খুব কম সংখ্যক হর্তাকর্তাকে দুর্নীতির অভিযোগে বিচার ও শাস্তি দেওয়া হয়েছে। ২০০৭-২০০৮ সালের সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাববায়ক সরকারের আমলে কিছু উচ্চপর্যায়ের রাজনীতিবিদ এবং আমলার দুর্নীতি চিহ্নিত হয়েছিল এবং তাঁদের বিচার শুরু হয়েছিল। কিছু বিচার নিষ্পত্তি হয়ে দোষীরা শাস্তিও পেয়েছিল।[১৬] তবে, মনে রাখতে হবে প্রতিরক্ষা ক্রয় যা কিনা ব্যাপক দুর্নীতির ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত, সামরিক এবং বেসামরিক কোনো সরকারের আমলেই সেভাবে নজরদারিতে আসেনি।[১৭] অবশ্য বাংলাদেশে কয়েকটি নির্বাচিত সরকারের সময়ে উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা বা রাজনৈতিক নেতার এ খাতে দুর্নীতির জন্য বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছিল। তবে তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বিরোধী দলের এবং ক্ষমতাহীন দলের সংসদ সদস্য। যখন তাঁদের দল আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে তখন তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছিল আর যাঁদের বিচার ও শাস্তি হয়েছিল তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে এটি বলা যাবে না বিরোধী দলের লোকজন অপরাধের সঙ্গে

জড়িত ছিলেন না। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের গুরুত্বপূর্ণ বা উচ্চপর্যায়ের নেতারা ব্যাপক মাত্রায় দুর্নীতি করলে দল ক্ষমতায় থাকলেও তাঁদের বিচার ও শাস্তি হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনায় বিরোধী দলের সদস্যদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে, এমনকি সত্যিকারের দুর্নীতি হলেও। ফলে জনগণের মাঝে এ ধারণা জন্মেছে এগুলো মূলত করা হয়েছে রাজনৈতিক হয়রানির উদ্দেশ্যে, দুর্নীতির বিচারের জন্য নয়। এমনকি যেসব ব্যবসায়ী রাজনৈতিক দলগুলোকে চাঁদা দিয়ে থাকেন, সেসব দল ক্ষমতায় থাকাকালে এসব ব্যবসায়ীকে আইন অমান্য করার জন্য কখনো বিচারের মুখোমুখি হতে হয়নি।

খুব কম ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হওয়ার কারণে তদন্ত হয়েছে এবং যদি কখনো তদন্ত হয়ও তবে কিছুদিন পর তাঁদের নির্দোষ পাওয়া যায়। কিছু ক্ষেত্রে বিচারে তাঁদের শাস্তি দেওয়া হলেও অল্প সাজা খেটে তাঁরা বেরিয়ে আসেন। সুতরাং এখানে ব্যাপক জন-উপলব্ধি আছে যে প্রতিটি দলই তার সদস্য বা সমর্থকদের বাঁচাতে চায়। যেহেতু কোনো রাজনৈতিক দলই পরপর দুই মেয়াদের জন্য বাংলাদেশে নির্বাচিত হয়নি, সেহেতু দুই রাজনৈতিক দলেরই মিউজিক্যাল চেয়ারের এই খেলায় একে অপরের সমর্থকদের অভিযুক্ত করার নজির রয়েছে। ফলে, রাজনৈতিক সংস্রব যা-ই হোক না কেন দীর্ঘমেয়াদে বড় আকারের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত কাউকেই শাস্তি পেতে হয়নি। যদি উপরের বিশ্লেষণটি সঠিক না হয় বা পক্ষপাতমূলক হয় তবে অন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশকে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত, যেখানে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় রাজনীতিবিদেরা কম দুর্নীতিপ্রবণ। এটা এমন একটি বিষয়, যা অধিকতর অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্লেষণ দাবি করে। তবে দেশে সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে যে ধারণা প্রচলিত তা অন্য রকম। রাজনীতি ও জনসংযোগে মানুষের ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যদি তা ব্যাপক ও সংগতিপূর্ণ হয়। মাঝেমধ্যে এটা বাস্তবতার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য রাজনীতিবিদদের অসাধারণ কিছু পদক্ষেপ নিয়ে এসব ধারণা ভাঙাতে হয়। কেউ হয়তো বলতে পারেন যেসব রাজনীতিক মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত জীবন আর রাজনৈতিক ক্ষমতা পেতে চান, এ জোয়ালের ভার তাঁদের কাঁধে নিতেই হবে। আর আমরা জানি একজন 'সতী সাবিত্রীকে অবশ্যই সব ধরনের সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকা উচিত'।

বাংলাদেশে পোশাকশিল্প সরকারি কর্মকর্তা এবং ব্যক্তি শিল্পপতির মধ্যে আঁতাতের দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হয়। এখানে আমলাতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক উভয় ধরনের দুর্নীতির উপাদান আছে।[১৮] পোশাকশিল্পের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আর্থিক/কর সুবিধা পেতে ও সরকারি নানা বিধি পালন এড়াতে পোশাকশিল্পের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয়

ক্ষমতাকে প্রভাবিত করার অভিযোগ রয়েছে।[১৯] ২০০৬ সালের পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তাদের মাঝে চালানো এক জরিপ বলছে, ৭৫ জনের মাঝে ৫০ জন শিল্পপতি বিভিন্ন সময়ে সংসদ সদস্য ছিলেন এবং তাঁদের অনেকেই মন্ত্রীও ছিলেন। অনেক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা এবং জ্যেষ্ঠ সেনাকর্মকর্তা অনেক পোশাক কারখানার মালিক ছিলেন বা আছেন। এটা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে যেকোনো ব্যক্তি যে কি না বাংলাদেশে 'কিছু একটা' ছিল কোনো না কোনোভাবে রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্পের সঙ্গে জড়িত। অধিকন্তু, পোশাকশিল্পের মালিকেরাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যাংকের অংশীদার। দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশে এ শিল্পের গুরুত্বের কারণে খরচের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিধি পালন করা থেকে পোশাকশিল্পের মালিকেরা ঘুষ দিয়ে অব্যাহতি পাচ্ছেন।[২০] দেশে পোশাকশিল্পে উচ্চ মুনাফা এসেছে মূলত ক. এর নিম্ন শ্রমব্যয়, আর খ. মজুরি ও কাজের পরিবেশ, কারখানা ভবনের নিরাপত্তা মান নিয়ে নজরদারির অভাবের কারণে।[২১] ক ও খ-এর কারণে উৎপাদন খরচ থেকে বাঁচানো অর্থের কিছুটা আবার গেছে এসব নিয়মনীতির বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা সরকারি কর্মকর্তাদের পকেটে বিভিন্ন ধরনের ঘুষ হিসেবে। অন্যান্য শিল্পের মতো পোশাকশিল্পকেও ভুগতে হয়েছে অপর্যাপ্ত ও অদক্ষ অবকাঠামো আর বিভিন্ন ধরনের বিধির জন্য, যা লাইসেন্স ও অনুমতি পাওয়ার ফি-ই শুধু বাড়িয়েছে। আর এসবই ব্যবসার খরচ বাড়াতে ভূমিকা রেখেছে। রাজনৈতিক প্রভাব ও ঘুষের মাধ্যমে তাঁরা এসব প্রতিবন্ধক জটিল বিধিবিধান এড়াতে পেরেছেন। আর সীমিত অবকাঠামো সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জ্বালানি সরবরাহ পেয়েছেন।

গার্মেন্টস মালিক ও আইন প্রয়োগকারীদের মধ্যে আঁতাতের সুযোগ ও প্রণোদনার ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ক. কাজের পরিবেশ ও খ. ভবনের কাঠামো নিরাপত্তা নিশ্চিতের নজরদারির অভাবের মধ্য দিয়ে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ ধরনের নিয়মনীতি না মানার ফলে একের পর এক অগ্নিদুর্ঘটনা আর ভবনধসের ঘটনা, ২০১৩ সালের আলোচিত রানা প্লাজা ধস, বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।[২২] বিশেষ করে, বিদেশে আমদানিকারকদের এবং নানা শ্রম অধিকার রক্ষাকারী সংগঠনের, যারা দেশের ভেতর তুলনামূলকভাবে দুর্বল কিন্তু বাইরের দেশগুলোতে শক্তিশালী।

৩. দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ

দুর্নীতি দমনের জন্য দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্নীতি ঘটে থাকলে শাস্তি প্রয়োগ শাসনব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত শাসনের একটি সুনির্দিষ্ট অংশের মধ্যে রয়েছে প্রতিবাদ ও

জবাবদিহি, আইনের শাসন এবং সরকারের কার্যকারিতা।[২৩] প্রতিবাদ ও জবাবদিহি উপাদানের ভেতর রয়েছে জনগণের অংশগ্রহণে সরকার নির্বাচন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, বাক, সংবাদমাধ্যম ও সংগঠনের স্বাধীনতা, বহুদলীয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে রাজনৈতিক বহুত্ববাদ ইত্যাদি। আইনের শাসনের ভেতর রয়েছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আদালতের মান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মান ও ন্যায়নিষ্ঠতা, গরিব ও ক্ষমতাহীন মানুষদের বিচার পাওয়ার সুযোগ এবং আইনের চোখে সবার সমান অধিকারের বিষয়টি। বাজার অর্থনীতিতে বিনিয়োগ নির্ভর করে চুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক অধিকার প্রয়োগের ওপর। এসব উপাদানই নাগরিকদের আত্মবিশ্বাস ও সমাজের বিধিবিধানের প্রতি তাদের অনুগত থাকতে কাজ করে। সরকারের কার্যকারিতা প্রতিফলিত হয় সরকারি সেবার মান, সরকার রাজনৈতিক চাপ থেকে কতটুকু মুক্ত এবং সেবার সামর্থ্যের মাধ্যমে। এর মধ্যে রয়েছে সরকারের নীতির বিশ্বাসযোগ্যতা ও নীতির প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতার বিষয়টি।

উন্নত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি

সুশাসনে সুবিস্তৃত কাঠামোর মাঝে, যার মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি দমনের মতো অপরিহার্য উপাদান, কিছু সুনির্দিষ্ট পরিমাপ রয়েছে যাদের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যেমন : স্বচ্ছতা, যাতে আছে তথ্যের অধিকার, বাক্ ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং বিধিবিধান সহজীকরণ, এর মাঝে রয়েছে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার—নিয়ন্ত্রিত ও নিয়ন্ত্রণকারীর মাঝে সরাসরি সংযোগ এড়ানোর জন্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ব্রান্ডেই একবার বলেছিলেন 'সূর্যালোক হচ্ছে সর্বোত্তম ছোঁয়াচরোধক'। স্বচ্ছতা দুর্নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক। সরকারি কর্মকর্তা, মন্ত্রী, বিচারক, সংসদ সদস্য এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা তাঁদের যে সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করেন তা দুর্নীতি প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দেওয়ার মতো অবস্থানে থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের ঘোষণা দেওয়া উচিত। এ ধরনের ঘোষণায় সম্পদের পরিমাণ কম করে দেখানো হতে পারে কিন্তু ঘোষণাগুলো প্রকাশিত হচ্ছে জনগণের সামনে। তবে সময়ের ব্যবধানে জনগণের চাপে সম্পদের ভুল বিবরণী প্রকাশ করার প্রবণতা কমে যাবে বলে আশা করা হয়।[২৪] আর গণতন্ত্রে যাঁরা রাজনীতিতে আসবেন, যাঁদের সিদ্ধান্তের কারণে নির্ধারিত হবে জনগণের সম্পদ কীভাবে ব্যবহৃত হবে, তাঁদের মেনে নিতে হবে যে তাঁদের আইনের হিসাব জনগণের অনুসন্ধানের জন্য উন্মুক্ত—এমন সিদ্ধান্তের ওপর এ প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। কেউ যখন একবার

রাজনীতিতে প্রবেশ করেন তাঁর ব্যক্তিস্বাধীনতা, বিশেষ করে আয়-ব্যয় গোপন রাখার ব্যাপারে, হ্রাস পায়।[২৫] এ ধরনের বিবরণী কার্যকর প্রতিরোধক হওয়ার জন্য। এসব বিবরণী খতিয়ে দেখার জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থা থাকা উচিত। একটি স্বাধীন তদারকি কমিশন গঠন করা যেতে পারে এ ধরনের বিবরণী পরীক্ষা ও এর সত্যতা যাচাই করার জন্য। যদিও শুরুতে এ ধরনের তদারকি ও যাচাইকরণ খুব একটা কার্যকর হয় না, তবে সব তথ্য জনগণের নাগালে রাখার চর্চা দুর্নীতি প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করবে।

একইভাবে সরকারি নীতি, কাজ, আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে তথ্য পাওয়ার অধিকারের জন্য দুর্নীতিবিরোধী কৌশলের ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশে ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন করা হয়েছে।[২৬] কিন্তু তথ্য পাওয়ার এই অধিকার প্রতিষ্ঠা খুব একটা সহজ ছিল না। কারণ সব সরকারই নিরাপত্তার অজুহাত তুলে তথ্য পেতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করত। জনগণের সঙ্গে তথ্য ভাগাভাগি করতে সব সরকারই অনিচ্ছুক। কারণ তথ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ সরকারের ক্ষমতা প্রদর্শনেরই একটি অংশ, আর তথ্যের জন্য জনগণের অবাধ প্রবেশাধিকার সরকারের এই ক্ষমতাকে খর্ব করবে। বাংলাদেশে এ সংক্রান্ত আইনে ২০ ধরনের তথ্য প্রকাশের ব্যাপারে বিধিনিষেধ রয়েছে। তথ্য দিতে অস্বীকার করলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আদালতে নিয়ে বিচারের প্রক্রিয়াটি বেশ সময়সাপেক্ষ। গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে এ ব্যাপারে আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। শুধু মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্র ছাড়া, এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আইনের ভাষাটিও পরিষ্কার নয়। এ দেশে এর মধ্যে তিনটি আইন হয়েছে: রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা আইন ১৯২৩, বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ এবং রুলস অব বিজনেস ১৯৯৯। এই আইনগুলো তথ্য আইনের কিছু ধারাকে নিষ্ক্রিয় করে থাকতে পারে। আর এ আইনটি স্থানীয় সরকারের উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত কার্যকর, এর নিচে ইউনিয়ন পর্যায়ে কার্যকর নয়।[২৭] তবে এ আইন এনজিওগুলোর দ্বারা গরিব মানুষদের পক্ষে ব্যবহার করা হয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে তাদের দাবিদাওয়া ও অধিকার খুঁজে বের করা ও তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য।[২৮] এ ব্যাপারে সিভিল সোসাইটি সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত ও সচেতন করার জন্য ভূমিকা রাখতে পারে, যেন তারা সঠিক বিষয় নির্বাচন করে এবং তথ্যের বিভিন্ন ধরন বাছাই করে যথাযথ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাতে তথ্য পেতে পারে। তারা জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত সব বিষয়ে ওয়াচডগের ভূমিকা রাখতে পারে। সরকারের বিভিন্ন সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে এবং এ বিষয়গুলো বাক ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতাচর্চার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে নিয়ে আসার মাধ্যমে তাঁরা ভূমিকা পালন করতে পারেন। তথ্য অধিকার আইন মিডিয়ার কার্যকর ভূমিকায়

একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা স্বচ্ছতায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় মিডিয়া তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করে থাকে। দুটি উপায়ে এই অপব্যবহার রোধ করা যায়: প্রথমত অপপ্রচার ও ভুল তথ্য পরিবেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা; দ্বিতীয়ত, সিভিল সোসাইটি, নিরপেক্ষ ব্যক্তি ও গণমাধ্যমকে সম্পৃক্ত করে প্রেস কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে গণমাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা চালু করা। এ ছাড়া মুক্ত গণমাধ্যম ও অসংখ্য গণমাধ্যমের প্রতিযোগিতার মধ্যে যেকোনো ধরনের অপপ্রচার প্রতিদ্বন্দ্বীদের মাধ্যমে যাচাই করার সুযোগ রয়েছে। মিডিয়ার স্বাধীনতা সংকুচিত হলে জনকল্যাণ হুমকিতে পড়ার ঝুঁকি, ভুল তথ্য প্রচারের ফলে যে ক্ষতি হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। কারণ দিন শেষে জয় হয় সত্যেরই।[২৯]

সরকারি সম্পদ ব্যবহারে দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপের জন্য একটি ব্যাপার ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য সরকারি সম্পদ ব্যবহারে নজরদারি এবং এ ধরনের ব্যক্তিগত ফায়দা লোটার প্রবণতা রোধ করার জন্য সরকারের আর্থিক কার্যক্রমের, যেমন: রাজস্ব আয় ও ব্যয়, স্বচ্ছতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি ব্যয়সংক্রান্ত যত তথ্য জনগণের সামনে উন্মুক্ত থাকবে, তহবিল তছরুপের ঘটনা চিহ্নিত করার সুযোগ তত বাড়বে। এগুলো সরকারের ওপর চাপ তৈরি করবে দুর্নীতিবিরোধী ব্যবস্থা নিতে।

ইন্টারন্যাশনাল বাজেট পার্টনারশিপের তৈরি করা ওপেন বাজেট ইনডেক্স বাজেট কতটুকু স্বচ্ছ তা মূল্যায়ন করে। এর মধ্যে রয়েছে বাজেট তৈরিতে জনগণের অংশগ্রহণ এবং আইন বিভাগ ও সর্বোচ্চ নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানে তদারককারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার বিষয়টি।[৩০] বাজেটের স্বচ্ছতার বিষয়টি বিচার করা হয় জনগণের সামনে বাজেট দলিল প্রকাশের মাধ্যমে। এর মধ্যে রয়েছে তিনটির প্রাক্-বাজেট দলিল, চারটি বাজেট নির্বাহী দলিল এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন। বাজেট-প্রক্রিয়ায় আইনসভার তদারকির মধ্যে রয়েছে নির্বাহী বিভাগে বাজেট প্রস্তাব জমা দেওয়ার আগে বাজেট-প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়া, গবেষণা ও বিশ্লেষণ সামর্থ্যে আইনসভার প্রবেশাধিকার, বাজেট প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য যথেষ্ট সময়, বাজেট সংশোধনের পর্যাপ্ত ক্ষমতা এবং বাজেট বাস্তবায়নের সময় তহবিল হস্তান্তর। সর্বোচ্চ নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতা বিচার করা হয় ১. প্রতিষ্ঠান-প্রধানকে বাদ দেওয়ার ক্ষমতা, ২. সরকারি অর্থায়ন নিরীক্ষা করার আইনি ক্ষমতা ৩. স্বতঃপ্রণোদিত কোনো নিরীক্ষা করার উদ্যোগ, ৪. নিজের বাজেট নির্ধারণে আর্থিক সম্পদের পর্যাপ্ততা ও কর্তৃত্ব এবং ৫. দক্ষ লোকের প্রাপ্যতার ওপর। ওপেন বাজেট ইনডেক্সে ২০১২ সালে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৫৮, স্কোরের সীমা ০ থেকে ১০০-এর মধ্যে ছিল, এর মধ্যে ১০০ নির্দেশ করে সবচেয়ে উন্মুক্ত বাজেটকে আর শূন্য স্কোর বোঝায় বাজেটটি কত কম স্বচ্ছ।[৩১] দেশগুলোর ৫টি শ্রেণির মধ্যে ৪১ থেকে ৬০ স্কোর অর্জনকারী দেশগুলোর শ্রেণি বোঝায় এসব দেশ বাজেট সম্পর্কে কিছু তথ্য জনগণের সামনে উপস্থাপন করে। যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। বাংলাদেশসহ এ দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও ফিলিপাইনস। ১০০ দেশের মধ্যে অধিকাংশ দেশই এই শ্রেণিভুক্ত, তবে ভারত ও ইন্দোনেশিয়া তুলনামূলকভাবে একটু ওপরের শ্রেণিতে আছে, যাদের স্কোর ৬১ থেকে ৮০-এর মধ্যে।

উন্মুক্ত বাজেটের জরিপের উপাদান

ছক-১- বাজেট দলিলাদির প্রাপ্যতা (২০১২)

	প্রাক্ বাজেট প্রস্তাবনা	নির্বাহী বাজেট প্রস্তাবনা	নাগরিক বাজেট	বিধিবদ্ধ বাজেট	বাৎসরিক প্রতিবেদন	মধ্য বছরের পর্যালোচনা	বছরের শেষ প্রতিবেদন	নিরীক্ষা প্রতিবেদন
বাংলাদেশ	XXX	X	XXX	X	X	X	XXX	XXX
ভারত	XXX	X	X	X	X	X	X	X
পাকিস্তান	XX	X	XXX	X	X	XXX	X	X
শ্রীলঙ্কা	XXX	X	XXX	X	XX	XXX	X	X
নেপাল	XXX	X	X	X	X	X	X	X
ফিলিপাইন	XX	X	XXX	XX	XX	XXX	XXX	X
ইন্দোনেশিয়া	X	X	X	X	XX	X	X	X
থাইল্যান্ড	XX	X	X	X	XX	XXX	XXX	XX

X= জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত; XX= অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত; XXX= জমা দেওয়া হয়নি।

ছক-২- জনগণের সম্পৃক্ততা ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের শক্তি (স্কোর : ১০০-০)

	জনগণের সম্পৃক্ততা	আইনের শক্তি	সর্বোচ্চ নিরীক্ষণ প্রতিষ্ঠান
বাংলাদেশ	১১	৫৮	৬৭
ভারত	১৭	৭৬	১০০
পাকিস্তান	১১	৫১	৯২
শ্রীলঙ্কা	৮	৪৭	৫০
নেপাল	১৭	৩৯	১০০
ফিলিপাইন	১৭	৩৯	১০০
ইন্দোনেশিয়া	১৯	৮৫	৬৭
থাইল্যান্ড	১৪	৭০	৮৩

এ ক্ষেত্রে দক্ষ, স্বাধীন ও প্রয়োজনীয় জিনিসে সজ্জিত অডিটর জেনারেলের অফিস এবং তার মাধ্যমে প্রকাশিত সময়োপযোগী ও বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অডিটর জেনারেলের অফিসের শক্তির বিচারে বাংলাদেশ ভারত, নেপাল, পাকিস্তান ও ফিলিপাইনসের অনেক নিচে অবস্থান করছে। বাংলাদেশে সরকারি ব্যয়ের যাবতীয় তদারকি অডিটর জেনারেলের হাতে থাকলেও, বিদেশি সহায়তায় পরিচালিত প্রকল্পসমূহের পর্যবেক্ষণ এর আওতায় নেই। প্রেসিডেন্ট অডিটর জেনারেলের নিয়োগ দিয়ে থাকেন, যিনি কিনা এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে থাকেন। অডিটর জেনারেলের অফিসে কর্মরত কর্মচারীদের অধিকাংশেরই হিসাবরক্ষণ বা নিরীক্ষা বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা নেই, আর এটি তাদের নিয়োগের রাজনৈতিক বিবেচনার বিষয়টি নিয়ে জনমনে সন্দেহের উদ্রেক করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উঠে আসা পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে মাঠপর্যায়ে তেমন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।[৩২] সরকারি ক্রয় ও লাইসেন্স প্রদানের সঙ্গে মন্ত্রীদের জড়িত থাকার বিষয় নিরীক্ষা প্রতিবেদনে প্রকাশিত হওয়ায় সম্প্রতি ভারতে বেশ কয়েকজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন।

বিধি সহজীকরণ, পেশাদার আমলাতন্ত্র ও বিকেন্দ্রীকরণ

সরকারের আইন ও বিধিবিধান সুযোগ তৈরি করে ক্ষমতা অপব্যবহারের এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নানা দুর্নীতির। সরকারি কর্মকর্তারা বাণিজ্য সুযোগের প্রবেশাধিকার, বিভিন্ন পণ্য ও সেবায় সহায়তা এবং সীমান্তের এপার-ওপার পুঁজির চলাচল নিয়ন্ত্রণ করায় এসব বিষয়ে তাদের দুর্নীতি করার নানা সুযোগ তৈরি হয়। ঘুষের মাধ্যমে সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা খনিজ সম্পদের প্রবেশাধিকার সহজেই পাওয়া যায়। যখনই মনোপলির সুযোগ থাকে, সরকার এসব মনোপলির সুযোগ থাকা সম্পদের প্রবেশাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে অবৈধভাবে দুপয়সা কামিয়ে নিতে পারে। একটি ব্যবসা শুরু ও তার পরিচালনা নিয়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণ বেশ ব্যাপক। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অনুমতি বা লাইসেন্স গ্রহণ; এ ছাড়া কোনো ব্যক্তি কোনো সেবা গ্রহণ করতে চাইলে তাকেও নিয়ম মেনে চলতে হবে। সরকারের নিয়ম-নীতি যত কম বেসরকারি খাতে প্রভাব বিস্তার করবে, সরকারি অপব্যবহার তত কম হবে, আর ব্যক্তিস্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহারও কমে যাবে। একই সঙ্গে নিয়ম-নীতি যত জটিল হবে, নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতা অপব্যবহারের সুযোগ তত বাড়বে এবং ব্যক্তিগত লাভের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহারও বাড়বে। তবে সব নিয়ম-নীতিই যে অপ্রয়োজনীয় নয়, তার ওপরও জোর দিতে হবে। অনেক নিয়ম আছে যেগুলো দক্ষতা ও ইকুইটি বাড়ানোর জন্য দরকারি। যেমন: সামাজিক

নিরাপত্তা, দূষণ, আর্থিক বাজার; যা তথ্যের অসমতার কারণে জর্জরিত; প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ, মনোপলি, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, পরিবেশ বিপর্যয়—এসব ক্ষেত্রে নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণের দরকার আছে। তবে নিয়ম-নীতিগুলো যেন সহজে বাস্তবায়ন ও বোধগম্য হয় তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ।[৩৩] দ্বিতীয়ত নিয়ম-নীতিগুলোর ব্যাপক পরিচিতি থাকা উচিত এবং এমনভাবে প্রচার করা উচিত যেন অর্থনীতিতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকে এর প্রভাব সম্পর্কে জানে ও বোঝে। এটি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে বর্তমানে জটিল ও পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল অর্থনৈতিক কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানের এই যুগে নিয়মগুলো একটি জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় ও পরিবর্তিত হয়। আর তাই নিয়ন্ত্রক সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের জন্য এগুলোকে অধিকতর সহজ করা এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। একই সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে এসব নিয়মে ব্যাপক প্রচার বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তবে একটি জায়গায় বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি করতে পারে এবং করা উচিত। মেয়াদোত্তীর্ণ, জটিল, পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এমন ও অদরকারি নিয়ম-নীতি বাদ দেওয়া এবং দরকারিগুলো যাদের রাখতেই হবে তাদের আরও সহজ করার উদ্দেশ্যে এসব নিয়ম-নীতির ব্যাপক পর্যালোচনা করা। এ ধরনের পর্যালোচনায় সব সুবিধাভোগীর অংশগ্রহণ থাকা উচিত। যেমন: নির্বাহী বিভাগ, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, যারা এসব নিয়মের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং সাধারণ জনগণ। অতীতে এ ধরনের পর্যালোচনা করা হলেও সেসব পর্যালোচনার সুপারিশ ও পরামর্শ সেভাবে বিবেচনা করা হয়নি। সরকারি নির্বাহী বিভাগ নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ম বাদ দিতে অনিচ্ছুক, কেননা এর ফলে ক্ষমতা ব্যাপকভাবে খর্ব হতে পারে বলে তাদের আশঙ্কা রয়েছে। এ ছাড়া তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতির কারণে অনেক নিয়ম-নীতি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে নিয়ম বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়াই। এ জায়গাগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মনোযোগ দিতে হবে। এ জন্য সরকারি কর্মকর্তার একাত্মতা ও দক্ষতা বেশ গুরুত্বের দাবি রাখে। এসব কর্মকর্তার পক্ষপাতহীন ও নিরপেক্ষ থাকা দরকার। এটি আবার নির্ভর করছে জনপ্রশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক ও তদারকি কাঠামো এবং কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও একাত্মতাকে প্রভাবিত করে এমন প্রণোদনাব্যবস্থার ওপর। দুর্নীতির ব্যাপকতা কমানোর জন্য আমলা/নিয়ন্ত্রকদের বেতন বাড়ানোর সুপারিশ প্রায়ই করা হয়ে থাকে। তবে এটি বাস্তবতার নিরিখে তেমন স্পষ্ট নয়। যদি ঘুষের মাত্রা নির্ধারিত না থাকে আর কোনো তৃতীয় পক্ষ বিরাজ না করে, তবে যেমনটা বলা হচ্ছে তেমনটা ঘটবে কি না তা বেশ অস্পষ্ট। কারণ সরকারি কর্মচারী ও ঘুষ প্রদানকারী দর-কষাকষি করবে ঘুষের পরিমাণ নিয়ে, মোটা বেতন কর্মকর্তাদের দর-কষাকষির ক্ষমতা বাড়াবে। এর ফলে ধরা পড়ে যাওয়ার মাশুল যেমন বেড়ে যাবে, তেমনি ঘুষের পরিমাণও বাড়বে।[৩৪] বাংলাদেশের মতো

রাজনীতিয়ায়িত সমাজে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আমলাতন্ত্রে যেন কোনোভাবেই 'রাজনৈতিকীকরণ' না ঘটে এবং সে যেন তার নিরপেক্ষতা বজায় রাখে। সুপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রে সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সরকারের উঁচু পর্যায়ে রাজনৈতিক রদবদল। বাংলাদেশের মতো সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশে, যেখানে বড় দুটি দল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, বড় বড় পদে বিরোধী দলের নিয়োগকৃত আমলাদের ব্যাপারে ক্ষমতাসীন দলের আপত্তির যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে। তারা চাইলে উত্তরসূরি সরকারের অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্পের বাস্তবায়নে দেরি করাতে পারে বা ঝুলিয়ে দিতে পারে। তবে একেবারে উঁচু পদ ছাড়া রাজনৈতিক বিবেচনায় এসব নিয়োগের কোনো যুক্তিই থাকতে পারে না। প্রশাসনে রাজনীতিকীকরণের ফলে উঁচু থেকে নিচু সব পর্যায়ে অযোগ্য অদক্ষ লোকের নিয়োগ ও পদোন্নতি ঘটেছে। পদোন্নতির জন্য পক্ষপাতমূলক ও অস্পষ্ট আইন এবং বাইরের প্রভাব থেকে আমলাদের রক্ষা করার জন্য আইনের অভাব এ ধরনের চর্চার বিকাশে ভূমিকা রেখেছে। এর ফলে সরকারি সেবার মান পড়ে গেছে এবং এখানে নির্লিপ্ততা বেড়েছে। দৈনন্দিন নির্বাহী সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক বিবেচনার প্রভাব বাড়ার কারণে দুর্নীতিতে অসৎ রাজনীতিবিদ ও আমলাদের যোগসাজশ বাড়ছে, কারণ আমলা ও তার রাজনৈতিক প্রভুদের ভাগ্য একই সুতোয় বাঁধা। আমলাতন্ত্রে তাই রাজনৈতিকীকরণের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো শুধু দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের জন্যই আবশ্যক নয়, বরং তা উন্নয়নের জন্য একটি কার্যকর ও দক্ষ সরকারের জন্য অপরিহার্য।

সেবা খাতে বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো নির্মাণ ও স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্পে যেসব দুর্নীতি রয়েছে তার অনেকটাই প্রশমিত করা যায় এসব সেবার দায়িত্ব বিকেন্দ্রায়িত করে স্থানীয় সরকার, বিশেষ করে এর নিচু পর্যায়ে এর দায়িত্ব দেওয়া হলে। স্থানীয় সরকারের সঙ্গে স্থানীয় জনগণ, যাদের এসব সেবায় প্রবেশাধিকার দরকার এবং যারা এসব সেবার জন্য মূল্য দিয়ে থাকে, এর এক ধরনের নৈকট্য রয়েছে। তবে দক্ষতা বাড়াতে, দুর্নীতি কমানো বা ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে এই বিকেন্দ্রীকরণ কার্যকরী হতে হলে দরকার জবাবদিহি ও প্রতিনিধিত্ব; যেমন নির্বাচিত স্থানীয় সরকার। স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিত্বশীল হওয়া উচিত, স্থানীয় জনগণ দ্বারা নির্বাচিত এবং তাঁর আর্থিক সম্পদ থাকা দরকার যা নিজস্ব উৎস থেকে আহরিত এবং সরকারের কাছ থেকে বরাদ্দ বা অনুদান পাওয়া। উন্নয়ন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্ধারণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে আয় হস্তান্তর কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের স্বাধীনতা থাকা উচিত। এ ছাড়া এর নিজস্ব কর্মচারী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাবমুক্ত থাকা উচিত। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা সংস্থার কর্মচারী যাঁরা স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করছেন তাঁদের স্থানীয় সরকারের আওতায় থাকা উচিত।

এখানে কোনো অনুমিত কারণ নেই যে ভাবার, কেন স্থানীয় সরকারের কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের তুলনায় কম দুর্নীতিগ্রস্ত হবেন। প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকারের পাশাপাশি সেবা গ্রহণকারী, স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন ও সুশীল সমাজের সংস্থার অংশগ্রহণ থাকা দরকার স্থানীয় পর্যায়ে মানুষ সঠিক সেবা যথাযথভাবে পাচ্ছে কি না তার তদারকিতে। স্থানীয় সরকারের কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে এসব সংস্থা অনেক কার্যকরভাবে পাহারাদারের ভূমিকা পালন করতে পারবে। আবার প্রমাণ সংগ্রহ এবং তথ্যের প্রবেশাধিকার পাওয়াও তুলনামূলকভাবে সহজ হবে। ছোট গ্রাম্য সমাজে দুর্নীতির ঘটনাসমূহ আড়াল করা তেমন সহজ নয়। নাগরিকেরা যেন স্থানীয় সরকার পর্যায়ে সম্পদের ব্যাপারে তথ্য পেতে পারে এবং কোনো নির্দিষ্ট প্রকল্প যেগুলো তারা ব্যবহার করছে ও যার জন্য তারা সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহি করতে পারবে সে জন্য তথ্য অধিকার আইন একেবারে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে প্রয়োগ করা উচিত।[৩৫]

তবে বিকেন্দ্রীকরণ দুভাবে হতে পারে। নিচের দিক থেকে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে, যেমন নাগরিকদের চাপ। আবার ওপরের দিকে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব/নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতা কিছুটা বিসর্জনের মাধ্যমেও এটা হতে পারে। স্থানীয় সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতৃত্ব বেশ লম্বা সময় ধরে অনিচ্ছুক ছিল।[৩৬] যদি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ক্ষমতা ছাড় দিতে রাজি হয়, তবে এটি স্থানীয় সরকারের কাছে তার মাধ্যমে বরাদ্দকৃত সম্পদ দিয়ে দুর্নীতিমুক্ত ক্রয় সেবা ও উন্নয়ন প্রকল্প নিশ্চিত করতে পারে।

নির্বাচনী প্রচারাভিযানের অর্থায়নে সংস্কার

নির্বাচনী গণতন্ত্র বা অর্ধগণতন্ত্রে, যে প্রধান কারণে রাজনীতিবিদদের সম্পদে প্রবেশাধিকার দরকার—সম্পদ বাড়ানো ও নিজের বৈধ প্রয়োজন মেটানোর বাইরে বা বৈধভাবে অর্জন করা সম্পদের বাইরে—তা হলো নির্বাচনী ব্যয় মেটানোর জন্য। দুধরনের ব্যয় রয়েছে। একটি হচ্ছে বছরজুড়ে রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থায়ন, যার মধ্যে রয়েছে অফিসের ব্যয় নির্বাহ ও কর্মীদের বেতন-ভাতা প্রদান, ভ্রমণ খরচ, প্রচারণা খরচ, সভার খরচ ইত্যাদি মেটানো; দ্বিতীয়টি, নির্বাচনী প্রচারাভিযানের জন্য ব্যয়, যাতে রয়েছে ভোটারদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর, এতে আবার রয়েছে নির্বাচনী প্রার্থীদের ভ্রমণ ও সভার খরচ। এ ছাড়া নির্বাচনী ব্যয়ের কিছু অদৃশ্য কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় রয়েছে, যেমন কেন্দ্রীয় তহবিলে চাঁদা নির্বাচনী মনোনয়ন নিশ্চিতের জন্য।

একটি হিসাব থেকে দেখা গেছে, ২০৩০ সালের শুরুতে একজন প্রার্থীকে গড়ে খরচ করতে হতো প্রায় ৫০ মিলিয়ন টাকার মতো।[৩৭] যদি না প্রার্থী বেশ

বড় রকমের ধনী হয়ে থাকে তবে নির্বাচনী ব্যয়ের এই বড় অংশ তার ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে মেটানো কঠিন হয়ে পড়ে। যদি সে কোনো শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছ থেকে অর্থ নিয়ে থাকে তবে নির্বাচিত হলে সে সরকারি সম্পদ থেকে তার দায় মেটানোর চেষ্টা করে। যদি সংসদের অধিকাংশ সদস্যই বণিক ও শিল্পপতিদের প্রতিনিধি হয়ে থাকে, তবে তারা সরকারি সম্পদের প্রবেশাধিকার পেতে সরকারি চুক্তি সম্পাদনে পরোক্ষভাবে অংশ নিতে পারে। আর অন্যরা তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের সরকারি চুক্তি ও ক্রয়াদেশে প্রবেশাধিকার পাইয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের ব্যয় উঠিয়ে নিতে পারে। সরকারি খাত থেকে স্থানান্তরিত অর্থ, যা নির্বাচনের কাজে ব্যয় হয় তা মূলত বেসরকারি কাজে ব্যয় হয় না। কারণ নির্বাচনী ব্যয় ও দলের জন্য ব্যয় প্রধানত বিভিন্ন পণ্য ও সেবার জন্য চলতি হিসাবের মধ্যে পড়ে। যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় না হয়ে এই ব্যয়গুলো হয় অসংখ্য খাতে, তাই জনগোষ্ঠীর বিপুল অংশ এই ব্যয়ের কারণে উপকৃত হয়ে থাকে।

এটি খতিয়ে দেখার দরকার যে সরকারি অফিস/ক্ষমতা অপব্যবহারের মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত অর্থ সরাসরি এবং দক্ষভাবে নির্বাচনী ব্যয়ে খরচ করা সম্ভব হতো কি না। দক্ষভাবে সরকারি অর্থ খরচ করে নির্বাচনী ব্যয় মেটাতে হলে একমাত্র দুটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। একটি নির্বাচনী প্রচারাভিযানের সঙ্গে সম্পর্কিত। এ ধরনের ব্যয় কমানোর জন্য কী কী সুযোগ রয়েছে? বর্তমানে নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের ক. ব্যয় বিবরণী দাখিল করতে বাধ্য করেছে এবং খ. ব্যয়ের সীমা বেঁধে দিয়েছে। তবে ব্যয়ের এই বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ করা যায় না, কারণ প্রার্থীরা অতিরিক্ত ব্যয় করে থাকে এবং ব্যয় অনেক কম দেখিয়ে বিবরণী দাখিল করে। এ কারণে ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা অপ্রয়োজনীয় এবং বাদ দেওয়া উচিত। তবে প্রার্থীদের অবশ্যই ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ দাখিল ও মিডিয়ায় তা প্রকাশ করা উচিত। নির্বাচন কমিশন বরং যতটা সম্ভব যেসব জায়গায় এসব ব্যয় করা যাবে না তা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে। এটি প্রার্থীকে গ্রহণযোগ্য ব্যয়ের সীমা নির্ধারণে স্বাধীনতা দেবে। যা দেখে মানুষ নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে প্রার্থী ঠিক কী পরিমাণ ব্যয় কম দেখাচ্ছেন। ভোটারদের প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় একটি প্রাথমিক ধারণা রয়েছে প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের ব্যাপারে। যদিও তাঁদের ধারণার পরিমাণটি সঠিক না-ও হতে পারে, তারপরও যেসব জায়গায় ব্যয় কম দেখানোর সুযোগ রয়েছে সেসব জায়গার ব্যাপারে তাঁরা ধারণা দিতে পারেন। মিডিয়াও এসব ব্যয়ের ব্যাপারে আলোচনা ও তাদের মতামত দিতে পারে। অনুসন্ধানী সাংবাদিক ও সিভিল সমাজের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নির্বাচনী ব্যয়ের ব্যাপারে জরিপ পরিচালনা করতে পারেন ও তা প্রকাশ করতে পারেন। নির্বাচনী প্রার্থীর সব

আর্থিক তথ্যের আলোকে তার ব্যয় বিবরণীর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি স্বাধীন বোর্ড থাকতে পারে। এসব ব্যয়ের সমন্বিত প্রভাব এসব ব্যয়ের ওপর প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করতে পারে।

নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অর্থায়নের দ্বিতীয় ব্যাপারটি নির্বাচনী প্রচারাভিযানে সরকারি অর্থায়নের বিভিন্ন পন্থার বাছাইয়ের সঙ্গে জড়িত। সরকার এ ধরনের সাম্প্রতিক ব্যয় যাচাই করে প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য একটি গড় ব্যয় ধার্য করে দিতে পারে। অথবা প্রার্থীর নির্বাচনী দলের কাছে টাকা দিতে পারে, যেন দল মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচন করার জন্য টাকা দিতে পারে এই শর্তে যে প্রার্থী কত টাকা অনুদান পেলেন তা তিনি প্রকাশ করবেন। অর্থায়নের এই অনুদান নির্ভর করতে পারে সর্বশেষ সংসদে দলটির প্রতিনিধিত্ব কেমন ছিল তার ওপর।[৩৮] এ ধরনের অর্থায়নের জন্য সরকার আংশিকভাবে সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে বাজেটের সম্পদ থেকে এবং আংশিকভাবে নির্ভর করতে পারে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবদানের ওপর। এ জন্য এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে কর সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া এসব ব্যক্তি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন দলের নির্বাচনী তহবিলে কোনো প্রার্থী ও ব্যক্তিগত নির্বাচনে অর্থায়নের জন্য অনুমতি দেওয়া যেতে পারে এই শর্তে যে এই ধরনের অনুদান বা অবদান নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হবে এবং কমিশন তা জনসমক্ষে প্রকাশ করবে।

তবে এই নির্বাচনী ব্যয় অর্থায়নের জন্য অন্য কোনো উপায়ও বের করতে পারে। এটি কোনো রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজস্ব ভিত্তি ও বিনিয়োগ তহবিল গড়তে, যেমন সামরিক বাহিনী সংস্থা, সুযোগ করে দেবে যা বিভিন্ন ধরনের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিক হওয়ার জন্য তাদের পথ সুগম করে দেবে। লাভজনক প্রতিষ্ঠান শুরু করার/কেনার জন্য রাষ্ট্র এসব দল বা বিনিয়োগ তহবিলে প্রাথমিক পুঁজির জোগান দিতে পারে। এটি খুবই সম্ভব যে পার্টি ফাউন্ডেশন এ ধরনের ব্যাংক, জীবন বিমা কোম্পানির মালিক হতে পারে। এসব লাভজনক সম্পদের মালিক পার্টি ফাউন্ডেশন/বিনিয়োগ তহবিল তাদের আয়/লাভ থেকে সরকারি সম্পদে অবদান রাখতে পারে, যা নির্বাচনী অর্থায়নে খরচ হবে। তবে আরও বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষার মাধ্যমে কার্যকর ও যথাযথ সমন্বিত-নির্বাচনী-অর্থায়ন ব্যবস্থা নির্ধারণ করা সম্ভব। তবে এটি অপরিহার্য যে, যে পন্থাই বাছাই করা হোক না কেন তা যেন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে। তবে মূল লক্ষ্য হচ্ছে, যতটা সম্ভব নিশ্চিত করা নির্বাচনী প্রচারণার এই ব্যবস্থায় প্রার্থী যেন কোনোভাবেই সরকারি ক্ষমতা অপব্যবহারের মাধ্যমে সম্পদ জোগাড় না করে এবং দুর্নীতির ব্যাপকতা যেন কমে। তবে এ ধরনের ব্যবস্থা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে যাঁরা জড়িত অথবা ক্ষমতায় যাঁরা বসে আছেন তাঁদের আখের গোছানোর লোভ

কমাবে না। বরং এটি নির্বাচনী গণতন্ত্রে বহুল পরিচিত দুর্নীতির একটি কারণ এড়ানোর দিকে একটি পদক্ষেপ।

একটি কার্যকর দুর্নীতি দমন কমিশন

২০০৪ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের দুর্নীতি দমনবিরোধী কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিস্তারিত পরিশিষ্ট (গ)-তে দেওয়া আছে। তবে চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে শুধু আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এটিকে কার্যকর করা। এর জন্য দরকার ক. এটিকে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখা, খ. আর্থিক সম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর দিক থেকে এটিকে স্বাধীন রাখা, গ. কর্মচারী নিয়োগের বেলায় এটিকে স্বাধীন রাখা, ঘ. এটির পরিচালনা ও তদন্তের কাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা বজায় রাখা। জনগণের সামনে এই কমিশনকে মুক্ত ও এর একাত্মতা তুলে ধরতে হলে এর স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে।[৩৯]

একেবারে শুরু থেকে দুর্নীতি দমন কমিশন রাজনৈতিক ও কৌশলগত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। অস্পষ্ট দায়িত্ব, দুর্বল নেতৃত্ব, দুর্বল তদন্তের সামর্থ্যে ভুগেছে, যা প্রকারান্তরে এর স্বাধীনতা ও আইন অনুযায়ী চলার সামর্থ্যকে ব্যাহত করেছে।[৪০] এটির কর্মচারী অপর্যাপ্ত। তার ওপর অধুনা বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কর্মচারীদের নতুন কমিশনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাচাই-বাছাই ছাড়াই। যদিও এই ব্যুরোর অদক্ষতা ও একাত্মতার অভাবের কারণে বেশ দুর্নাম ছিল। নিজস্ব বাজেট তৈরির ব্যাপারে এই কমিশনের কোনো স্বাধীনতা নেই। নির্বাহী বিভাগ শুধুই বাজেট নির্ধারণ করে দেয় না, আরও ঠিক করে দেয় কোন কোন খাতে বাজেটের অর্থ ব্যয় করতে হবে। উচ্চ আদালতে এর সিদ্ধান্তগুলোকে বেশ কয়েকবার প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। দুর্নীতি চিহ্নিত করা ও এর তদন্ত কখনোই দুর্নীতির জন্য শাস্তির ঝুঁকি বাড়াবে না, যদি জটিল আইনি লড়াই চালিয়ে নেওয়ার জন্য যথাযথ কোনো প্রক্রিয়া না থাকে, সীমিত সামর্থ্য ও তুখোড় আইনি জ্ঞানের অভাব থাকে।[৪১]

ওপরে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের যেসব উপায় তুলে ধরা হয়েছে তা করা হয়েছে মূলত ক. জননীতি এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং একই সাথে খ. ক্ষমতা প্রয়োগে ও সরকারি সম্পদ ব্যবহারে সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দুর্নীতি দমন পন্থাগুলোর কার্যকারিতা নির্ভর করছে সার্বিক শাসনের গুরুত্বের ওপর। এটি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে অর্জনের চেষ্টা যেন কখনোই ভালোর শত্রু হয়ে না দাঁড়ায়। দুর্নীতির নিয়ন্ত্রণ একটি শ্লথ প্রক্রিয়া এবং এতে নিরলস ও টেকসই প্রয়াসের দরকার। জাগ্রত মানুষের সদা নজরদারি দুর্নীতি কমাতে গিয়ে যে উন্নতি ঘটছে তারই মূল্য।

৪. পরিবর্তনের চালকেরা

অভ্যন্তরীণ চাপ 'নিচ থেকে ওপরে' অথবা 'ওপর থেকে নিচে'

এসব পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন পন্থা বাংলাদেশে বাস্তবায়িত হবে। এ ধরনের অনেক পন্থাই অতীতে আলোচনা করা হয়েছে। এ ধরনের জ্ঞানের প্রয়োগ পর্যাপ্ত না। দরকারি প্রশ্নটি হচ্ছে, পরিবর্তনের চালকেরা কারা। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, পরিবর্তনের চালকেরা উঠে আসতে পারে 'নিচ থেকে ওপর' বা 'ওপর থেকে নিচ' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। বাইরের অবস্থা এই পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারে। কিছু সুনির্দিষ্ট অবস্থায় ভেতরের ও বাইরের পারিপার্শ্বিকতা পরস্পরের অবদানকে জোরালো করে এই অবদানে ভূমিকা রাখতে পারে।[৪২] জনগণের মাঝে ব্যাপক সচেতনতা থাকতে পারে। সচেতন জনগোষ্ঠীর সাধারণ জনগণ ছাড়াও বিভিন্ন নাগরিক গোষ্ঠী রয়েছে, যারা দুর্নীতির ব্যাপকতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ সমস্যার চিহ্নিতকরণ ও সংজ্ঞায়ন যেকোনো দুর্নীতিবিরোধী ব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ। বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমাণে মিডিয়া রিপোর্টের কারণে এবং দুর্নীতির মাত্রার ওপর গভীর জরিপের কারণে, যা করা হয়েছিল সিভিল সমাজ, থিংক ট্যাংক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে, দুর্নীতির সমস্যা নিয়ে ব্যাপক সচেতনতা রয়েছে। এ অবস্থায় দুর্নীতির ওপর কার্যকর আক্রমণে দরকার ক. দুর্নীতি দমন প্রচেষ্টার প্রতি দায়বদ্ধ একদল রাজনৈতিক নেতা এবং খ. সমাজের এক উল্লেখযোগ্য অংশ যেমন: সিভিল সমাজ, ব্যবসায়ী সংগঠন, জনগণ যারা দুর্নীতিবিরোধী প্রচারাভিযান চালাতে তৈরি।[৪৩] যদি সামনের দিকের রাজনৈতিক নেতারা দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে ঐক্যবদ্ধ না হন অথবা নিজেরাই দুর্নীতিগ্রস্ত হন, তবে নিচের সারির নেতারা দুর্নীতির দিকে ঝুঁকে পড়েন। যখন নেতারা/নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব দুর্নীতির প্রতি নির্লিপ্ত থাকেন অথবা নিজেরা দুর্নীতিতে অংশ নেন, তখন আমলাতন্ত্রে দুর্নীতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কম হয়।[৪৪]

শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি—দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন

তবে পরিবর্তনের এই চাপ 'নিচ থেকে ওপর'—এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েও উদ্ভূত হতে পারে। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের চাপ বা শুরুটা 'নিচ থেকে ওপর' প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উঠে আসা দরকার। বড় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির দরকার যারা অধিকাংশ সমাজে এবং সময়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঞ্জিন হিসেবে কাজ করেছে।[৪৫]

তারা সিভিল সমাজ, থিংক ট্যাংক ও নানা ধরনের উদ্বিগ্ন নাগরিক গোষ্ঠীর মাধ্যমে ভূমিকা পালন করে। বারবার দেখা গেছে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব উঠে

এসেছে এই শ্রেণি থেকে আর মধ্যবিত্ত শ্রেণির সমর্থন তার ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। রাজনৈতিক প্রতিবাদ/আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে গরিবদের দ্বারা নয়, বরং তাদের দ্বারাই যাদের গড় আয় ও শিক্ষা তুলনামূলকভাবে গরিবদের থেকে বেশি। গরিবেরা যখন তাদের দৈনন্দিন বাঁচার সংগ্রামে লিপ্ত, মধ্যবিত্তরা তখন রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যস্ত নিজেদের পথ বের করার জন্য।

বর্ধিষ্ণু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির তরুণ প্রজন্ম থেকেই পরিবর্তনের গতির সূচনা হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যাদের জন্মহার বেশ বেশি, একটি সময় পর সেসব দেশে মোট জনসংখ্যায় কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যার (১৫-৪৫ বছর) অনুপাত অনেক বেশি হয়ে যায়। এই তরুণ জনগোষ্ঠীর, যাদের চিহ্নিত করা হয় ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড হিসেবে, অর্থনৈতিক প্রভাব ছাড়াও রয়েছে রাজনৈতিক প্রভাব। মধ্যপ্রাচ্য ও ব্রাজিলে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনের আন্দোলনে নেতৃত্বে ছিল মূলত এই তরুণেরাই, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বেকার তরুণেরা। বয়স্ক জনগোষ্ঠীর তুলনায় তুলনামূলকভাবে তাদের মধ্যে ঝুঁকি এড়ানোর প্রবণতা কম; আবার প্রত্যাশা বেশি থাকায় এবং কাজের ও রোজগারের সুযোগ বেশি থাকায় তারা বারবার হতাশ হয়ে পড়ে। নতুন ধরনের তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তারের ফলে এখনকার তরুণেরা অন্য দেশের উন্নয়নের অংশ। তার ওপর তথ্যপ্রযুক্তির নানা মাধ্যম যেমন স্মার্টফোন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদেরও সহজ প্রবেশাধিকার থাকায় তারা খুব সহজেই বড় আকারের আন্দোলন করার ক্ষমতা রাখে। এ ছাড়া তারা ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির ব্যাপারে সচেতন, দুর্নীতির ব্যাপারেও তাদের রয়েছে সর্বনিম্ন মাত্রার সহ্যক্ষমতা তাদের চেয়ে বয়স্ক লোকের তুলনায়, আচরণে যারা রক্ষণশীল এবং দুর্নীতির সুবিধাভোগী হওয়ায় যাদের এর সঙ্গে আপস করার দৃষ্টান্তও রয়েছে।

এ ধরনের পরিবর্তনের গতির দরকারি পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রথমত একটি বৃহৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণি থাকতে হবে; দ্বিতীয়ত এই শ্রেণির অবস্থান শহরে হতে হবে; তৃতীয়ত, এ শ্রেণিকে শিক্ষিত হতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না শহুরে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণি মোট জনসংখ্যার বৃহৎ অংশে পরিণত হচ্ছে। ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত অবস্থায় অংশ নিতে প্রণোদনা দেওয়া যায়। দুর্নীতিগ্রস্ত এই ব্যবস্থায় তারা স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাত ও ঘুষের মাধ্যমে ছোট-বড় নানা ব্যবসায়িক সুবিধা পায় এবং এর ফলে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সম্পদ ভোগ করার সুযোগ তৈরি হয়। আর এই ব্যবস্থায় শক্তিশালী নেতৃত্ব থাকায় তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো সম্মিলিত পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়। এ অবস্থায় দেশজুড়ে কোনো শক্তিশালী আন্দোলন হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে পুরো ব্যবস্থাটি একটি পড়ন্ত অবস্থায় গিয়ে পৌঁছায় যখন রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক

ব্যবস্থায় যথেষ্ট সম্পদ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা থাকে না উদীয়মান শ্রেণির বাড়ন্ত প্রত্যাশা মেটানোর। ফলে, আন্দোলন শহুরে মধ্যবিত্ত তরুণ থেকে অসন্তুষ্ট শহুরে বস্তিবাসীর মাঝে ছড়িয়ে পড়ার কারণে সমাজের সব অংশে পরিবর্তনের গতির সঞ্চার হয়।

এই আর্থসামাজিক পরিবর্তনের জন্য আন্দোলনের জায়গাটি বেশ কিছু বিষয়ের জন্য বাংলাদেশে অনুপস্থিত। প্রথমত বর্তমানে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি রয়েছে তারা মোট জনসংখ্যায় এমন শহুরে জনগোষ্ঠীর বিচারে সেভাবে বেড়ে ওঠেনি। আর তা ছাড়া শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আকারই শুধু নয়, এই শ্রেণির শিক্ষার অবস্থানও তেমন উঁচু অবস্থানে নেই যে এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আর গত দুই-তিন দশকে বাংলাদেশ শুধু মাথাপিছু আয় বাড়াতেই সক্ষম হয়নি বরং ধারাবাহিকভাবে তার দারিদ্র্য, শহুরে ও গ্রামীণ, উভয়ই কমাতে সক্ষম হয়েছে। যদিও আয়ের অসমতা ক্রমেই বাড়ছে, তবে খালি চোখে তার ধরা পড়ার দৃশ্য আর প্রকোপ শহরে এমনকি দেশের সার্বিক বিচারে সমাজে গ্রহণযোগ্য মাত্রা ছাড়িয়ে যায়নি। ২০০০-২০১০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে মাথাপিছু গড় ভোগ্য ব্যয় প্রতিবছর গড়ে ২ শতাংশ হারে বেড়েছে। একই সময়ে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা ২০০০ সালে ৪৮.৯ শতাংশ থেকে কমে ২০১০ সালে ৩১.৫ শতাংশ হয়েছে। ২০০০ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে আয়ের অসমতা বেড়েছে ০.৩০৭ শতাংশ থেকে ০.৩১০ শতাংশে । ২০০৫ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে তা ০.৩১০ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ০.২৯৯ শতাংশে।[৪৬] এটি নির্দেশ করে বিভিন্ন আয় গোষ্ঠীর মধ্যে ভোগ ব্যয় কমবেশি বেড়েছে। এটিও বেশ আগ্রহোদ্দীপক পর্যবেক্ষণ যে ২০০০ থেকে ২০১০ সালের মাঝে বিভিন্ন আয় গোষ্ঠীর মধ্যে মাথাপিছু ভোগ্য ব্যয়ের পার্থক্য কমবেশি এক। ওপরের দিককার ১০ শতাংশ মানুষের আয় নিচের দিককার ১০ শতাংশ মানুষের গড় ভোগ ব্যয়ের পার্থক্য ২০০০ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে কমে গিয়েছিল আবার ২০০৫ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে তা বেড়ে গিয়েছিল। ওপরের দিককার ৫০% আর নিচের দিকের ১০% মানুষের ভোগ ব্যয় তুলনা করে একই ট্রেন্ড পর্যবেক্ষণ করা গিয়েছিল। অন্যান্য ব্যয় গোষ্ঠীর জন্য মাথাপিছু ভোগ ব্যয় একই রকম রয়ে গেছে।[৪৭] এ কারণে মধ্য আয়ের গোষ্ঠী ও ধনীদের মাঝে পার্থক্য তেমন বাড়েনি। আর তাই শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি মোট শহুরে জনগোষ্ঠীর তুলনায় সেভাবে বাড়েনি আর তার অর্থনৈতিক অবস্থাও স্থাবর হয়ে পড়েনি অথবা ধনীদের তুলনায় তার অবস্থান খারাপের দিকে যায়নি। এ কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বর্তমান হারের আয়-প্রবৃদ্ধি ও আয় বণ্টন থেকে যে সুবিধা পাচ্ছে তা এখন পর্যন্ত তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি।

এ ছাড়া সবার আয় যখন বেড়ে গেছে আর ঘুষ, স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতের মাধ্যমে যখন দুর্নীতির ফল শহুরে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির সঙ্গে ব্যাপকভাবে ভাগ করে নেওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান অবস্থার প্রতি এ শ্রেণির যেকোনো পরিবর্তনের দাবিকে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে। ১৯৯১ সাল থেকে পর্যায়ক্রমিক নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের পালাবদল আর মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে প্রবৃদ্ধি ও দুর্নীতির ভাগ ব্যাপকভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মাঝে বণ্টন হচ্ছে।[৪৮] রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ আর অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও সম্পদের প্রবেশাধিকার চালকসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী মধ্যবিত্ত শ্রেণির গঠনে পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থার ফল ব্যাপকভাবে বণ্টনে ভূমিকা রাখছে। এমনকি তরুণ ছাত্র, যাদের মাঝে রয়েছে বেকারেরাও, কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। স্বাধীনতার আগে ও পরে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক বিবর্তনে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ব্যবহার করেছে গণজমায়েত আয়োজনে।[৪৯] সরকারি খাতের চাকরিতে নিয়োগ-প্রক্রিয়া আর সরকারি ক্রয়, চুক্তি ও ব্যবসায়িক টেন্ডারে রাজনৈতিক বিবেচনা ও বরাদ্দ, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থা ও অপশাসন বদলে দেওয়ার জন্য তরুণদের আকাঙ্ক্ষাকে দুর্বল করে দিয়েছে। তরুণদের ভেতর উগ্র গোষ্ঠীগুলো এই সুযোগগুলো থেকে সুবিধা আদায় করছে চাঁদাবাজির মাধ্যমে আর ব্যবসায়ী ও ঠিকাদারদের কাছ থেকে 'সুরক্ষা অর্থ' আদায় করে।

ক্ষমতার পালাবদলের অন্যথা ঘটলে, যদি ক্ষমতাহীন শ্রেণির পালাবদল না ঘটে এবং একটি রাজনৈতিক দল দীর্ঘ সময়ের জন্য ক্ষমতায় থাকে, তবে উদ্ভূত পরিস্থিতি বেশ অস্থিতিশীল হয়ে পড়তে পারে। সাধারণভাবে, বিভিন্ন জায়গার অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যদি অর্থনৈতিক অচলাবস্থা বা বড় আয় অসমতার কারণে অর্থনৈতিক অবস্থা পড়ে যাওয়ার ফলে মধ্যবিত্তের পিঠ দেয়ালে ঠেকে না যায়, তবে প্রতিটি সমাজে মধ্যবিত্তের মাঝে বড় ধরনের পরিবর্তনের জন্য সোচ্চার হওয়া থেকে বিরত থাকার প্রবণতা রয়েছে। কারণ এ ধরনের কোনো নিশ্চয়তা নেই যে বিদ্যমান অবস্থার সুবিধাভোগীদের জন্য পরিবর্তনের আন্দোলন পরিবর্তনের প্রতিরোধকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে। তার ওপর এ ধরনের পরিবর্তনের ফল কী হবে তা আগে থেকে অনুমান করা যায় না। এর সঙ্গে অনেক অপ্রত্যাশিত ফলাফলও জড়িত। আর যদি পরিবর্তনের চাপ সফল হয়ও, পরিবর্তনের ফলে মধ্যবিত্ত যে সুফল পাচ্ছে তা হয়তো বিদ্যমান অবস্থায় তারা যে সুফল পাচ্ছে তার বেশি না-ও হতে পারে। কাজেই এ ধরনের হঠাৎ অথবা বড় ধরনের পরিবর্তন অথবা রাজনৈতিক শক্তির ক্ষমতার পালাবদলের সুবিধা যখন অনিশ্চিত, তখন স্বল্প

মেয়াদে এ ধরনের পরিবর্তনের কারণে কী কী মূল্য দিতে হতে পারে তাই জরুরি হয়ে ওঠে। এর ফলে ক্ষমতায় যারা আছে তারা কর্তৃত্বপরায়ণ হলেও এ শ্রেণি তাদের সঙ্গে আপস করে; এটি তাদের কাছে নিজেদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিশ্চিতে সর্বোত্তম ব্যবস্থা বলে প্রতীয়মান হয়, আর একই সঙ্গে তারা ব্যক্তিগতভাবে অথবা ছোট ছোট দলে এমন একটি ব্যবস্থার কাছে নিজেদের বিক্রি করে, যা তাদেরই পুরস্কৃত করে যারা জানে ভেতরের খবর রেখে কীভাবে এখানে খেলতে হয়। তারা পণ্যমূল্য কম দেখিয়ে লাভ বিদেশে পাচার করে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের পরিবারের সদস্যরাই আমদানিকারক হিসেবে কাজ করে এবং এ কারণে তারা নিজেদের কাছেই রপ্তানি করে আমদানিকারকের লাভটাও পায়। এ ক্ষেত্রে তাদের মুনাফা দেশে পুনরায় বিনিয়োগ না হয়ে বিদেশের আবাসন খাতে বা বাণিজ্য উদ্যোগে বিনিয়োগ করা হয়।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, কেন বাংলাদেশে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর মতো স্বল্পস্থায়ী ও বিচ্ছিন্ন দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন লক্ষ করা যাচ্ছে না। ২০১৩ সালের শুরুতে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার শাহবাগে অনুষ্ঠিত হওয়া শাহবাগ আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের প্রথম সংগঠিত যুব আন্দোলন, যা স্বল্পস্থায়ী ও সংক্ষিপ্ত ছিল এবং এটি মূলত ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। অপশাসন বা দুর্নীতি দাবিদাওয়ার মধ্যে ছিল না। আর তাই দুর্নীতির ব্যাপারে সচেতনতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষিত, শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও ছাত্রদের মধ্য থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।

ছোট, শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিবাদ ও রাস্তার সমাবেশের দ্বারা গড়ে ওঠা এই আন্দোলনের সাফল্যের বিরুদ্ধে আরেকটি কারণ কাজ করছিল। দরকারি প্রশ্নটি হলো দেশজুড়ে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এ ধরনের জমায়েত যথেষ্ট ব্যাপক ছিল কি না। একা একা এ ধরনের আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ কোনো সংস্কারসাধনে খুব কমই সফল হয়, যদি শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি জনগণের বড় অংশের সঙ্গে অথবা বাকি অংশের সঙ্গে জোট না গড়ে তোলে। একটি বৃহৎ জোট গড়ে তোলার জন্য কৃষক ও মজুর শ্রেণির কাছে পৌঁছানোর দক্ষতা অনেক সময়ই তাদের থাকে না। তারা প্রায়ই বিভক্ত থাকে এবং তাদের কোনো নেতা থাকে না যে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে এক ছাদের তলায় এনে নতুন রাজনৈতিক দল তৈরি করে নির্বাচনে লড়ার নেতৃত্ব দেবে। এ ধরনের আন্দোলনের সফলতা নির্ভর করে এমন একজন নেতার ওপর যিনি একটি জোট তৈরি করতে পারেন, যা যথেষ্ট বড় হবে পরিবর্তনের দিকে আন্দোলনকে ধাবিত করার জন্য।[৫০]

প্রতিবার ক্ষুদ্র পদক্ষেপ—তৃণমূল পর্যায়ের কার্যক্রম

বড় পরিবেশে দুর্নীতির এই নিরুৎসাহী অবস্থানের পরও কিছু চিন্তাবিদ ও সমাজ পরিবর্তনকারী মানুষ আছেন যাঁরা পরিবর্তনের জন্য সব আশা ছেড়ে দিতে নারাজ। তাঁরা নিম্ন পর্যায়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সিভিল সমাজের সংস্থা, যার মধ্যে বেসরকারি সংগঠন ছাড়াও রয়েছে কমিউনিটিভিত্তিক গোষ্ঠী ও সংস্থা—স্বনির্ভর গোষ্ঠী, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী সংগঠন, স্বাধীন নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্বাসভিত্তিক গোষ্ঠী, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তাদের তা করা উচিতও। এরই প্রতিফলন ঘটেছে একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগে যা 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে নাগরিকবৃন্দ : স্বচ্ছতার জন্য অংশীদারি' নামে পরিচিত।[৫১] এই আন্দোলন বিশ্বাস করে দুর্নীতিবিরোধী প্রচারাভিযানে সিভিল সমাজের সংস্থাগুলো দুটি প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে। একটি কাজ হচ্ছে দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের, যাদের দায়িত্ব সরকারের বিভিন্ন নির্বাহী বিভাগের কাজ তদারক করা, কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় দুর্নীতি দমন কমিশন, সর্বোচ্চ জাতীয় মহানিরীক্ষক, তথ্য অধিকার আইন, ন্যায়পাল ইত্যাদি। জাতীয় পর্যায়ে তারা সরকারের নীতি ও কাজের পর্যালোচনা করতে পারে; যেমন সরকারের বাজেট ব্যয়ের দিকটি জনগণের জন্য কতটা উন্মুক্ত। এসব সংস্থার জন্য দুর্নীতিবিরোধী প্রচেষ্টার দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে জোরালো দাবি তৈরির জন্য কাজ করা। এখানে মূল ধারণাটি হচ্ছে, পরিবর্তনের বিভিন্ন চালককে উৎসাহিত করা ক্রমশ বড় হতে থাকবে এমন একটি পরিবর্তনের সূচনা করার জন্য এবং তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য। স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি সংস্থাগুলো যে সেবা দিয়ে থাকে, সেখান থেকেই এই পরিবর্তন ভালোভাবে শুরু করা যায়। স্থানীয় পর্যায় সরকারি সংস্থাগুলোর সেবা কার্যক্রমে যে দুর্নীতি হয়ে থাকে তার প্রভাব সরাসরি গরিব মানুষের ওপর পড়ে। এই কাজ দুটির ফলে জনগণের সচেতনতা বাড়ানোর সুযোগ যেমন থাকছে, তেমনি তাদের একত্র করে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তোলার সুযোগও রয়েছে। ফলে দোষী সরকারি কর্মকর্তাদের মুখোশ উন্মোচনের পাশাপাশি তাদের জবাবদিহি করার অধিকারের ব্যাপারেও জনগণকে সচেতন করা যাচ্ছে।

সিভিল সমাজের সংস্থাগুলোর জন্য এ ধরনের পদক্ষেপের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে ১. স্থানীয় পর্যায়ে জনসেবায় যে দুর্নীতি হয়ে থাকে তা ভিত্তি জরিপের মাধ্যমে খুঁজে বের করা ও তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা, ২. দুর্নীতির ব্যাপকতা প্রচারের জন্য স্থানীয় গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে প্ররোচিত করা; ৩. দুর্নীতির পর্যবেক্ষণ, উন্মোচন ও এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন নাগরিক গোষ্ঠী যেমন : স্বেচ্ছাসেবকদের গোষ্ঠী, স্বনির্ভর দল ইত্যাদি গড়ে তোলা; ৪. স্থানীয় সেবা খাতের বিভিন্ন সুবিধা ও দুর্বলতা নিয়ে নাগরিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সমাজকর্মী, কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবক গোষ্ঠী, যুব সংগঠন, স্থানীয় পর্যায়ের সেবাদানকারী ও স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় সহায়তা প্রদান; ৫. গ্রাম পর্যায়ে সভা ও গণশুনানির আয়োজন করা, যেখানে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের উচ্চ কর্মকর্তা, প্রশাসক ও সরকারি কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে; সভা ও শোভাযাত্রা করা এবং জরিপ ও গ্রুপ মিটিংয়ে প্রাপ্ত দুর্নীতির বিস্তারিত বর্ণনা জানিয়ে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছে ও মিডিয়ার কাছে চিঠি দেওয়া এবং ৬. উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা সিভিল সমাজের সংস্থার শক্তি সম্পর্কে আশ্বস্ত হয়ে চিঠির উত্তর দিলে, উচ্চ পর্যায়ের তদারককারীদের ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে সভার আয়োজন করা এবং নাগরিক গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সংলাপে বসা এবং প্রতিকার ব্যবস্থার করণীয় নির্ধারণ করা।

স্থানীয় পর্যায়ের জনগোষ্ঠীকে দ্রুত কাজে লাগানোর জন্য তাদের গণজমায়েত সফলভাবে সংগঠিত করতে চাইলে সিভিল সমাজের সংস্থাগুলোর একটি জিনিস দরকার। আর তা হলো একদল উৎসর্গীকৃত ও বিশ্বস্ত সমাজকর্মী যাদের প্রমাণ সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে সেবা গ্রহণকারী গোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করার একই সঙ্গে নাগরিকদের পাহারাদার হিসেবে নিজেদের নিয়োজিত রাখার জন্য স্বেচ্ছাশ্রমের ইচ্ছা রয়েছে। এ ছাড়া সরকারি কর্মকর্তা ও সেবা প্রদানকারীর তদারককারীদের— স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের—সহায়তা পাওয়ার এসব প্রচেষ্টার জন্য কিছু সরকারি কর্মকর্তা বা তদারককারীদের, যারা সেবা প্রদানে আগ্রহী ও উৎসাহী এবং যাদের একাত্মতা রয়েছে, চিহ্নিত করা দরকার যারা সমাজের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে আলোচনায় বসবে এবং সেবা প্রদানের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ও ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য সুবিধাভোগীদের দরকারি তথ্য প্রকাশ করবে। এই কৌশলের প্রবক্তারা জোর দিয়ে থাকে যে স্থানীয় পর্যায়ে কিছু কর্মকর্তা বা রাজনীতিবিদ রয়েছে, যারা দুর্নীতিবিরোধী ছোট পদক্ষেপের ব্যাপারে আগ্রহী।

আশা করা হয়ে থাকে যে ছোট ছোট পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাফল্যের একটি 'স্নো বল' (নুড়ি আকারের ছোট ছোট বরফখণ্ড ঢালু পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে পড়তে পড়তে বিশালাকার ধারণ করে) ইফেক্ট রয়েছে এবং তা ধীরে ধীরে অন্যান্য ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়বে। এটি বিশ্বাস করা হয় 'নিযুত কর্মকাণ্ডের যোগফল আমাদের মোড়-ঘুরিয়ে-দেওয়া অবস্থানের দিকে নিয়ে যায়।' একই সময়ে ছোট ছোট পদক্ষেপের এই পন্থা বড় পরিসরের প্রচেষ্টাকে সাহায্য করে, তবে এগুলো এসব প্রচেষ্টার

কোনো অংশ নয়। বিরাজমান অর্থসামাজিক অবস্থা যখন প্রতিষ্ঠানগুলোতে এবং নীতিতে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে, তখন তারা (এসব পদক্ষেপ) কোনো ধরনের কর্মকাণ্ডহীনতার চেয়ে অনেক শ্রেয়। ৫৩টি দেশে ২০০ প্রকল্প এই প্রক্রিয়ায় সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, যা স্থানীয় ও আংশিকভাবে জাতীয় পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে সফল হয়েছে। সময়ই বলে দেবে এ ধরনের বাড়তে থাকা সংস্কার, তৃণমূল পর্যায়ে ছোট প্রকল্পের মধ্য দিয়ে, অর্থনীতিতে 'দুনিয়া-ওল্টানো' পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যাবে কি না।

ওপরের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে বড় আকারের পরিবর্তন ঘটাতে চাইলে এবং তৃণমূল পর্যায়ে এসব বাড়তে থাকা সংস্কার-প্রক্রিয়া সফল হতে হলে একগুচ্ছ কঠোর শর্ত দরকার : যেমন যথেষ্ট যোগ্যতা ও একাত্মতা আছে এমন এনজিও নেতার প্রাপ্যতা, সেবার প্রতি উৎসর্গীকৃত এবং একাত্মতা রয়েছে এমন সরকারি কর্মকর্তার প্রাপ্যতা, একটি ইচ্ছুক ও সহযোগী সরকার যারা এনজিওগুলোর যথেষ্ট কাজের স্বাধীনতা দেবে এবং অর্থায়নের স্বাধীন উৎস নিশ্চিত করবে, যাদের মধ্যে রয়েছে বৈদেশিক সহায়তাও, যা আন্তর্জাতিক সিভিল সমাজের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে দেওয়া হবে এবং যা দাতাদের নীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন। বাংলাদেশে যখন বেশ কিছুসংখ্যক এনজিও রয়েছে যারা সেবা ও উৎপাদন খাতে সেবা প্রদানে নিয়োজিত, যাদের কারও কারও আন্তর্জাতিক সুনাম রয়েছে, তাদের অধিকাংশই সেবা প্রদানকারী অথবা ঠিকাদার হিসেবে সরকারি তহবিল অথবা দাতাদের সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। তাই তাদের দুর্নীতি দমন প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দিতে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। সরকারি সংস্থার সেবা প্রদানের অনুপুঙ্খ জরিপ, পরিবেশ, নারীর অধিকার, মানবাধিকার ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু ছোট এনজিও পর্যবেক্ষক ও পাহারাদারের ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে তাদের সম্পদ বেশ কম এবং তারা বেশি করে দাতাদের সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। তবে উপরোল্লিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নাগরিকদের সংগঠিত করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার করার মতো কাজ তাদের পরিধির মধ্যে নিয়ে আসা কিছুসংখ্যক এনজিওর পক্ষে সম্ভব। অর্থায়নের উৎসের জন্য তাদের দরকার তাদের কার্যক্রমে পরিচিত ও আর্থিকভাবে সম্পদশালী আন্তর্জাতিক সিভিল সমাজের সংস্থাগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া।

বাইরের চাপ

একটি গুরুত্বপূর্ণ ও যথোপযুক্ত প্রশ্ন হচ্ছে বাইরের ফ্যাক্টরগুলো 'পরিবর্তনের চালক' হিসেবে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন প্রচেষ্টায় কোনো ভূমিকা পালন করতে পারে কি না। সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মাঝে দুর্নীতির ব্যাপারে

সচেতনতা ও মনোযোগ অনেক বেড়েছে। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে পদক্ষেপ নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ইচ্ছা ও সচেতনতার প্রতিফলন হচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন।[৫২] এটি অংশত এ কারণে যে একটি দেশের দুর্নীতি আরেকটি দেশে প্রভাব ফেলে, কারণ এটি অন্য দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে, দুর্নীতি কোনোভাবেই সীমান্ত অতিক্রমকারী প্রভাবহীন কোনো অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়। সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে একটি দেশের সম্পদ চুরি করে অন্য দেশে পাচার করে দেওয়া। টাকা পাচার দুর্নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ফল।

জাতিসংঘ কনভেনশন, যাতে বাংলাদেশ একটি স্বাক্ষরকারী দেশ, কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নয় বরং একটি স্বেচ্ছাচুক্তি যেখানে দেশগুলোকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জোর দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতির সব অলিগলি নিয়েই এখানে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের ব্যাপারে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার সুপারিশও করা হয়েছে এবং একগুচ্ছ সমন্বিত মানদণ্ড, ব্যবস্থা ও নিয়ম উপস্থাপন করা হয়েছে 'যেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আইনি ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য সব দেশ এগুলো প্রয়োগ করতে পারে'। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারাটি দুর্নীতিবিরোধী সংস্থাগুলোকে নিয়ে। এ ধারায় বলা হয়েছে, এসব সংস্থার সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য 'ক. দরকারি সম্পদ, খ. বিশেষায়িত জনবল এবং গ. প্রশিক্ষণ তাদের প্রদান করতে হবে।' কনভেনশন এ ধরনের প্রচেষ্টার প্রসারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সহায়তার আহ্বান জানিয়েছে। অনেক দরকারি ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নিচে তুলে ধরা হলো :

- দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি পদে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে জনবল নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং যথাসময়ে যেখানে দরকার এসব কর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলি করা।
- নির্বাচিত সরকারি অফিসের জন্য প্রার্থীদের অর্থায়ন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থায়নে স্বচ্ছতা আনা।
- জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে স্বার্থের সংঘাত হতে পারে এমন সব উপহার বা সুবিধা, সম্পদ, বিনিয়োগ, চাকরি, বাইরের কার্যক্রম সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সরকারি কর্মকর্তাদের বিবরণী প্রদান।[৫৩]
- যথাযথ ক্রয়-প্রক্রিয়াব্যবস্থা গ্রহণ যা স্বচ্ছতা ও প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে তৈরি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নির্মোহ মানদণ্ড অনুসরণ করা, যা দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

- ক্রয়-প্রক্রিয়া ও চুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্য জনগণের সামনে প্রকাশ করা, যার মধ্যে রয়েছে টেন্ডার আহ্বানের ও চুক্তির দরকারি ও যথোপযুক্ত তথ্য। এর ফলে টেন্ডার জমাদানকারীরা যথেষ্ট সময় পাবেন টেন্ডার তৈরি ও জমা দেওয়ার জন্য।
- যথাযথ নিয়ম মেনে আবেদন করা হয়েছে কি না তা যাচাই করার লক্ষ্যে, কার্যকর অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনার ব্যবস্থা যাতে আছে আপিল করার কার্যকর ব্যবস্থা এবং যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করা না হলে আইনি সহায়তা ও প্রতিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি ক্রয়-প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্তের জন্য নির্মোহ ও পূর্বনির্ধারিত মানদণ্ড ব্যবহার করা।
- ক্রয়-প্রক্রিয়ার দায়িত্বে থাকা লোকবলের বিষয়াদি যেমন কোনো সরকারি ক্রয়-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ, যাচাই-প্রক্রিয়া এবং প্রশিক্ষণ চাহিদা নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ক. জনপ্রশাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায়, কার্যক্রমে ও সংগঠনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। আর তা করতে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও তথ্যের সুরক্ষা বিবেচনায় নিতে হবে। খ. জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট আইনি কর্মকাণ্ডে এবং সিদ্ধান্তে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা; এবং
- দক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের কাছে জনগণ যেন তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারে সে জন্য যেখানে প্রয়োজন প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সহজ করা এবং জনপ্রশাসনে দুর্নীতির ঝুঁকির ওপর পর্যায়ক্রমিক প্রতিবেদনের মতো তথ্য প্রকাশ করা।

বর্তমান ও ভবিষ্যতের সরকারগুলো যে এই কনভেনশন বাস্তবায়নে দায়বদ্ধ তা মনে করিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে সিভিল সমাজ, থিংক ট্যাংক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কনভেনশনের ধারাগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।[৫৪] নৈরাশ্যবাদীরা বলতে পারে এই ধরনের প্রচারণায় বাংলাদেশের সরকারগুলোর টনক নড়ে না। তবে জনমতকে চাঙা রাখার জন্য চাপ অব্যাহত রাখলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। এটি জানা নেই কখন ও কীভাবে এই মনে করিয়ে দেওয়া ও চাপ প্রয়োগ কাজে আসতে পারে। আসলে যতবারই বড় ধরনের দুর্নীতি সংঘটিত হয় মিডিয়া ও সিভিল সমাজের দরকার সরকার ও জনগণকে কনভেনশনে এসব দুর্নীতির সংশ্লিষ্ট ধারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের করণীয় মনে করিয়ে দেওয়া। সরকারের ভেতরে ও বাইরে কনভেনশনের ধারা নিয়ে আলোচনা সংস্কারবাদীদের জন্য কাজ করার সুযোগ করে দেবে। দুর্নীতিবিরোধী ব্যবস্থার অগ্রগতির পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা, সংস্কারপ্রক্রিয়ার পর্যায়ক্রমিক ঝুঁকি ও সমস্যা

চিহ্নিত করবে।[৫৫] বর্তমানে বাইরের দুটি ফ্যাক্টর বাংলাদেশকে পরিবর্তনের দিকে ধাবিত করছে: ১. বৈদেশিক সাহায্য সংস্থা এবং ২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক অংশীদার। উন্নত দেশগুলো বাংলাদেশে বাণিজ্য/বৈদেশিক সাহায্যে ও নানা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ কনভেনশনকে সরকারের দুর্নীতি দমনবিরোধী এজেন্ডার প্রতি দায়বদ্ধতা মূল্যায়নের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। তারা এটিকে সরকারগুলোর সঙ্গে আলোচনার দরকারি উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অর্থায়নে যেন কোনো ধরনের দুর্নীতি না হয় সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনে উন্নত দেশের সরকারগুলো তাদের আইনপ্রণেতা ও জনমতের কাছ থেকে বেশ চাপের মুখে থাকে। এই প্রবণতা উন্নত দেশগুলোতে তুলনামূলকভাবে বেশ নতুন। দুই দশক ধরে এই প্রবণতা বাড়ছে। সাহায্য ব্যবহারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য সাহায্য সংস্থাগুলোর মাঝে উচ্চ সচেতনতা দেখা যাচ্ছে মূলত আংশিকভাবে বহু দেশের চাহিদার মুখে সাহায্য তহবিলে ঘাটতি দেখা দেওয়ার কারণে এবং আংশিকভাবে কোনো ধরনের সাহায্য চাইব এই ধরনের উদ্দেশ্য বেড়ে যাওয়ার কারণে।[৫৭]

ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে, দাতাদেশ/সংস্থাগুলো ক. তাদের সহায়তা কর্মসূচিতে দুর্নীতি কমাতে এবং এসব সুরক্ষা দিতে, খ. সরকারের সংস্থার উন্নয়নে সাহায্য ও উপদেশ দিতে এবং অর্থনীতিজুড়ে দুর্নীতির ব্যাপকতা কমাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এই দুটি কারণ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। দেশে যদি ব্যাপক দুর্নীতি থাকে তবে সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহকে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা বেশ কঠিন। বাজেট সহায়তা অথবা ব্যালান্স অব পেমেন্ট সহায়তায় যেসব সম্পদ ব্যবহার করা হয় তাদের আলাদা করা যায় না। এখানে অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার আলাদা করা যায় না। বাজেট সম্পদের সার্বিক ব্যবহারে, যাতে রয়েছে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও সরকারি ব্যয়ের নিরীক্ষা, দুর্নীতির ব্যাপকতা কমাতে নজর দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পগুলোকে দুর্নীতির প্রকোপ থেকে রক্ষা করা গেলেও, সরকারি খাতে সমন্বিত সম্পদ ব্যবহারে, যার মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ সম্পদ, দুর্নীতি প্রবৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সমন্বিত সম্পদ অপব্যবহার বা ভুল ব্যবহারের কারণে সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের উপকারী দিকগুলো কমে যায়। এ কারণে দাতা সংস্থাগুলো প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান, যাতে রয়েছে বিচার, আইন রক্ষাকারী বাহিনী, জনপ্রশাসন সিভিল সমাজ, সরকারের কার্যকারিতা—যারা সার্বিক অর্থনীতির শাসনকে প্রভাবিত করে, শক্তিশালী করার জন্য সহায়তা প্রদান করে। সাহায্যগ্রহীতা দেশের উন্নয়নে দাতাদের অংশগ্রহণ যত বাড়বে, শাসনব্যবস্থার

উন্নয়নে সমন্বিত সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না তা নিশ্চিতে তাদের উৎসাহও তত বাড়বে। একদিকে যখন ঋণদানকারী সংস্থাগুলো উদ্বিগ্ন দুর্নীতির ব্যাপারে এবং ঋণ বাতিল করে দেয় দুর্নীতি ধরা পড়লে, অন্যদিকে এসব সংস্থার মাঝে তাড়না আছে সাহায্য করার বাংলাদেশের মতো গরিব দেশগুলোকে, যাদের কারণেই তাদের তৈরি করা হয়েছে। তাই এই দুটো সাংঘর্ষিক বিবেচনার মাঝে একধরনের ভারসাম্য বজায় রাখা দরকার। আর এই সিদ্ধান্তটি ঋণদানকারী সংস্থাগুলোকে অবশ্যই নিতে হবে একটির পর আরেকটি বিষয়ের ক্ষেত্রে।[৫৮] দাতা সংস্থাগুলো যেমন বিশ্বব্যাংকের বিশেষায়িত বিভাগ 'ইন্টেগ্রিটি অফিস' স্থাপন করেছে তাদের প্রকল্পে যেন দুর্নীতি না হয় সেটি দেখভাল করার জন্য এবং দুর্নীতি হলে তদন্ত করার জন্য। অনেক দেশে যার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশও, দুর্নীতি ধরা পড়লে বিশ্বব্যাংক ও অন্য দাতা সংস্থা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাঝপর্যায়ে সহায়তা ছাড়ের অর্থ বন্ধ করে দিয়েছে। পৃথিবীজুড়েই বড় আকারের অবকাঠামো প্রকল্প যেমন সেতু, মহাসড়ক, রেলপথ, বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর ইত্যাদি নির্মাণ চুক্তি ও ক্রয়-প্রক্রিয়ায় সম্পদ অপব্যবহারের ও দুর্নীতির বড় ধরনের সুযোগ রয়েছে। এ কারণে সব জায়গায় বড় ব্যয় ও অবকাঠামো প্রকল্পের সম্ভাব্য দুর্নীতি দাতাদের মাঝে বড় ধরনের উদ্বেগ তৈরি করে।[৫৯] এই প্রকল্পগুলো চোখে পড়ার মতো বড় এবং উন্নত দেশের ঠিকাদার ও পরামর্শক যারা ক্রয়, বাস্তবায়ন ও তদারকি চুক্তি পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করে থাকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশ পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমের কাঠামো ও দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করার জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর, যেমন বিশ্বব্যাংক ও অন্য দাতাদের, নিজস্ব শাসন ও দুর্নীতিবিরোধী কৌশল রয়েছে।[৬০] যেমন ২০০৬-২০০৯ সময়কালে বাংলাদেশের জন্য বিশ্বব্যাংকের সহায়তা কৌশল নিচের বিষয়গুলোর প্রতি জোর দিয়েছিল : ১. পূর্ণ কর্মক্ষম দুর্নীতি দমন কমিশন; ২. আইন ও বিচার বিভাগের সংস্কার-প্রক্রিয়ার ভিত্তি স্থাপন; ৩. মানুষের দাবির ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তার অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করা। পরবর্তী সময়ে ২০১০ সালে ব্যাংকের বাংলাদেশ অংশীদারি কৌশলের মনোযোগ স্থানান্তরিত হয় ভিন্ন সব বিষয়ের প্রতি : ক. সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা, খ. ক্রয়, গ. স্থানীয় সরকার, ঘ. সেবা প্রদান এবং ঙ. সিভিল সমাজ (সুশাসনের দাবি)।[৬১]

বাংলাদেশে অন্য দাতাগোষ্ঠী (যেমন নরডিক দেশগুলো ও ডিএফআইডি) উন্নয়নে অংশ নিতে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছিল এবং তা তেমন সুনির্দিষ্ট ছিল না।[৬২] তারা তাদের সহায়তা কর্মসূচিতে শাসনের এজেন্ডা ঢুকিয়েছিল, যা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ক. উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের জাতীয় কৌশল ও দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে এবং খ. জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনের (ইউএনসিএসি) বিধিমালায়। এই দুই দিকনির্দেশনা মেনে তাদের সুনির্দিষ্ট সহায়তা কর্মসূচিগুলো আমলাতন্ত্রের সংস্কার, বিচার বিভাগ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার শক্তিশালীকরণ, সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা, নির্বাচন কমিশন ও তার বিধিমালা এবং তার ক্রয়-প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। তারা বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনকে সহায়তা প্রদান করেছে এবং একই সঙ্গে তথ্য আইনের স্বাধীনতা তৈরিতে সাহায্য করেছে। এসব দাতার কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া বেশ কিছু সংখ্যক সিভিল সমাজের সংস্থাগুলোর মাঝে রয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, মানবাধিকার রক্ষাকারী সংগঠন যার মধ্যে রয়েছে নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা সংস্থা, শ্রমিকদের সংগঠন, আইনি সেবাদানকারী সংগঠন, পরিবেশবাদী গোষ্ঠী এবং থিংক ট্যাংক। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য চাপ বা জনমত তৈরির মাধ্যমে এবং দুর্নীতির ব্যাপারে ব্যাপক সচেতনতা বাড়ানোর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে তাদের দেখেছে দাতারা (পরিশিষ্ট খ.১ এবং পরিশিষ্ট খ.২)।

দাতাদের দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় দেওয়া বিভিন্ন ধরনের সহায়তার মধ্যে ছিল দুর্নীতিবিরোধী কর্মকাণ্ড ও সুশাসন নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কার্যক্রমের উন্নয়ন এবং তাদের পেশাগত ও কারিগরি সামর্থ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা কারিগরি সহায়তা। ক. বিভিন্ন সংস্থার কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, খ. ওয়ার্কশপ, সেমিনার এবং কনফারেন্সের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আইডিয়ার প্রচার এবং গ. উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও প্রশাসনের কাজ যুগোপযোগী করার জন্য নানা উপকরণ সরবরাহের এই সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে দাতাদের নিজস্ব দুর্নীতিবিরোধী কৌশল অনুসরণ করতে গিয়ে, যা তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, দাতাদের অভিজ্ঞতা কি ছিল? ২০১১ সালে বাংলাদেশ নিয়ে বিশ্বব্যাংকের মূল্যায়ন প্রতিবেদন বলছে : দুর্নীতি দমন কমিশনের কাজ এবং একাত্মতা পরিবেশ যে ধারায় কাজ করছে তা বেশ আশাপ্রদ নয়, কারণ দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে এটি বাছাই করা কিছু দুর্নীতির তদন্তকাজ করে থাকে; তদন্তগুলো প্রায়ই পুরো প্রক্রিয়ার অন্যান্য অংশ (যেমন মামলা তৈরি ও পরিচালনা, বিচার ও শাস্তি প্রদান) থেকে তেমন সহায়তা পায় না। ব্যাংকের 'বিশ্বাসযোগ্য পুঁজি ব্যবস্থাপনার' কারণে ব্যাংক নিজেকে জাতীয় মহাসড়কের প্রকল্প থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এটি ব্যাংকের অর্থায়নে বড় ধরনের কোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান করতে পারেনি। আমলাতন্ত্রের সংস্কারের অগ্রগতি গতি খুব ধীর; সরকারি মন্ত্রীরা নির্দেশনা দিয়ে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন এবং স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণ বাড়াতে যে অতিরিক্ত চেষ্টা, সময় এবং ঝুঁকির দরকার তা দিতে নারাজ।[৬৩]

বেশ কিছু কারণে বিশ্বব্যাংক দেখেছে সিভিল সমাজের সংস্থাগুলোকে চাঙা করে সুশাসনের দাবি জোরদার করা 'বেশ জটিল'; সিভিল সমাজের সংস্থাগুলো বেশি মনোযোগ দিয়ে থাকে সেবাদানের দিকে অ্যাডভোকেসির বদলে, কারণ আগেরটি রোজগার জোগায় আর পরেরটি 'জীবন ও জীবিকা হুমকির মুখে ঠেলে দেয়';

সরকারের কাছ থেকে তহবিল নিয়ে সেবা প্রদানে নিয়োজিত এনজিওগুলোর তোলা দাবি বাধাগ্রস্ত হয় ক. তাদের দুর্বল সামর্থ্যের কারণে খ. রাজনৈতিকীকরণ যা অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীন পর্যবেক্ষণের জন্য বিশ্বাসযোগ্যতা হারানোর কারণে, এবং গ. সাবকন্ট্রাক্টিং এনজিওর কাজে সরকারের অনধিকারচর্চার কারণে। একই সময়ে দাতাদের সাহায্য পাওয়া এনজিওগুলো অনেক সময়ে দাতাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করে বলে অভিযুক্ত করা হয়।

বাংলাদেশে শাসনের রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে বিশ্বব্যাংকের সার্বিক পর্যালোচনা ছিল নিম্নরূপ, 'শাসক দল জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ার বদলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর খুব কমই আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা রয়েছে, যা বিরোধী দল ব্যবহার করে সরকারকে জবাবদিহি করতে পারে। সংসদ ও বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের উল্লেখযোগ্য তদারকি করে না।'

অন্য দাতাদের দুর্নীতিবিরোধী প্রচেষ্টার যৌথ মূল্যায়ন, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, উপসংহার টেনেছে যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ, প্রশাসন, নিরীক্ষা এবং হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থায় যে সহায়তা দেওয়া হয়েছে তা তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি। ক. প্রশিক্ষণ ও খ. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাব্যবস্থায় সাহায্যের মাধ্যমে প্রধান সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন আইন রক্ষাকারী সংস্থা ও আমলাতন্ত্রে একাত্মতা প্রসারে তাদের চেষ্টা খুব কমই সফল হয়েছে। শক্তিশালী নৈতিকতা, স্বচ্ছতা এবং সরকারি অভিযোগ-প্রক্রিয়া উৎসারিত করতে, তারা মিডিয়া ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করেছে। তবে মিডিয়ার সঙ্গে তাদের কাজ বেশ সীমাবদ্ধ ছিল।[৬৪]

তারা বাংলাদেশে দুর্নীতির ব্যাপকতা ও প্রক্রিয়াগত দিকটির ওপর জোর দিয়েছে, যা দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে; এনজিও, সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, বেসরকারি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের জন্য এটি হচ্ছে 'কাজ আদায় করে নেবার একটি বৈশিষ্ট্য'। তার ওপর এটি ছড়িয়ে পড়েছে পুলিশ ও বিচার বিভাগে যাদের ভূমিকা ছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়ার। তাই সরকারি সংস্থাগুলো খুব কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, যদি না অন্য বিবেচনা যেমন বড় ধরনের দাবি, প্রতিযোগিতাকে সহযোগিতা করা এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া উন্নত

করা হিসেবের মধ্যে নেওয়া হতো। উঠতি ও দরকারি পরিবর্তনের নিয়ামকের যেমন : বেসরকারি খাত, পেশাদার ও সিভিল সমাজের সংগঠন এবং মিডিয়ার মধ্যে শেষের দুটি গতিশীল ও শক্তিশালী। কিন্তু তারা সব সময়ই স্বাধীন নয় এবং তারা নিজেরাই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে।

দাতাদের সার্বিক পর্যালোচনায় মনে হয় যে তারা জোর দিচ্ছে অভ্যন্তরীণ ফ্যাক্টরগুলোর ওপর, যা দাতারা কাটিয়ে উঠতে পারবে না। এদের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি, সংসদ ও বিচার বিভাগের অপর্যাপ্ত ও অদক্ষ তদারকি ভূমিকা, রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়বদ্ধতার ঘাটতি এবং দুর্নীতিবিরোধী প্রচেষ্টায় জনগণের চাপ তৈরিতে সিভিল সমাজের সংস্থাগুলোর সীমাবদ্ধতা।

তবে দাতারা শুধু দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অভ্যন্তরীণ দায়বদ্ধতায় সাহায্য অথবা সহযোগিতা দিতে পারে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্যের মাধ্যমে এবং বাংলাদেশের মতো অন্যান্য দেশে দুর্নীতি দমনবিরোধী প্রচেষ্টার শিক্ষা বাংলাদেশে নিয়ে আসতে পারে অনুসরণের জন্য।

দাতারা দুই ধরনের ডিলেমার মুখোমুখি হয়ে : একটি ডিলেমা হচ্ছে 'ব্যয় করার চাপ' যা তাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির বিরুদ্ধে যায়। দ্বিতীয় ডিলেমাটি হচ্ছে, ১৬ কোটি মানুষের গরিব দেশ বাংলাদেশকে, যার সাহায্যের দরকার, ঠিক কী পরিমাণ সহায়তা দিতে হবে তা নির্ধারণ, অন্যদিকে উৎপাদনশীল, দুর্নীতিমুক্ত সাহায্যের ব্যবহার নিশ্চিত করা।[৬৫]

সাহায্য ছাড়াও বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কও কোনো কোনো সময় দুর্নীতির ব্যাপকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশে এর প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানা রয়েছে এমন একটি ভবন ধসে পড়ার পর আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া দেখে। অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা এবং মুহূর্তের মধ্যে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার এই সময়ে যেকোনো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কৌশলগত ঘটনার খবর পৃথিবীর সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ঘটনা ও বিপর্যয়সংক্রান্ত ঘটনার ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে সত্যি।[৬৬]

সস্তা পোশাকের রপ্তানিকারক হিসেবে তৈরি পোশাকের আন্তর্জাতিক পদচারণা বেশ চোখে পড়ে। বাংলাদেশ চীনের পর তৈরি পোশাকশিল্পের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা ২০০৭ থেকে ২০১২ এই পাঁচ বছরে দ্রুত বেড়েছে, ২০০৭ সালে ১৬ মিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২০১২ সালে ইইউ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০ বিলিয়ন ডলারে। বাংলাদেশের 'ব্র্যান্ড' সুনাম বিশ্বে হুমকির মুখে পড়তে পারে বলে একধরনের উদ্বেগ ছিল, কারণ বাংলাদেশ বিক্রি বাড়ানোর চেষ্টা করছিল অন্যান্য সস্তা পণ্য

রপ্তানিকারক উন্নয়নশীল দেশের রপ্তানিকারকদের সঙ্গে যেমন : কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, মিয়ানমার ইত্যাদি।

ভবন নির্মাণে মানদণ্ড নিশ্চিতে এবং একই সঙ্গে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে বাংলাদেশের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ছিল। আর এই চাপের উৎসগুলো হচ্ছে ক. আমদানিকারক দেশের আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রম আন্দোলনকর্মী, মানবাধিকারকর্মী এবং ভোক্তা গোষ্ঠী আর একই সঙ্গে খ. আমদানিকারক দেশগুলোর সরকার যারা বাংলাদেশে রপ্তানির জন্য বিশেষ বাণিজ্য সুবিধা প্রদান করে থাকে (জিএসপি, শুল্ক ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধা)। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইইউ যা বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের এক গুরুত্বপূর্ণ আমদানিকারক দেশ। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র তৈরি পোশাক রপ্তানি ছাড়া বাংলাদেশের রপ্তানির জন্য বিশেষ কিছু বাণিজ্য-সুবিধা দিয়ে থাকে। শ্রম আন্দোলনকর্মী এবং মানবাধিকারকর্মীদের চাপের মুখে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ২০১৩ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশের রপ্তানির ওপর বাণিজ্য-সুবিধা স্থগিত করে, যদিও ইইউ তাদের জিএসপি প্রত্যাহার করেনি। তবে তারা বাংলাদেশে নিচু নিরাপত্তা মান নিয়ে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, সঙ্গে ছিল প্রচ্ছন্ন হুমকি, যদি বাংলাদেশ তার নিরাপত্তা মানের উন্নয়ন না ঘটায় তবে এর বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা ইইউ নিতে পারে।[৬৭]

এ ছাড়া আমদানিকারক ও বিদেশে বাংলাদেশি পোশাকের খুচরা বিক্রেতারা সেখানকার মানবাধিকারকর্মী, শ্রম আন্দোলনকর্মী ও ভোক্তাদের কাছ থেকে চাপের মুখে পড়েন, যেন তাঁরা আমদানিকারক দেশে কারখানার নিরাপত্তা মান অনুসরণ করতে পরিদর্শনকাজ জোরদার করার জন্য চাপ দেন। বাংলাদেশের ওপর, সরকার ও রপ্তানিকারকদের ওপর চাপ তাই বহু উৎস থেকে উৎসারিত।

কারখানাগুলোতে কাজের পরিবেশের তদারকব্যবস্থার উন্নতিতে বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বেশি ও ক্রমাগত চাপের মুখে বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। দেশের কারখানাগুলোতে বিধিমালা প্রয়োগে শ্রম মন্ত্রণালয়ের সামর্থ্যের ঘাটতি বড় ধরনের প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে।[৬৮] বাংলাদেশে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ শ্রমিকদের নিরাপত্তার মান, যার মধ্যে রয়েছে ভবন নির্মাণের বিষয়টিও, সদস্য কারখানাগুলোর ওপর একটি জরিপ পরিচালনা করেছিল। বাংলাদেশ সরকার একটি শ্রম আইন তৈরি করেছিল দুর্ঘটনার পরপর।[৬৯]

এর বাইরে এই শিল্প ও আইএলওর সঙ্গে মিলে একটি অ্যাকশন প্ল্যান নিতে সম্মত হয়েছে। কারখানা মালিক, আইএলও এ শিল্পের সঙ্গে মিলে কাজ করবে সংস্কার সুপারিশের জন্য, যার মধ্যে রয়েছে ইউনিয়ন গড়ার অধিকার, সম্মিলিত

দর-কষাকষির ব্যবস্থা এবং কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ বছরের শেষ নাগাদ সরকার এ শিল্পের সঙ্গে মিলে সব পোশাক কারখানার একটি সমন্বিত নিরাপত্তা পর্যালোচনা করতে যাচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে স্ট্রাকচারাল ইন্টেগ্রিটির একটি বিশ্লেষণ এবং অগ্নিনিরাপত্তাব্যবস্থা, সঙ্গে আছে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা যাতে অন্তর্ভুক্ত আছে নিরাপত্তাঝুঁকিতে থাকা ভবন থেকে কারখানার স্থানান্তর।[৭০]

আলোচিত ঘটনা এটিই নির্দেশ করে কীভাবে শ্রমিকদের নিরাপত্তার দিকটি উপেক্ষা করে কেবল উচ্চ মুনাফার লোভে পড়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি তদারকি সংস্থা, আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকেরা মিলে একটি আঁতাত গড়ে তুলেছিল। এটি আরও দেখায় যে যখন অপশাসন আর দুর্নীতি বড় ধরনের দুর্যোগ ঘটায় তখন অর্থনৈতিক খাত যেগুলো আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত এবং যাদের রয়েছে ব্যাপক আন্তর্জাতিক পদচারণা তাদের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী যেমন : শ্রম সংগঠন, বিদেশি ভোক্তা এবং আমদানিকারক দেশগুলোর সরকারের জন্য উদ্বেগের বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর বাণিজ্যিক অংশীদারদের এই উদ্বেগ ও প্রতিক্রিয়া সরকারকে বাধ্য করে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে। তবে বহির্বাণিজ্যের এই সম্পর্ক, যা অর্থনীতির একটি নির্দিষ্ট খাতের শাসনব্যবস্থার উন্নতি ঘটাচ্ছে, তার নজির খুব কম ও বিরল।

তবে শেষ পর্যন্ত সাহায্য ও বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে তৈরি হওয়া বাইরের এই চাপ দেশে দুর্নীতির ব্যাপকতা কমাতে তেমন কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখছে না। এটি দাতারাও স্বীকার করেছে; তাদের চরম অস্ত্র হচ্ছে, যখন সাহায্যপুষ্ট কোনো প্রকল্পে দুর্নীতি ধরা পড়ে, সাহায্য প্রত্যাহার করে নেওয়া। আর তাই দুর্নীতির পরিবেশের উন্নতি ঘটাতে তাদের অবদান খুব সামান্যই। এ ক্ষেত্রে দাতারা একটি ডিলেমার মুখোমুখি হয় : দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে চাপ প্রয়োগের জন্য গরিব দেশ থেকে সাহায্য প্রত্যাহারের নেতিবাচক দিক রয়েছে গরিবদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নানা সুবিধার ওপর ও আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে। তা ছাড়া গরিবদের জন্য সাহায্য প্রত্যাহারের ত্বরিত প্রভাব হচ্ছে দুর্নীতি কমানোর দীর্ঘস্থায়ী সুফলকে ত্যাগ করার মতো চরম মূল্য দেওয়া। তবে তারা তাদের নির্দিষ্ট সাহায্য প্রকল্পগুলোতে দুর্নীতি থেকে বাঁচতে 'বেড়া দেবার' চেষ্টা করেছে যতটা সম্ভব। যেমন উপকরণ সংগ্রহ ও ক্রয়, বাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য তারা অনেক কঠোর নিরাপত্তা নিয়মকানুন চালু করেছে। তবে এসব শর্ত ও নিরাপত্তাব্যবস্থা পুরোপুরি কাজে লাগাতে গিয়ে অনেক সময় প্রকল্প বাস্তবায়নে দেরি হয় এবং প্রকল্পের ব্যয় অনেক বেড়ে যায়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, কিছু দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান স্থাপনে—যেমন দুর্নীতি দমন কমিশন এবং তথ্য অধিকার আইন—দাতারা বেশ সহযোগিতা ও

প্রেরণা দিয়েছে। এখন এগুলোকে কার্যকর করাই বড় চ্যালেঞ্জ। এ ছাড়া তাদের সহায়তা কর্মসূচিতে তারা জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনের দিকনির্দেশনা অনুসরণ করেছে এবং ধারাগুলোর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বাস্তবায়নের জন্য। জরিপ ও গবেষণার মাধ্যমে দুর্নীতির প্রমাণ বের করার জন্য তারা বিভিন্ন থিংক ট্যাংক ও সিভিল সমাজের সংস্থাকে সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে সাহায্য দিয়েছে এবং এভাবে দুর্নীতির ব্যাপারে সার্বিক জনসচেতনতা বাড়াতে ও দুর্নীতির প্রতিরোধে চাপ প্রয়োগে ভূমিকা রেখেছে।

৫. উপসংহার

শেষ বিশ্লেষণে বাংলাদেশে দুর্নীতির নিয়ন্ত্রণ একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া, যার শুরু ও স্থায়িত্ব নির্ভর করছে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ও সংস্কারের ওপর যেটি আবার 'নিচ থেকে ওপরে' উৎসারিত চাপ এবং 'ওপর থেকে নিচে' উৎসর্গীকৃত নেতৃত্বে যুগপৎ ক্রিয়ার ফল। শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকা, যেহেতু এই শ্রেণি আকারে বড় হচ্ছে এবং যেহেতু এর বাড়তে থাকা আকাঙ্ক্ষা আয় প্রবৃদ্ধির সুফল দিয়ে মেটানো যাচ্ছে না, দুর্নীতি কমানোর দাবির চাপ তৈরিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এ কাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সফলতা নির্ভর করছে তারা জনগোষ্ঠীর বাকি অংশকে কতদূর অনুপ্রাণিত ও এতে শরিক করতে পারছে তার ওপর। সিভিল সমাজের সংস্থাগুলো এবং মিডিয়া দুর্নীতির ঘটনাগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করতে পারে এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য। একই সঙ্গে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বাড়ানোর জন্য তারা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নজর রাখতে পারে। যখনই সম্ভব তারা তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষুদ্র প্রকল্প হাতে নিতে পারে স্থানীয় সরকারপর্যায়ে দুর্নীতি কমানোর জন্য। 'নিচ থেকে ওপরে' চাপ তৈরির জন্য।

দুর্নীতি থেকে মুক্তির মূল্য হচ্ছে সদা সতর্কতা। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মাঝে দুর্নীতি সহ্য করার মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে হবে। আর এর মধ্যেই সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার তাড়নার চাবিটি লুকিয়ে আছে। যাদের রূপকল্প অথবা উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে 'পেছনে একটি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে যাওয়ার' এবং গণমানুষের জন্য, যার নেতৃত্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, 'নিচ থেকে ওপর' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাপ তৈরি করবে, সেসব নেতার মাঝে আকাঙ্ক্ষা অথবা প্রণোদনা নির্ধারণ করবে এই মাত্রা। নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সামাজিক ঐতিহ্যের প্রতি, অন্যদিকে, দুর্নীতি সহ্য করার মাত্রা ব্যাপকভাবে নির্ভর করে। নৈতিক মানদণ্ড শুধু জনগণের জন্যই প্রযোজ্য নয়, একই সঙ্গে তা প্রযোজ্য যারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদের জন্যও। বেসরকারি উদ্যোক্তা যারা আইন ভেঙে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা প্রভাবিত করে নিজেদের

সুবিধাজনক আইন ও বিধি তৈরি করে তাদের নৈতিক মানদণ্ডও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তবে দীর্ঘ মেয়াদে মুনাফা বাড়ানোর জন্য দুর্নীতির চর্চার মাধ্যমে নিয়মকানুন ভাঙা ও এর ইচ্ছামাফিক ব্যবহার করপোরেট খাতে/বাজার অর্থনীতির একাত্মতায় ধস নামাতে পারে।[৭২]

আচরণ ও মূল্যবোধের পরিবর্তন লম্বা সময় ধরে ঘটে। তবে শেষ পর্যন্ত কেন, কখন এবং কীভাবে দুর্নীতি দমনের প্রভাব, গতি ও সাফল্য পেতে পারে তার উত্তর জানা নেই। এটি একটি চলমান কাজ।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-ক : সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকোপ সম্পর্কে জরিপ

ছক-১ : সেবা খাতে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি এবং অনিয়মের শিকার হওয়া পরিবার :

ক্ষেত্র	২০১০ সালের পরিবার (%)
বিচার বিভাগ	৮৮.০
আইন প্রয়োগকারী সংস্থা	৭৯.৭
ভূমি প্রশাসন	৭১.২
কর ও শুল্ক	৫১.৩
বিদ্যুৎ	৪৫.৯
কৃষি	৪৫.৩
স্থানীয় সরকার	৪৩.৯
স্বাস্থ্য	৩৩.২
বিমা	১৯.২
ব্যাংকিং	১৭.৫
শিক্ষা	১৫.৩
এনজিও	১০.১
অন্যান্য	৩৪.১
সামগ্রিক	৮৪.২

১. Transparency International, Bangladesh, Corruption in the Service Sectors: National Household Survey 2010, Dhaka, December 2010.
দুর্নীতি শুধু ঘুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, দায়িত্বে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি, আত্মসাৎ, ছলচাতুরী ইত্যাদিও দুর্নীতি হিসেবে বিবেচিত। জরিপ করা পরিবারের মধ্যে ৮৪.২ শতাংশ পরিবার জরিপে এই দৃশ্য দেখা যায়।
জরিপে দেখা যায় যে বিচার বিভাগে দুর্নীতির পরিমাণ সর্বোচ্চ।
৮৮ শতাংশ পরিবার যারা বিচার বিভাগের সেবা পেয়েছে তারা দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

ছক ২—২০১০ সালে বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন পরিবার দ্বারা প্রদত্ত ঘুষ ও অননুমোদিত টাকার পরিমাণ :

ক্ষেত্র	ঘুষ ও অননুমোদিত খরচ (%)	গড় ঘুষ ও অননুমোদিত টাকার পরিমাণ (টাকা)
আইন প্রণয়নকারী সংস্থা	৬৮.১	৩,৩৫২/-
ভূমি প্রশাসন	৬৭.০	৬,১১৬/-
বিচার বিভাগ	৫৯.৬	৭,৯১৮/-
কর ও শুল্ক	৪৩.৯	৬,৭৩৪/-
কৃষি	৩৮.১	৩১০/-
স্থানীয় সরকার	৩৬.৭	৯১৩/-
বিদ্যুৎ	২৭.৬	১,৮৩৪/-
শিক্ষা	১৫.০	১৬৮/-
বিমা	১৫.০	৩,৯৪৯/-
ব্যাংকিং	১২.৭	১,৯২৮/-
স্বাস্থ্য	১৩.২	৪৬৩/-
এনজিও	৭.২	৫৪৯/-
অন্যান্য	৩৫.৫	৬,৮০৪/-
সামগ্রিক	৭১.৯	৫,৩৬৫/-

২. প্রত্যেক পরিবারের শিক্ষা খাতে অনৈতিক টাকার পরিমাণ গড়ে ১৬৮ টাকা ছাত্র ভর্তি, বৃত্তি ও বিনা মূল্যে বই পাওয়ার ক্ষেত্রে পরিবারগুলো দুর্নীতির শিকার হয়। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তাদের দিতে হয় গড়ে ৪৬৩ টাকা। ২০১০ সালে ৯৭.১ শতাংশ পরিবার সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছে। এর বাইরে ২০ শতাংশ সরকারি স্বাস্থ্যসেবা পায় এবং ৮০ শতাংশ বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা পায়। সরকারি হাসপাতালগুলোর মধ্যে ৩৫.২ শতাংশ জেনারেল হাসপাতাল, ৩৩.৬ শতাংশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ৩৮.৪ শতাংশ উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঘুষ নেওয়া হয়। জরুরি বিভাগ থেকে সেবা নেওয়ার সময় ৩৭.৭ শতাংশ গড়ে ১৪৩ টাকা দেয়। বিভিন্ন সেবার জন্য তারা গড়ে ৫,৩৬৫ টাকা ব্যয় করে। ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে পরিবারগুলো মোট ৩০.১২ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করে। ২০০৯ সালের জুন থেকে ২০১০ সালের মে পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে ৯৫. ৯১৬ লাখ বা ১০০ কোটি টাকা ব্যয় করে।

পরিশিষ্ট খ.১—জাতিসংঘ কনভেনশন

নোরাড ও অন্য দাতাদের ইউএন কনভেনশনে নীতিসমূহ নিচে দেওয়া হলো :

ইউএনসিএসির* ধারা ও শিরোনাম	দাতাদের প্রোগ্রাম
প্রতিরোধ ব্যবস্থা	
৫. দুর্নীতিবিরোধী প্রতিরোধমূলক নীতি ও চর্চা...দুর্নীতিবিরোধী নীতিসমূহ বাস্তবায়ন ও অনুসরণ করা, যা সমাজের অংশগ্রহণ প্রসারে ভূমিকা রাখে এবং যা সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি, আইন, সমাজ ও সঠিক পরিচালনার প্রতিফলন।	● ভোটার কার্ড ও ভোটার তালিকা প্রণয়ন ● ভোটারের ছবির আইডি ● নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ● তথ্যের অধিকার
৬. দুর্নীতি দমন সংস্থা বা সংস্থাসমূহ ক) কনভেনশনের ৫নং ধারার নীতিসমূহ বাস্তবায়ন করবে এবং তাদের সমন্বয় ও তদারকি করবে। খ) দুর্নীতি দমন সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করা ও প্রতিরোধ করা।	● মানবাধিকার ও সুশাসন ● স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ● নির্বাচনের কাজের গ্রুপ ● স্থানীয় সরকার ● নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ● সংসদীয় কমিটি শক্তিশালীকরণ।
৭. পাবলিক সেক্টর...সরকারি কর্মকর্তাদের ও অন্য অনির্বাচিত কর্মকর্তাদের, নিয়োগ, পদায়ন ও অবসরের ব্যবস্থা গ্রহণ, অনুসরণ ও শক্তিশালী করা, ক. যার ভিত্তি হলো যোগ্যতা, স্বচ্ছতার নীতি এবং নির্মোহ সূচক হলো প্রতিভা, ইকুইটি ও আকাঙ্ক্ষা	● পাবলিক সার্ভিস সংস্কার ● পাবলিক সার্ভিসের ক্ষমতা বাড়ানো ● প্রশিক্ষণ ও সুশাসনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ● ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং ● মানবাধিকার ও সুশাসন ● মহিলা আইনজীবী সমিতি ● নীতির সংস্কার
৮. সরকারি কর্মচারীদের আচরণবিধি...সরকারি কর্মচারীদের মাঝে একাত্মতা, সততা ও দায়িত্বশীলতার প্রসার ঘটানো। সরকারি কর্মচারীদের মাধ্যমে দুর্নীতির ঘটনা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনার প্রক্রিয়া সহজ করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।	● স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ● সরকারি সেবার সামর্থ্য বাড়ানো ● তথ্যের অধিকার ● সেবা দেওয়ার প্রতিষ্ঠান ● মানবাধিকার ও সুশাসন ● বিচার পাওয়ার সুযোগ

* UNCAC: United Nations Convention against Corruption

ইউএনসিএসির ধারা ও শিরোনাম	দাতাদের প্রোগ্রাম
প্রতিরোধব্যবস্থা	
৯. সরকারি আয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা—ক্রয়-প্রক্রিয়ার যথাযথ ব্যবস্থা স্থাপন করা যা স্বচ্ছতা, প্রতিযোগিতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্মোহ সূচক যেগুলো দুর্নীতি দমনে কার্যকর—দিয়ে দুর্নীতি কমানোর জন্য সরকারি আর্থিক খাতের ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া।	● আর্থিক ব্যবস্থাপনা ● রাজস্ব প্রশাসন ● সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা ● কর প্রশাসন ও কর ● পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠান
১০. জনগণের অভিযোগ-প্রক্রিয়া, যা প্রতিষ্ঠান, কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত—প্রশাসনের স্বচ্ছতা ত্বরান্বিত করার জন্য।	● সংসদীয় কমিটি ● মানবাধিকার ও সুশাসন
১১. বিচার বিভাগ ও সেবা পরিচালনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা চিন্তা প্রতিটি দেশ করে। এর একাত্মতা জোরদার এবং এখানে দুর্নীতির সুযোগ প্রতিরোধে পদক্ষেপ নেওয়া বিচারব্যবস্থার মৌল নীতিগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে এবং এর স্বাধীনতার কোনো ক্ষতি না করে।	● আইনি সাহায্য ও প্রচার ● আইনি সাহায্য ● মানবাধিকার ● আইনজীবী সমিতি ● নীতি সংস্কার ● পুঁজিবাজার ● বিমা ● উদ্যোগের অধিকার
১২. বেসরকারি খাতে দুর্নীতি কমানোর জন্য হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষার মানদণ্ড উন্নত করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এসব না মানার কারণে শাস্তির ব্যবস্থা করা।	● রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ● বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ
১৩. দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ এবং দুর্নীতির উৎস, কারণ ও ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য সিভিল সমাজ, বেসরকারি সংস্থা ও কমিউনিটিভিত্তিক গোষ্ঠীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।	● আমলাতান্ত্রিক সেবা জোরদার ● লিঙ্গ সমতা ● জনগণের অধিকার পর্যবেক্ষণ ● এনজিও ● আইনগত সাহায্য ও প্রচার ● মানবাধিকার ● থিংক ট্যাংক ● সামাজিক আন্দোলন ● অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ● তথ্যের অধিকার

ইউএনসিএসির ধারা ও শিরোনাম	দাতাদের প্রোগ্রাম
প্রতিরোধব্যবস্থা	
১৪. মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের পদক্ষেপ ১. ক. ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য একটি সমন্বিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা খ. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশাসনিক, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ যেন পরস্পরকে সহযোগিতা ও তথ্যের আদান-প্রদান করতে পারে তা নিশ্চিত করা।	
দুর্বৃত্তায়ন ও আইন প্রয়োগ ১৫ থেকে ৪২ ধারা।	● মানবাধিকার ও আইনগত সাহায্য ● বিচারের সুযোগ ● আইনি সেবা ● বিচারের অর্থ সমন্বয়কারী ● মহিলা আইনজীবী সমিতি ● জনগণের বিচার পাওয়ার সুযোগ।

পরিশিষ্ট-খ-২-বাংলাদেশের কৌশল

NSAPR*-I ও NSAPR-II তে প্রতিফলিত এবং নোরাড ও অন্য দাতাদের দ্বারা অনুসরণকৃত বাংলাদেশের কৌশলগুলো নিম্নে দেওয়া হলো :

NSAPR-I ও NSAPR-II সুশাসন ও দুর্নীতি দমনের অগ্রাধিকার

ভিত্তি	NSAPR-I (২০০৫-০৮) **কৌশল-২** **সুশাসন প্রতিষ্ঠা**	NSAPR-II (২০০৯-১১) **কৌশল-২** **সুশাসন প্রতিষ্ঠা**
সুশাসনের কৌশল	● স্থানীয় সরকারের প্রচার ● দুর্নীতি দমনের কৌশল জোরদার ● অপরাধীদের বিচার সংশোধন ও গরিবের জন্য ন্যায়বিচার। ● বাস্তবায়নক্ষমতা বৃদ্ধি	● সংসদীয় প্রক্রিয়া কার্যকর করা ● পাবলিক সার্ভিস সংস্কার ও জোরদার ● দরিদ্র ও মহিলাদের জন্য আইনি ও বিচার বিভাগীয় সাহায্য নিশ্চিত করা ● আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকার পরিবর্তন

* NSAPR: National Strategy for Accelerated Poverty Reduction

	● খাতভিত্তিক শাসনব্যবস্থার উন্নতি।	● স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি ● ই-শাসন প্রচার করা ● দুর্নীতি মোকাবিলা ● মানবাধিকার নিশ্চিত করা ● তথ্য পাওয়ার সুযোগ ● প্রকল্প বাস্তবায়ন ক্ষমতা বৃদ্ধি। ● খাতভিত্তিক শাসনব্যবস্থার উন্নতি।
দুর্নীতি দমনের বিশেষ কৌশল	● তিনটি অ্যাপ্রোচ/পদ্ধতি : ভ্যালু ক্রিয়েশন, পদ্ধতি উন্নয়ন, ডিটারেন্স	● স্বল্পস্থায়ী : দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা
	● দুদকের তাৎক্ষণিক কার্যকারিতা	● মধ্যম মেয়াদি : দুর্নীতি দমন কমিশন, বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন ও পিএসসির মতো শাসনের মূল প্রতিষ্ঠানগুলো জোরদার করা
	● আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অব্যাহত সংস্কার ● সর্বোচ্চ পর্যায়ে নজরদারির কাজ জোরদার করা ● নির্বাচনী প্রক্রিয়ার আচরণবিধি জোরদার ও নিশ্চিত করা	● দীর্ঘমেয়াদি : জনগণের সচেতনতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে শিক্ষা প্রদান যা UNCAC-এর আলোকে তৈরি
	● প্রশাসনের সর্বোচ্চ মান নির্ধারণের জন্য মানবসম্পদ প্রতিষ্ঠান ও নিয়োগের প্রক্রিয়া বদলে ফেলার লক্ষ্য নির্ধারণ সচেতনতা ● তথ্যের প্রবাহকে শক্তিশালী করা, যা তথ্য অধিকার আইনের দিকে নিয়ে যাবে।	● অন্যান্য : ব্যয়ের স্বচ্ছতা, জনগণের তথ্যের অধিকার।

সূত্র : NSAPR-I and NSAPR-II । দারিদ্র্য নিরসন ত্বরান্বিত করতে উপরিউক্ত কৌশলগুলো দাতারা তাদের জাতীয় কৌশলে প্রয়োগ করেছে। National Strategy to Accelerate Poverty Reduction: I (2005-08), II (2009-11).

পরিশিষ্ট-গ-দুদক

২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত দুদকের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :[৭৩]

- নিজস্ব গতি বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদন বা কোনো ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে অনুসন্ধান বা তদন্ত ও আচরণের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করার ওপর দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করা।
- অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়ের করার পদ্ধতি নির্ধারণ।
- দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য স্বীকৃত বিধান পর্যালোচনা ও তাদের বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করা।
- দুর্নীতির কারণসমূহ চিহ্নিত করা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা।
- গবেষণা করা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম কর্মশালার ব্যবস্থা করা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে পরিকল্পনা তৈরি এবং সুপারিশ প্রণয়ন করা।
- সচেতনতা বৃদ্ধি ও মানুষের মধ্যে সততার অনুভূতি তৈরি।

কমিশন দুর্নীতির কিছু ধরন সংজ্ঞায়িত করেছে।

ঘুষ : এটা হলো টাকা, সেবা বা মূল্যবান কোনো কিছুর বিনিময়ে কাউকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া। সমার্থক শব্দ : বকশিশ, উৎকোচ ইত্যাদি।

অর্থ আত্মসাৎ : অর্থ, সম্পত্তি ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিস ভোগ করা, যা অন্যের আমানত।

চাঁদাবাজি : পথরোধের মাধ্যমে টাকা, সম্পদ ও অন্যান্য জিনিস দাবি করা।

ক্ষমতার অপব্যবহার : চাঁদাবাজি বা বাইরের প্রভাব ছাড়া ব্যক্তিগত লাভের জন্য অফিসের ক্ষমতার অপব্যবহার করা। বিশেষ করে আমলাতন্ত্রে এটি দেখা যায়, যেখানে ব্যক্তি বেশ ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্জনের ফলে আর নজরদারির সুযোগের অভাবে। এ ছাড়া সুযোগ থাকলেও তা এতই জটিল যে এর কার্যকারিতা তেমন থাকে না।

অন্যায় রাজনৈতিক অবদান : একটি রাজনৈতিক দল ও তাদের সদস্যদের সঙ্গে লেনদেন করে অযাচিতভাবে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম প্রভাবিত করার চেষ্টা করা।

এর স্বাধীনতা শুধু আর্থিক স্বাধীনতার ঘাটতির কারণেই খর্ব হয়নি, এর বাজেটও নির্ধারণ করে সরকার। শুধু রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষে এটি তার অভ্যন্তরীণ সংগঠন ও কার্যক্রমের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারে। দুর্নীতি দমন আইনে কমিশনের দায়িত্বসংক্রান্ত বিধিমালা নিয়ে অস্পষ্টতার কারণে কোনো জটিলতা দেখা দিলে সরকার এতে নাক গলাতে পারে। দুর্নীতি দমন কমিশনে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। দুদকের স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। কীভাবে এটি দুর্নীতির

ঘটনাগুলোর লক্ষ্য নির্ধারণ করে, কীভাবে বিশেষ ঘটনাগুলো বাছাই করে এবং কীভাবে এটি বেশ বড় সংখ্যক অভিযোগের বিরুদ্ধে তদন্ত করে তা পরিষ্কার নয়।

এর ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধের কোনো জবাবদিহি নেই, শুধু প্রেসিডেন্টকে বার্ষিক প্রতিবেদন জমা দেওয়া ছাড়া যা তিনি সংসদে পাঠিয়ে দেন। দুদকের স্বাধীনতা যত বাড়বে, একে জবাবদিহি করার দাবিও তত জোরালো হবে। তাই তার পদ্ধতি ও কার্যাবলি সম্পর্কে পরিষ্কার ও সমন্বিত নীতিমালা কমিশনের প্রকাশ করা উচিত। দুদকের ওপর একটি সংসদীয় কমিটি থাকবে এর কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য, যা রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাব কমাবে।[৭৪]

এই প্রসঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার দুর্নীতি দমন কমিশনের অভিজ্ঞতা প্রাসঙ্গিক।[৭৫] এই কমিশনের দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দুর্নীতিবিরোধী ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য অনেক দায়িত্ব ছিল। এটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের শাসনব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ও দুর্নীতিবিরোধী ব্যবস্থার পক্ষে জনমত আদায়ে ভূমিকা পালন করতে পারত। এটি যেকোনো সরকারি কর্মচারীর ওপর যেমন : সংসদ সদস্য, বিচারক, সামরিক কর্মকর্তা সবার দুর্নীতি তদন্ত করতে পারত। এটি ইন্দোনেশিয়ার সুপ্রিম অডিট বোর্ড দ্বারা নিরীক্ষিত হতো।

এটি দুর্নীতি দমনের কাজে ব্যবহৃত সব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংগঠনের তদারকি ও সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিল। এটি তার কাজের সমন্বয় করেছে; ক. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ রাষ্ট্রীয় সব অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ ইউনিটের সঙ্গে। খ. রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, যারা বর্তমান ও আগের সরকারি কর্মকর্তাদের অননুমোদিত নিয়ন্ত্রণে থাকা সরকারি সম্পদের তদন্ত করে এবং গ. অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস ও পুলিশের সদর দপ্তরের সঙ্গে দুর্নীতির বিচার-প্রক্রিয়া ও তদন্তকাজে সহযোগিতা, সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এটি সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করেছে আমলাতন্ত্রের সংস্কারে ও সরকারি কর্মচারীদের বিধি অনুযায়ী সম্পদ বিবরণী দাখিল নিশ্চিত করার জন্য এবং যেভাবে এই বিবরণীগুলো পরীক্ষা ও নিশ্চিত করা হতো তা মূল্যায়ন করেছে।[৭৬]

সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা, সুপারিশ করা এবং সুপারিশের বাস্তবায়ন করা এর দায়িত্ব ছিল। ২০১০ সাল পর্যন্ত এটি ভূমি প্রশাসন সংস্থা, আমদানি নিয়ন্ত্রণ সংস্থা, রাষ্ট্রীয় বাজেট, কর, রাষ্ট্রীয় কোষাগার, ইমিগ্রেশন, রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থায়ন ইত্যাদির মতো কাজ পর্যবেক্ষণ করছিল। দুর্নীতি নির্মূল বা কমানোর জন্য এটি গবেষণা ও জরিপের কাজ হাতে নিয়েছিল, যার মধ্যে ছিল কমিশনের ওপর জনমতের জরিপ, সরকারি ক্রয়-প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা, কিছু নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সমন্বিত সরকারি সেবার ওপর

জরিপ, স্থানীয় সরকারগুলোর শাসন, করপোরেট শাসনের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা।

২০০৪-২০০৯ সালে এটি যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতিবিরোধী ঘটনার তদন্ত, বিচার-প্রক্রিয়া ও অভিযোগ প্রমাণ করে তাদের মধ্যে ছিল ৪৫ জন সংসদ সদস্য, ৮ জন মন্ত্রী, ৮ জন প্রাদেশিক গভর্নর, ১ জন গভর্নর, ৩ জন বিচারক, ৪ জন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর, ২৭ জন মেয়র, অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসের ৩ জন প্রসিকিউটর, ৩ জন দূত, ৪ জন কাউন্সেল জেনারেল এবং ১ জন পুলিশ প্রধান।[৭৭]

তথ্যসূত্র :

১. গাণিতিক অর্থনীতি সাফল্যের সঙ্গে নিম্নোক্ত সমস্যা সমাধান করতে পারে না : ক. চলকগুলোর মধ্যে কোনটির কারণে কোনটি ঘটছে তা ঠিক করতে না পারা, খ. আদর্শিক পক্ষপাতদুষ্ট মতামত অথবা দুর্নীতির সাধারণ ধারণারই ভিত্তিতে তৈরি দুর্নীতি পরিমাপের সীমাবদ্ধতা। এ ছাড়া বহু গবেষণায় নিম্নমানের তথ্য-উপাত্ত দৃশ্যমান। N. Campos, R. Dimova, and A. Saleh, "Whither Corruption? A Quantitative Survey of the Literature on Corruption and Growth," Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn, Germany, November 2010, Discussion Paper Series No. 5334।

২. প্রবৃদ্ধির ওপর দুর্নীতির প্রভাব পর্যালোচনায় কিছু দরকারি প্রশ্ন যা সম্পর্কিত : ক. কোন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি হয় এবং খ. দুর্নীতির কোন ধরনটি সবচেয়ে আধিপত্য বিস্তার করছে এবং তা স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পথে কত তীব্রভাবে বাধা সৃষ্টি করছে। পূর্বে উল্লেখ করা কিছু আন্তদেশীয় আর্থগাণিতিক গবেষণায় দেখা গেছে ক. বাণিজ্য উন্মুক্ততা খ. প্রতিষ্ঠান ও গ. স্থায়ী প্রভাব যা দেশগুলোকে আলাদা করছে প্রবৃদ্ধির ওপর দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব প্রশমনে ভূমিকা রাখছে। পূর্ব এশীয় গবেষণা দেখিয়েছে, প্রতিষ্ঠানের মধ্যবর্তী প্রভাব সত্ত্বেও প্রবৃদ্ধিতে দুর্নীতির কোনো নেতিবাচক আন্তসম্পর্ক নেই (পূর্বোক্ত)।

৩. এটা বলা হয়ে থাকে যে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রেসিডেন্ট পার্ক নিজে ব্যক্তিগতভাবে বড় বড় কোম্পানির হর্তাকর্তাদের সঙ্গে বসতেন, তাঁদের বিভিন্ন ব্যাপারে প্রশ্ন করতেন এবং তাঁরা তাঁর অফিস ত্যাগ করার আগে রাষ্ট্রপতির সহকারীর কাছে প্রয়োজনীয় ঘুষের অর্থ রেখে যেতেন। ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তোর সময়ে তাঁর স্ত্রী ঘুষ গ্রহণের কাজটি করতেন। তাঁকে বলা হতো 'মিসেস ১০ পার্সেন্ট সুহার্তো'। পরবর্তী সময়ে সুহার্তোর ছেলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হলে মায়ের পাশাপাশি তিনিও ঘুষ গ্রহণ করতেন।

৪. বাংলাদেশে এরশাদের সময়ে বড় বড় প্রকল্প অথবা ক্রয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তাঁর হাতেই ছিল এবং এটা সাধারণের মাঝে ধারণা ছিল তাঁকে ঘুষ দিলে এসব প্রকল্পের কাজ বাগিয়ে নেওয়া যেত। গুজব ছিল যে তিনি ইন্দোনেশিয়ার ঘুষের পদ্ধতি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে তা বাংলাদেশে প্রবর্তন করেন। যখন এই পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল, তখনই তাঁকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা হলো।

৫. এর মধ্যে থাকতে পারে তার সন্তানের শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি, যা মানবসম্পদ গঠন ও উন্নয়নে অবদান রাখে।

৬. মনে করা হয়, চুক্তিবদ্ধ বিনিয়োগের প্রভাব প্রবৃদ্ধির ওপর যেমন কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে জন্য প্রকল্পের গুণগত মানের সঙ্গে যেন কোনোভাবেই আপস করা না হয় এবং চুক্তি অনুযায়ী যেন এটির বাস্তবায়ন নিশ্চিতের জন্য দক্ষিণ কোরিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় সরকারের কঠোর নজরদারি থাকে।

৭. Katherine Boo, Behind the Beautiful Forevers. Life, death, and hope in Mumbai Uncercity, 2012, Radon House. "One Cheer for Corruption in India: For the indigent and unemployed, bribery is a way to share in resources long plundered by the better-off" by Pankaj Mishra in *Wall Street Journal*.

ট্রেনের একজন টিকিট পরিদর্শক যিনি ঘুষের, যেটি প্রকৃত টিকিটের মূল্যের চেয়ে কম, বিনিময়ে টিকিটবিহীন যাত্রীদের রেলভ্রমণের সুযোগ করে দেন, আসলে চাকরি পেতে তাকে যে ঘুষ দিতে হয়েছিল তার অংশবিশেষ ওঠানোর চেষ্টা করছেন। আর এটি করতে গিয়ে তিনি দুর্নীতির সুফল ভোগ করছেন।

৮. ২০১২ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের তৈরি দুর্নীতির ধারণা সূচক ১৭৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪৪তম।

৯. যদিও দুর্নীতি কোনো দলিল/সাক্ষ্য রেখে হয় না, তারপরও উন্নত নিরীক্ষা-প্রক্রিয়া যেটি পারফরম্যান্সের ওপর নজর দেয়, একটি দরকারি ভূমিকা পালন করতে পারে এ ক্ষেত্রে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের অগ্রগতি পরিমাপ করা যায় দুর্নীতি তদন্তের রেকর্ড সংরক্ষণ মামলার হিসাব এবং সরকার কর্তৃক পরিচালিত অডিট পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।

১০. M. S. Mudahar and R. Ahmed, "Government and Rural Transformation: Role of Public Spending and Policies in Bangladesh." UPL, Dhaka, 2010, pp. 194–204.

১১. Transparency International Bangladesh, "Corruption in Service Sector: National Household Survey 2010," Dhaka, 2012.

১২. Mudahar and Ahmed, et al. pp. 202–204.

১৩. নব্বইয়ের দশকে ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঘুষ লাইসেন্সের প্রয়োজনীয় বৈধ ব্যয়ের চেয়ে ১ দশমিক ২৮ গুণ বেশি ছিল, লাইসেন্স নবায়ন ও অনুমোদন ছিল প্রয়োজনীয় বৈধ ব্যয়ের চেয়ে ৩০ গুণ বেশি। ১৯৯২ সালে একটি ফ্যাক্টরির অনুমোদনের প্রাথমিক খরচ ছিল ৭০ হাজার এবং ঘুষের পরিমাণ ছিল প্রায় ৯৫ হাজার টাকা সে সময়কার হিসেবে। নবায়নের বার্ষিক খরচ ছিল প্রায় ১৫ হাজার, অথবা এ-সংক্রান্ত ঘুষ ছিল ৪৫ হাজার টাকা, ১৯৯২ সালের হিসাবে। World Bank, "The Manufacturing Sector of Bangladesh," selected issues 1992.

১৪. অধিকন্তু উন্নত দেশে সুনির্দিষ্ট খাত বা শিল্প বা কাজের সুবিধার্থে সরকারের আইন/নির্বাহী বিভাগকে প্রভাবিত করে আইন পাস করিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে দুর্নীতি সংঘটিত হয়। উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশ, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, জ্বালানি, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি খাতের আইন নিজেদের মতো করে প্রণয়নে প্রভাব বিস্তারে বিশেষ স্বার্থ গোষ্ঠীর তদবিরের চর্চা সবার জানা। তবে এ ধরনের তদবিরের প্রচেষ্টার ও ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণে আইন রয়েছে। তদবিরের প্রচেষ্টার সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে, এই সীমা অতিক্রম করলে আইনি ও বিচার-প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হবে। এ ছাড়া বিভিন্ন তদবিরকারী গোষ্ঠীর প্রচেষ্টা আর ব্যয় জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ।

১৫. ভারতীয় পার্লামেন্টের ৩০ শতাংশ সদস্যের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ আছে।

১৬. সামরিক সরকারের শেষে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার এসে নিজ দলের নেতা-কর্মীদের—যাদের অভিযুক্ত, বিচারের মুখোমুখি অথবা দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল—অধিকাংশকেই মুক্ত করে দেয় এবং তাঁদের বিরুদ্ধে করা সেনা-সমর্থিত সরকারের অধিকাংশ মামলাই প্রত্যাহার করে, যদিও বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বেলায় তা ঘটেনি।

১৭. ২০০৭-২০০৮ সালের সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে এ ধরনের অভিযোগ উঠেছিল যে 'দায়মুক্তির সুবিধা নিয়ে কিছু সংখ্যক সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ক্ষমতার অপব্যবহার ও আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন, যা মানবাধিকার পরিস্থিতি ও আইনের শাসনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল'। যেমন আর্মিদের তৈরি করা দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া, জামিন করা, দুর্নীতি দমন কমিশনের করা দুর্নীতি মামলার সাজা কমাতে বিচারকদের প্রভাবিত করা ইত্যাদির জন্য অবৈধ লেনদেন হয়েছিল। ভূমি মালিকদের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে, এমন মানুষদের কাছে জোর করে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়েছিল, আর অনিচ্ছুক মালিকদের আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে অত্যাচার করা হয়েছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবৈধ লেনদেন হয়েছে এবং আমদানি কর ফাঁকি দেওয়া হয়েছে, এমন অভিযোগ তুলে কখনো কখনো ব্যবসায়ীদের সরকারকে বড় অঙ্কের টাকা দিতে বাধ্য করা হয়, যার একটি অংশ সেনাবাহিনী আত্মসাৎ করে।

Transparency International Bangladesh: Role of a Section of the Bangladesh Armed Forces During the Caretaker Government of 2007-08—A Review/ Executive Summary, February 2013.

১৮. দুর্নীতির দুটি দিক আছে। একটি দিক হলো, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির সম্মতি, অনুমোদন ও লাইসেন্স পেতে ঘুষ প্রদানের জন্য বেশ বড় ধরনের অর্থ খরচ করা, যা অনুমোদিত সরকারি খরচের চেয়ে বহুগুণ বেশি। দ্বিতীয় দিক হলো, পরিবেশ রক্ষায় বা প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, ভবনকাঠামো নিরাপত্তা ও শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ-সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা পালন ও বাস্তবায়ন এড়াতে সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদান।

১৯. ১৯৯৪ সালের একটি গবেষণায় দেখা যায়, শিল্পের অর্জিত মুনাফার ৩ শতাংশ ঘুষ প্রদানে ব্যয় হয়। তৈরি পোশাকশিল্প অত্যন্ত লাভজনক এবং এ কারণে তারা গার্মেন্টস স্থাপন ও এ শিল্প পরিচালনা করার জন্য অনুমতি/লাইসেন্স পেতে বেশি ঘুষ দিতেও রাজি হয় দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাদের—যাঁরা কাজ করছেন কাস্টমস, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আমদানি-রপ্তানি ব্যুরোসহ বিভিন্ন সংস্থায়—চাহিদা পূরণ করার জন্য। বিশ্বব্যাংক, পূর্বোক্ত।

২০. "Bad governance and good services. The ready-made garment industry in Bangladesh," in N. Islam and M. Asaduzzaman, "A Ship Adrift: Governance and Development in Bangladesh," *BIDS* 2008, Dhaka. বাংলাদেশের রপ্তানির ৭৫ শতাংশ পোশাক খাতের এবং জিডিপিতে এ খাতের অবদান ১৩ শতাংশ।

২১. প্রতিযোগী দেশের তুলনায় মজুরি কম রাখা হয়েছে এবং তা দেশের অন্যান্য শিল্পের তুলনায়ও কম। এই মজুরি বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্প খাতের কারখানা শ্রমিকদের মজুরির তুলনায় ১ দশমিক ৪ থেকে ২ গুণ কম। বিভিন্ন কারখানা আইন ও বিধিমালা মোতাবেক প্রাপ্য সব সুবিধা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। তাদের অনেক সময়ই অনিয়মিত

শ্রমিকদের মতো আচরণ করা হয়, যারা স্বাভাবিক মজুরির চেয়েও কম মজুরি পেয়ে থাকেন; তাদের এত ঘন ঘন ছাঁটাই করা হয় যে, বিশেষ করে মহিলাদের, তারা ছাঁটাই ভাতাও পান না। আইন মোতাবেক নিয়োগপত্র পান না বলে তাঁরা চিকিৎসা, বিমা, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও পরিবহনের মতো সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। পূর্বোক্ত/মোদাহার এবং আহমেদ।

২২. গত দশকে তৈরি পোশাক কারখানায় আগুন লেগে ৭০০ জনের বেশি মৃত্যু হয়েছে। ২০০৫ সালে ভবনধসে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। কাঠামোগত ত্রুটির কারণে সোয়েটার কারখানায় ১৬৪ জন মারা গেছে এবং ৮০ জন আহত হয়েছে। (*The Wall Street Journal*, 25 April 2013, p.10)। কাউকেই অপরাধী করা হয়নি। ২০১২ সালে আরেকটি কারখানায় আগুন লেগে ১০০ জন মারা যায় (*The Wall Street Journal*, 27 April 2013)। ভবনধসের কারণ হলো ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণশৈলী, পুরোনো কাঁচামাল, অল্প সংখ্যক পরিদর্শন যা মালিক খরচ কমানোর জন্য অনুসরণ করেছেন। ভবন নির্মাণে বিল্ডিং কোড অনুসরণ করা হয়নি আর অপ্রতুল নিরাপত্তাব্যবস্থার কারণে আগুন লাগা সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসবের জন্য এখন পর্যন্ত কাউকেই দায়ী অথবা দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি। ২০১৩ সালের বিল্ডিং ধসে ১১০০ জনের মৃত্যু ঘটেছে এবং শত লোক আহত হয়েছে।

এটা অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে এ শিল্প রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। ২০১৩ সালে কমপক্ষে ২৫ জন সাংসদ তৈরি পোশাক খাতে বিনিয়োগ করেছিলেন। ২০১২ সালের নভেম্বরের আগুনের পর বিজিএমইএ তার কিছু সদস্যের কারখানায় পরিদর্শন দল পাঠায়। চারটি ভবনে কাঠামোগত ত্রুটি ছিল অথবা নির্মাণ বা শ্রম আইন লঙ্ঘন করেছিল। মালিক কারা ছিল? গার্মেন্টস মালিকদের জোটের সভাপতি আতিকুল ইসলাম, তার পূর্বসূরি এবং সমিতির সাবেক উপসভাপতি কাউকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি (*The Economist*, 4 May, 2013)।

২৩. N. Islam, "Reflection on Governance and Development," *Journal of Bangladesh Studies*, vol. 12, no. 2, 2010.

২৪. বাংলাদেশের প্রত্যেক সরকারি চাকরিজীবীকে প্রতিবছর চাকরির বিধিমালা অনুযায়ী তাঁর সম্পত্তির একটি তালিকা সরকারকে দিতে হয় কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের বিবরণী দাখিলের নজির খুব কম। বরং নজির রয়েছে যে দুর্নীতিচর্চার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ, যেমন সম্পদ জমানো আয়ের চেয়ে বেশি সাংসারিক ব্যয়, জ্ঞাত আয়ের চেয়ে বহুগুণ বেশি। এসব প্রমাণ দুর্নীতিগ্রস্ত। যদি সরকারি চাকরিজীবী (আচরণ) আইন ১৯৭৯ কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় তাহলে প্রায় ৭৫ শতাংশ দুর্নীতি কমানো সম্ভব। (M. Shamsul Haque, Advocate, Supreme Court, Bangladesh http://www.humanrights.asia/resources/journals-magazines/article2/0901/08anti-corruption-mechanisms-in-Bangladesh)।

২৫. অনেক উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তিগত অর্থের সরকারি তদন্ত বাধ্যতামূলক, এমন অনেকে আছেন যাঁরা খুব ভালো সরকারি কর্মকর্তা অথবা জনপ্রতিনিধি হতে পারতেন, নির্বাচিত অথবা অন্য কোনোভাবে, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তাঁরা এ ধরনের দায়িত্ব নেবেন না, কারণ তাঁদের সম্পত্তির তদন্ত করা হবে।

২৬. Government of Bangladesh, "The Right to Information Act 2009," Act No. XX. 2009, Dhaka, Bangladesh.

২৭. Committee on Human Rights Initiative. Bangladesh—The Right to Information Act, New York 2009. Right to Information Law—Major Challenges to Implementation Dream B4 Dies web blog: Tomorrow Never Dies, May 2010.

২৮. World Bank, WBI. ANSA Region—The Power of Using the Right to Information Act in Bangladesh. Experiences from the Ground, 2012.

২৯. দিল্লিতে বাসে ধর্ষণের ঘটনার পর বাক্ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ভূমিকা এবং সিভিল সমাজের আন্দোলনের কারণে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আইন, বিধি ও প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন এসেছে।

৩০. IBP (International Budgetary Partnership), Open Budget Survey 2012: Open Budgets Transform Lives, 2012.

৩১. ব্যাপক তথ্য (৮১-১০০) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (৬১-৮০), কিছু তথ্য (৪১-৬০) সর্বনিম্ন তথ্য (২১-৪০), শূন্য তথ্য (০-২০)।

৩২. Sofia Wickberg, Anti-Corruption Resource Centre, Transparency International Bangladesh and Chr. Michelsen Institute, November 2012, Norway. U4 Expert Answer: Overview of Corruption and Anti-Corruption in Bangladesh.

৩৩. এটি বলা হয়ে থাকে যে ঘুষের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের কঠোর বিধিমালা এড়িয়ে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও প্রবৃদ্ধি বাড়াতে দুর্নীতির একটি তৈলাক্ত প্রভাব আছে। তবে এটি কেবল তখনই সত্য যখন বিধিমালাগুলো অদরকারি, জটিল ও কঠোর এবং যে উদ্দেশ্যে তাদের করা হয়েছে তা পূরণে কোনো কাজে আসে না। এগুলো কেবল প্রবৃদ্ধি হোঁচটকারী বিধিমালা।

৩৪. সিঙ্গাপুর সরকারি কর্মকর্তাদের উচ্চ বেতন প্রদানের মাধ্যমে দুর্নীতি কমিয়ে এনেছে। এ ব্যবস্থার দুটি ফ্যাক্টর আছে: একটি দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়তে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়বদ্ধতা, দ্বিতীয়ত দুর্নীতিগ্রস্ত আমলার বিরুদ্ধে তদন্ত ও শাস্তি প্রদান একটি শক্তিশালী তদারকি প্রক্রিয়া ব্যবস্থা। বিভিন্ন খাতে উচ্চ মজুরি ও দুর্নীতির সম্পর্কের ওপর চালানো আন্তদেশীয় আর্থগাণিতিক গবেষণায় কোনো উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায়নি। এটি ঘটেছে মূলত endogeneity problems-এর কারণে। অর্থাৎ কম দুর্নীতির কারণে উচ্চ মজুরি ও আয় হচ্ছে আবার উচ্চ মজুরি ও আয় দুর্নীতি কমার সাথেও সম্পৃক্ত । [কোনটির কারণে কোনটি ঘটছে সেটি স্পষ্ট নয়।] (J. Stevenson, "Eight Questions About Corruption, "*Journal of Economic Perspectives*, Summer 2005.)

৩৫. World Bank Institute, ANSA, CIDA. 2012. "The Power of Using the Right to Information Act in Bangladesh: Experience from the Ground."।

৩৬. বাংলাদেশে কার্যকর স্থানীয় সরকারব্যবস্থার বাধা এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে এখানে Nurul Islam, Role of Experts in Policy Advice: Lessons of Experience, BIDS, Dhaka, 2010।

৩৭. অতীত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী একটি হিসাবে দেখা যায়, ২০০০ সালের শুরুর দিকে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের স্বাধীন প্রার্থীসহ মোট অর্থের দরকার জিডিপির ১.৫ থেকে ২.৫ শতাংশ। M. Mudaharand R. Ahmed, Government and Rural

Transformation, *op cit*.।

৩৮. প্রত্যেক স্বতন্ত্র প্রার্থীকে অন্য রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের মতোই সমান হারে সরকারি তহবিল থেকে নির্বাচনী অর্থায়ন করতে হবে।

৩৯. দুর্নীতির কিছু রূপ যেমন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে ঘুষ নেওয়া, নাগরিকদের ঘুষ দেওয়ার জন্য হয়রানি করা, বিদেশি সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ এর আওতার বাইরে রয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে শাস্তি তেমন কঠোর নয়, মাত্র ৩-১০ বছরের জেল। অন্যদিকে মালয়েশিয়ায় এ জন্য ২০ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। ইন্দোনেশিয়াতে কিছু কিছু দুর্নীতির জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কাগজে-কলমে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশনের ব্যাপক ক্ষমতা আছে অনুসন্ধান, তদন্ত এবং গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্রে। (S. Naushin Parnini, "Governance Reforms and Anti-Corruption Commission in Bangladesh," *Romanian Journal of Political Science*, vol. 11, No. 1, 2011.)।

৪০. ২০০৬--২০০৭ সালে সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আমলা, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ ও বিচার-প্রক্রিয়া আরম্ভে এটি কার্যকর ভূমিকা পালন করলেও আর্মিকে তাদের কাজের আওতায় আনেনি। যেহেতু এটি একটি বিতর্কিত স্বল্পমেয়াদি সামরিক সরকারের সঙ্গে জড়িত ছিল তাই ক্ষমতার পালাবদলে পরবর্তী বছরগুলোতে এটির কাজে ভাটা দেখা যায়।

৪১. পরিশিষ্টে (পরিশিষ্ট-গ দেখুন) ইন্দোনেশিয়ার, যার সুহার্তোর শাসনামলে ব্যাপক দুর্নীতির ইতিহাস ছিল, মতো দেশে দুর্নীতি দমন কমিশনের পরিধি ও কার্যকর ক্ষমতা উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪২. সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতির বিষয়টি এখনো শৈশব পর্যায়ে রয়ে গেছে। এর জন্য দরকার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উপাদান; যা পরিবর্তনে সহায়ক অথবা প্রতিবন্ধক, পরিবর্তনকে সাহায্য করার জন্য সমাজের বিভিন্ন খাতে প্রণোদনা এবং তাদের ক্ষমতা পরিবর্তনের বিপক্ষ শক্তির তুলনায় সরকারে তাদের প্রভাব।

৪৩. একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর একজন নেতা সমমনা সমর্থক বা সহকর্মীদের নিয়ে সাহসে বলীয়ান হয়ে রাজনৈতিক দৃশ্যপটে আবির্ভূত হবেন এবং পরিবর্তনের দাবি তুলবেন। দুর্নীতির নিয়ন্ত্রণ এবং একটি উন্নত শাসনব্যবস্থার জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থাই নেতা তৈরি করতে পারে অথবা নিজের রূপকল্প বাস্তবায়নে নেতারা দৃশ্যপটে হাজির হয়ে পারিপার্শ্বিকতা তৈরি করতে পারেন। বাজেট দুর্নীতির নিয়ন্ত্রণ অথবা শাসনব্যবস্থার সংস্কারের প্রক্রিয়া হতে পারে কোনো অপ্রত্যাশিত, অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা অথবা দৈবক্রমে ঘটে যাওয়া অসংখ্য দুর্ঘটনার সমন্বিত রূপ।

৪৪. ভারতের গুজরাট রাজ্যের দুর্নীতির নিয়ন্ত্রণের অভিজ্ঞতা এ ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। A. Panageria, Why Gujrat Miracle Matters. The Times of India, June 29, 2013 | T. Shah, A. Gulati, Hemant P. G. Shreedhar, and P. C. Jan. Secret of Gujrat's Miracle After 2000, *Economic and Political Weekly*, December 26, 2009।

৪৫. N. Loaza, J. Rigolini, R. Pigotlini, and G. Llorente, "Do Middle Classes Bring Institutional Reforms?" Discussion Paper, March 2012, Institute for the Study of Labor, Bonn. 2012 সালে ভারতে আন্না হাজারের দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সমর্থন জুগিয়েছিল ও এর অগ্রভাগে ছিল। তবে সামনের সারির

রাজনৈতিক নেতৃত্বের, যাঁদের দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে যথেষ্ট দায়বদ্ধতা ছিল না, ওপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করার আগেই তা বাতাসে মিলিয়ে যায়। তারপরও দুর্নীতিবিরোধী ব্যবস্থা যেমন ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা এবং তার ক্ষমতা ও দায়িত্ব বাড়ানোয় এর প্রভাব ছিল।

৪৬. World Bank, "Bangladesh Poverty Assessment 2010: Assessing a Decade of Progress in Reducing Poverty." World Bank, Washington, DC, 2013। যদিও গরিব মানুষেরা আনুপাতিক হারে তেমন সুবিধা পায়নি, তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির, যা জিডিপির ২.৫ শতাংশ, ব্যাপকতা বাড়াতে তারা বেশ সুবিধা পেয়েছে, যদিও তা পুরোপুরি জিডিপির ২.৫ থেকে ৩ শতাংশ নয়।

৪৭. পূর্বোক্ত

৪৮. এমনকি ১৯৯১ সালের আগে যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণি বর্তমানের মতো এত বড় ছিল না, তখন বিদ্যমান ব্যবস্থায় পরিবর্তনের যেকোনো চাপ মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল একটি গোষ্ঠীকে অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে খেলানোর মাধ্যমে ১৯৭৫-১৯৮১ সময়কালে ক্ষমতায় থাকা কর্তৃত্ববাদী শাসনগোষ্ঠীর দ্বারা। এ ক্ষেত্রে তারা আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা আর রাজনৈতিক নিপীড়ন দুটোকে মিলিয়েই ব্যবহার করত।

৪৯. বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে এই দৃশ্যপট কেবল বাংলাদেশেই বিরাজ করছে না, বরং অনেক উন্নয়নশীল দেশেই বিরাজ করছে বিশেষ করে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোতে। আলোচিত দৃশ্যপট বিরাজ করে শুধু সেই সমাজে যেখানে সরকার পরিবর্তিত হয় নির্বাচনের দ্বারা, যদিও সরকারগুলো দৃশ্যত মনে হয় 'অনুদার গণতন্ত্রের' প্রতিনিধি। মধ্য ও উচ্চ আয়ের অগণতান্ত্রিক দেশে যেমন খনিজ/তেল সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলোতে, সামাজিক শ্রেণিগুলোর মধ্যে একটি অদৃশ্য দর-কষাকষি রয়েছে। যেমন অভিজাত শ্রেণি ও সমাজের বাকি অংশের মধ্যে। কর্তৃত্ববাদী সরকার দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনসহ যখনই কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিবর্তনের আন্দোলনের মুখে পড়ে তখনই তারা নিপীড়ন ও সম্পদ হস্তান্তর কর্মসূচি, যাতে রয়েছে নগদ সহায়তা ও বিভিন্ন ধরনের দয়া, বাড়ানোর মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে এর মোকাবিলা করার চেষ্টা করেন। তবে অচল ও গরিব দেশগুলোতে অপশাসন এবং দুর্নীতি প্রলম্বিত করা যায় শক্তি প্রয়োগের দ্বারা, যদি সেখানে থাকে একটি কর্তৃত্ববাদী সরকার, যাকে নিয়ন্ত্রণ করছে সেনাবাহিনী অথবা সমাজের অভিজাত শ্রেণি সেনা সমর্থন নিয়ে। এটি একটি অস্থিতিশীল অবস্থা এবং এখানে পরিবর্তনের সম্ভাবনা বেশ বেশি, তবে তা অনিশ্চিত। Francis Fukuyama, "The Middle Class Revolution—Mid, Middling, and Mobilized" *Wall Street Journal Review*, January 24-30, 2013. Fareed Zakaria, The Rise of Illiberal Democracy, *Foreign Affairs*, November/December1997.

৫০. পূর্বোক্ত

৫১. Pierre Landell-Mills, "Citizens Against Corruption: Partnership for Transparency," Final, UK, 2013. Citizens Against Corruption: What Work? Findings from 200 projects in 53 countries. http://blogs.worldbank.org/publicsphere/. এই বইয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে কীভাবে বিভিন্ন দেশে সিভিল সমাজের সংস্থাগুলো বিভিন্ন প্রকল্পে নাগরিক গোষ্ঠীগুলোকে সংগঠিত, সহায়তা ও অনুপ্রাণিত করছে, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে, সফলতার সঙ্গে সরকারি কেনাবেচা প্রক্রিয়া নজরদারি এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন কার্যক্রমে

দুর্নীতিবিরোধী কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে দুর্নীতিবিরোধী প্রচারাভিযানে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে হলে সিভিল সমাজের সংগঠনগুলোর অবশ্যই একাত্মতার ভাবমূর্তি থাকতে হবে এবং তাদের সুবিধাভোগী ও পৃষ্ঠপোষকদের পাশাপাশি তাদের প্রচেষ্টাগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির আলোকে পরিচালিত করতে হবে। সরকারের উচিত দায়িত্ব পালনে তাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া। সিভিল সমাজ ও সরকারের সংঘাতমূলক অবস্থান দুজনের উপকারী দিকটিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাদের সরকারি চুক্তি ও সম্পদের ওপর নির্ভরশীল হলে চলবে না। এতে তাদের স্বাধীনতাই সংকুচিত হবে। তাদের নিজস্ব সম্পদ আহরণের উৎস থাকতে হবে, যেমন সদস্যদের চাঁদা অথবা বেসরকারি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের অনুদান। অবধারিতভাবেই, অদূর ভবিষ্যতে এ ধরনের দায়িত্ব পালনকালে তাদের প্রধান অর্থায়নের উৎস হবে বাইরের সাহায্য। আন্তর্জাতিক সুনাম আছে এমন এনজিও এবং সিভিল সমাজের সংস্থা থেকে সাহায্য নেওয়া ভালো, এ ধরনের সাহায্যকে দাতা-গ্রহীতার সম্পর্কের রাজনীতি থেকে মুক্ত রাখার জন্য। এসব এনজিও ও থিংক ট্যাংক উন্নত দেশগুলোর সরকার থেকে নিজেদের স্বাধীন রাখার ব্যাপারে বেশ পরিচিত।

৫২. United Nations Office of Drugs and Crimes (UNODC), "United Nations Convention Against Corruption" (Vienna, Austria: UNODC, 2004), pp.10–13. ttp://en.wilipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_against_Corruption.

৫৩. এই কনভেনশনে দুর্নীতির জন্য দায়ী আমলা, রাজনীতিক, বিচারক নির্বাচিত অথবা নির্বাচিত নন এমন সরকারি কর্মকর্তাদের একটি বিস্তৃত সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

৫৪. দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপে জনমত গড়তে সরকার, সুশীল সমাজের সংস্থা ও মিডিয়া এই কনভেনশনকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির জন্য এবং একইভাবে পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা ও কার্যকারিতার জন্য। Transparency International Bangladesh and UNCAC Coalition.UN Convention Against Corruption: Civil Society Review, Bangladesh, 2011. যতই পরিশীলিত আইনি কাঠামো প্রয়োগ করা হোক না দেশের ভেতর আধিপত্যকামী গোষ্ঠী নৈরাজ্যের মাধ্যমে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে উপায় খুঁজে বের করতে পারে। তাই রাষ্ট্রকে সাড়া দেওয়ার জোর দাবি জনগণের পক্ষ থেকে ওঠা দরকার।

(H. Hechter, G. F. Zinkernagel, Koeschem, D. Morns, "Can UNCAC Address Grand Corruption?," Chr. Michelsen Institute, U4 Anti-Corruption Resource Centre, U4 Report, October 2011.)

৫৫. UNCAC তে রাষ্ট্রীয় দলগুলোর (States Parties) একটি সম্মেলন করা (Conference of the States Parties) হয় যা সচিবালয় হিসেবে কাজ করে রাষ্ট্রীয় দলগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধিতে যেন তারা UNCAC লক্ষ্যসমূহ পূরণ করতে এবং এদের বাস্তবায়নের প্রসার ঘটাতে ও পর্যালোচনা করতে পারে। বিভিন্ন সেশনের অন্তর্বর্তী পর্যায়ে বাস্তবায়ন পর্যালোচনা গোষ্ঠী, যেটি তদারকি পর্যালোচনা ব্যবস্থা ও কারিগরি সাহায্যের ওপর মনোযোগ দেয়, সম্পদ পুনরুদ্ধারের ওপর ওয়ার্কিং গ্রুপ, প্রতিরোধের ওপর ওয়ার্কিং গ্রুপ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ওপর বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বৈঠকসহ নিজেদের মাঝে নিয়মিত বৈঠকে মিলিত হয়। এটি দাতা ও গ্রহীতা দেশগুলোর বাস্তবায়নের জন্য সমন্বয়

জোরদার ও কারিগরি সাহায্য বাড়ানোর অনুরোধ করে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়া নিয়ে কাজ করে। ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনে সবাই একমত হন যে 'কনভেনশন বাস্তবায়নে কার্যকর ও দক্ষ পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি।' এটি নীতিগতভাবে একটি মতৈক্যকে প্রতিনিধিত্ব করছে। তবে জি ৭৭ দেশগুলোর প্রভাবশালী সদস্যদের উদ্বেগের কারণে তারা এ ব্যাপারে ২০০৮ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সম্মেলনে খুব কমই অগ্রগতি অর্জন করে। ("UN Convention against Corruption: Recommendations for a Review Mechanism," Heimann and Dell, April 2009)। ৪০টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিওর প্রধান নির্বাহী জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুনকে লেখা এক খোলা চিঠিতে UNCAC এর প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। তবে এর বাস্তবায়নে শ্লথগতি নিয়ে তাঁরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ৬টি দেশের কেস স্টাডির ওপর এক প্রতিবেদন বলছে: আত্মপর্যালোচনা কোনো ফল বয়ে আনেনি এবং সংসদ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে অগ্রগতির বাইরের পর্যালোচনার পরিকল্পনাই করা হয়নি। (Anti-corruption Policy making in Practice: What Can Be Learned for Implementing Article 5 of UNCAC?" Report by U4 Anti-Corruption Resource Center, 2007; UN Global Compact. Link given: http://www.unglobalcompact.org/issues/transparency_anticorruption/CEO_Letter.html).

৫৬. পূর্বোক্ত

৫৭. নিম্ন আয়ের উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বিশ্বব্যাংকের/IDA সাহায্য বণ্টনের ক্ষেত্রে দুর্নীতির নিয়ন্ত্রণ/শাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য নির্ধারণী সূচক হিসেবে কাজ করে। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে গ্রহীতা দেশে ব্যাপক দুর্নীতি হয়, এমন ধারণা থাকলে কেবল বৈদেশিক সাহায্যই নয়, বৈদেশিক বিনিয়োগও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি বিশেষ করে সত্য সেসব দেশের জন্য যেখানে কঠোর আইন রয়েছে কোম্পানিগুলোকে শাস্তি দেওয়ার জন্য, যারা বিদেশে বিনিয়োগ করতে গিয়ে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। বিদেশি রাষ্ট্রে সরকারি কর্মচারী ও আমলাদের ঘুষ দেওয়ার সঙ্গে জড়িত বেসরকারি করপোরেশনদের বিচার ও শাস্তি দেওয়ার জন্য বহু OECD দেশেই দুর্নীতিবিরোধী আইন রয়েছে।

৫৮. এই সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক বিবৃতি যথাযথ। তিনি বলেছেন যে, আমাদের এমন সব জায়গায় কাজ করতে হয় যারা সুশাসনের বৈশ্বিক সূচকে উপরের দিকে অবস্থানে নেই। আমাদের এমন সব জায়গায় দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়তে হবে যেখানে অসদাচরণ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়ার আইনি কাঠামো ত্রুটিপূর্ণ এবং জবাবদিহির প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিকভাবে কাজ করে না অথবা অনুপস্থিত। জটিল পরিস্থিতিতে আমাদের কাজ করার আকাঙ্ক্ষা এবং কিছুটা ঝুঁকি নেওয়ার তাড়নাকে কোনোভাবেই ব্যাংকের প্রকল্প বা কার্যক্রমে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়ার ইচ্ছার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। ক্রয়-প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির সম্ভাবনা চিহ্নিত হওয়ায় একটি বড় প্রকল্প সহায়তা প্রত্যাহার করা হয়েছে এমন উদাহরণ দিতে গিয়ে ২০১২-১৩ সালে পদ্মা সেতু থেকে বিশব্যাংকের সরে যাওয়াকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'আমাদের কি বড় ঝুঁকির প্রকল্প থেকে বিরত থাকা এবং গরিবদের বড় ধরনের সুফল নিয়ে আসে এমন প্রকল্প উপেক্ষা করা উচিত, নাকি যথাযথ নিরাপদ ব্যবস্থা তৈরি করে একটু হিসাব করে ঝুঁকি নিয়ে সামনে এগোনো উচিত? আমার উত্তর হচ্ছে উন্নয়নের ফল পেতে হলে আমাদের ঝুঁকি নিতেই

হবে। তবে একই সঙ্গে আমাদের চোখ-কান খোলা রাখা উচিত এবং যতটা সম্ভব ঝুঁকি কমানোর চেষ্টা করা উচিত।' The Bank President's address at the Centre for Strategic and International Studies, Washington, DC, 2013. http://www.worldbank.org/en/news/speech/2013/01/30/world-bank-group-president-jim-yong-kim-speech-anti-corruption-center-for-strategic-and-international-studies.

৫৯. দুর্নীতিবিরোধী মহলের আরেকটি উদ্বেগ হলো সামরিক সরঞ্জামাদিতে ব্যয়। গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে দুর্নীতি ভাগাভাগি করে নেওয়া হয় রাজনৈতিক নেতার ও সেনাবাহিনীর মাঝে। বেসামরিক ক্রয়-প্রক্রিয়ার তুলনায় প্রতিরক্ষা ক্রয়-প্রক্রিয়া বেশ অস্পষ্ট এবং অধিকাংশ দেশে প্রতিরক্ষা ক্রয়ের বিস্তারিত রহস্যাবৃত থেকে যায়। তবে বেশির ভাগ উন্নয়ন সাহায্য সংস্থা, বিশেষ করে বহুপক্ষীয় ও আঞ্চলিক সংস্থাগুলো, এ ধরনের সামরিক সহায়তার সঙ্গে যুক্ত নয়।

৬০. উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বব্যাংক নিম্নোক্ত কৌশলের মাধ্যমে তার কৌশল বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নিয়েছে : ক. দুর্নীতিবিরোধী প্রক্রিয়ায় বিশ্বব্যাংকের জড়িত হওয়ার সুযোগ চিহ্নিত করা এবং একই সঙ্গে শাসনের সমস্যা বিশ্লেষণে এবং কৌশল ও প্রকল্প নির্ধারণে এসবের সমাধান খোঁজার জন্য দেশ শাসন ও দুর্নীতিবিরোধী প্রক্রিয়ার, যাতে আছে যৌথ ওয়ার্কশপ এবং সমসাময়িকদের কাছ থেকে শেখা, সাথে যুক্ত হওয়া; খ. শাসন ও বিভিন্ন খাতে ও প্রকল্পে দুর্নীতিবিরোধী প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হওয়া ১. প্রকল্প তৈরি ও খাতভিত্তিক সংলাপ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা ও প্রণোদনা শক্তিশালী করার জন্য এবং ২. চাহিদাভিত্তিক উপায়, জবাবদিহিমূলক শাসন সূচক এবং রাজনৈতিক অর্থনীতির বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন খাত ও প্রকল্পে নিয়মতান্ত্রিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও পর্যালোচনা শক্তিশালী করা। IEG, World Bank, "Bangladesh: World Bank Engagement in Governance and Anti-Corruption," 2011.

৬১. পূর্বোক্ত

৬২. NORAD, Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts: Bangladesh Country Report, January 2011. DFID, SIDA, NORAD, ADB, DANIDA. পরিশিষ্ট-গ. দ্রষ্টব্য।

৬৩. বিশ্বব্যাংক। *op cit*., p.6, pp. 29–31.

৬৪. NORAD, পূর্বোক্ত। ২০০৮ সালে এক পর্যালোচনা প্রতিবেদনে বলা হয় যে বাংলাদেশ সরকার তখনই পরিবর্তনের চাহিদার প্রতি সাড়া দেয় যতক্ষণ না এটি পৃষ্ঠপোষক ব্যবস্থার প্রতি কোনো ধরনের হুমকি তৈরি করছে, অন্য জায়গায় খুব কমই সত্যিকারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এটি ব্যাখ্যা করে কেন সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সাফল্য পেয়েছে কিন্তু দুর্নীতি দমন এবং আমলাতন্ত্রের সংস্কারে ব্যর্থ হয়েছে। প্রশাসনের রাজনীতিকীকরণ ও পৃষ্ঠপোষক-ব্যবস্থা পরিত্যাগ করার রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতির কারণে সরকারি সেবার যেকোনো উল্লেখযোগ্য সংস্কার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। S. Foot and A.K. Mubin. 2007. *Political Economy Assessment for Review of Financial Management Reform Programme.* DFID, Bangladesh

এটি একটি চলমান সমস্যা, যার মোকাবিলা করা বেশ কঠিন বলে দাতাদের কাছে মনে হয়েছে। তবে সরকারি সংস্থা যেমন: আমলাতন্ত্র, বিচার বিভাগ, পুলিশ এবং

সেনাবাহিনীতে কোনো সংস্কার নেই, এমনটি বলা যাবে না। তবে সমস্যা হচ্ছে পরিবর্তনের আওয়াজ তোলার সম্ভাবনা আছে এমন অনেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রায়ই বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন ও এ ধরনের পরিবর্তন আনতে যথেষ্ট প্রভাবশালী নয়। M. Moore, 2003, *Politics and the Drivers of Pro-Poor Change in Bangladesh*.

৬৫. NORAD পূর্বোক্ত।

৬৬. আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ভবন নিরাপত্তা ও শ্রমিকদের কর্মপরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত আইন ও বিধিমালা পালনের ব্যর্থতা সম্পর্কযুক্ত ক. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পরিদর্শনকারী এবং এ শিল্পের আঁতাতের, যা ঘুষের মাধ্যমে তৈরি, সঙ্গে এবং খ. শিল্প মালিকদের পরিদর্শনকারী সংস্থাগুলোকে দুর্বল ও অদক্ষ রাখার মধ্যে। আন্তর্জাতিক ধারণা যা বিদেশে প্রতিক্রিয়া তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে তা বিদেশি মিডিয়ায় এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে (*The Economist*, May 4, 2013): 'বিজিএমইএর ৪০০০ সদস্য রয়েছে, যারা রাজনৈতিকভাবে বেশ শক্তিশালী। এ শিল্প দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত এবং কমপক্ষে ২৫ জন এমপির এ শিল্পে বিনিয়োগ রয়েছে।' ২০১২ সালে একটি বড় কারখানায় অগ্নিদুর্ঘটনার পর তার কিছু সদস্য কারখানায় পরিদর্শক পাঠায়। চারটি ভবনে কাঠামোগত ত্রুটি ছিল। এ ছাড়া নির্মাণ বা শ্রম আইন লঙ্ঘন করা হয়েছিল। মালিক কারা ছিল? তারা বিজিএমইএর সভাপতি, তার পূর্বসূরি এবং একজন সাবেক সহসভাপতি। কাউকেই বিচারের মুখোমুখি হতে হয়নি। সবাই দেখছে কী হয় কোর্ট বিজিএমইএর ১৫ তলা ভবন অবৈধ ঘোষণা করার পর। ১৬ জুনের মধ্যে এটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন কোর্ট। তবে কেউই মনে করছে না বিজিএমইএ আদেশ মানবে। তবে তারা যদি তাদের নিজেদের অনিয়মই শোধরাতে না পারে তাহলে অন্যরা তা করবে কেন। বাংলাদেশের একটি বড় শিল্প গ্রুপ নসু গ্রুপের পদচারণা আছে ব্যাংকিং, নির্মাণ ও কৃষি খাতে। এর চেয়ারম্যান বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টেরও চেয়ারম্যান। এর তিনটি কারখানা জরিপে দেখা যায় যে তাদের প্রয়োজনীয় নিয়ম মেনে তৈরি করা হয়নি এবং তারা যেকোনো সময় ধসে পড়তে পারে। *Wall Street Journal*, March 30, 2013.

৬৭. এখন আমরা দেখি যে এই লোকগুলোকে কম বেতন দেওয়া হতো; তাদের সে রকমভাবে কোনো অর্থই দেওয়া হতো না এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো তাদের কাজ করতে হতো অনিরাপদ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, যা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। এটি এক ধরনের আধুনিক 'দাসত্ব', আরও বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশ যদি শ্রমমান উন্নয়নে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয় তিনি ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা স্থগিত করবেন।' EU Trade Commission's statement quoted in *Wall Street Journal*, Monday, May 6, 2013, p.A8.

৬৮. পরিদর্শকের সংখ্যা ১৮ জন থেকে কয়েক শতে উন্নীত করতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

৬৯. যেমন বাংলাদেশি শ্রমিকদের সংগঠন করার ও মালিকদের সঙ্গে দর-কষাকষি করার আইনি অধিকার দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে দেখা যায়, পোশাক শ্রমিকদের সংগঠিত করার চেষ্টা অতীতে দমন করা হয়েছে এবং আন্দোলনকারী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র থেকে খুঁজে বের করে হয়রানি করা হয়েছে সরকারি সমর্থন নিয়ে। *The Washington Post*, May 4–5, 2013। এটি হয়তো অতিরঞ্জিত, তবে এটি বিদেশে প্রচলিত ধারণা। এটি এখনো চলছে, যদিও কিছু শ্রম আইন ছিল অতীতে, তাদের কখনোই বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়নি।

৭০. *Financial Times*, May 6, 2013.

৭১. নৈতিক আচরণ গুণগত আস্থা তৈরি করে। প্রাথমিক পর্যায়ে নৈতিকতা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও বাইরের চাপের জন্য স্বল্প খরচের প্রতিস্থাপক। শাসনব্যবস্থায় দেখা যায় নৈতিক আচরণ ছাড়া, একটি নির্দিষ্ট সময় পর নিয়ন্ত্রণ বেশ ব্যয়বহুল ও এদের বাস্তবায়ন বেশ দুরূহ। আইন-প্রয়োগকারী ব্যবস্থা একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে, যদি মানুষের আচরণে ন্যূনতম নৈতিক ভিত্তি না থাকে। মূল্যবোধের একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার পরিচালনাকে বেশ সহজ করেছে। সমাজের সব পর্যায়ে, বিশেষ করে সমাজের উঁচু পর্যায়ে এবং অভিজাতদের মাঝে দুর্নীতি সহ্য করার মাত্রা বিগত কয়েক বছরে বেশ বেড়েছে। এ রকম পরিবেশে মানুষ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার বৈধতার ওপর আস্থা হারায়। আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা সার্বিকভাবে কমে গেছে।

৭২. বেসরকারি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জনক অ্যাডাম স্মিথ সম্পদের পাশাপাশি মূল্যবোধের ওপরও জোর দিয়েছিলেন। তিনি উচ্চ মুনাফা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। এটি ব্যবসায়ীদের মাঝে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান মিতব্যয়িতাকে নষ্ট করে দেয়। যখন মুনাফা বেশি হয়, তখন অপ্রয়োজনীয় ও মোটামুটি মানের মূল্যবোধের বাহুল্য দেখা দেয় এবং তার অবস্থার জন্য যতটুকু দরকার তার চেয়েও বেশি বিলাসিতা তার মধ্যে দেখা যায়। N. Islam, "Making of a Nation," p. 405

৭৩. http://en.wikipedia.org/wiki/Anti_Corruption_Commission_Bangladesh।

৭৪. Naushin Pasnini, Governance Reforms and Anti-Corruption Commission in Bangladesh. *Romanian Journal of Political Science*2 (1), 2011.

৭৫. M. Jason, Commissioner Vice Chairman, Corruption Eradication Commission, Indonesian Corruption Eradication Commission, 2010, Jakarta, Indonesia.

৭৬. ২০১২ সাল পর্যন্ত এটি অর্থ মন্ত্রণালয় এবং কাস্টমস ও শুল্ক বিভাগের সংস্কার এবং একই সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত এড়াতে অভ্যন্তরীণ নিয়ম শক্তিশালী করতে ভূমিকা রেখেছে।

৭৭. অন্যদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং নিজের সামর্থ্য তৈরির জন্য, ইন্দোনেশিয়ার দুর্নীতি নির্মূল কমিশন, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ব্রুনাই, হংকং ও সিঙ্গাপুরের এ রকম কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে ও তাদের সহযোগিতা পাচ্ছে।

খাতি
নৃতত্ত্ব
চিন্তা

নিম্নবর্গের সমুদ্র-জিজ্ঞাসা

বাংলাদেশের সমুদ্র প্রতিবেশ, বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে এক নিম্নবর্গীয় বয়ান[১]

পাভেল পার্থ

সারসংক্ষেপ

এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে বাংলাদেশের গ্রামীণ নিম্নবর্গের সমুদ্রবিষয়ক প্রচলিত ধারণা। বাংলাদেশ মূলত নদীবিধৌত সমভূমি হলেও সাধারণ মানুষের কল্পনা, সাহিত্য, জীবনাচরণ, কৃষি এবং অর্থনীতির নানা চলতি আলাপে ঘুরেফিরে এসেছে সমুদ্রের কথা। নিম্নবর্গের রূপকল্পে স্থান করে নিয়েছে সমুদ্র। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা, মিথ, গল্প, খাদ্যশস্যের এবং স্থানের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সমুদ্র বা সমুদ্র-সম্পর্কিত নানান বিষয়। কৌতূহলের বিষয় হচ্ছে নিম্নবর্গের এসব মানুষের অনেকেই কখনো সমুদ্র দেখেইনি। তারপরও তাদের কল্পনায়, সাহিত্যে এবং ঐতিহ্যে সমুদ্র উপস্থিত। এই উপস্থিতির এবং বর্ণনার বৈচিত্র্যের দিকটিই এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়। এখানে সমুদ্র শুধু নীল জলের বিশাল ভৌগোলিক এলাকাবিশেষই নয়, বরং ইতিহাসের উপাদান। নিম্নবর্গের সমুদ্র ভাবনা-ধারণা ও তার ইতিহাসের অনুসন্ধান প্রচেষ্টা এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

সমুদ্র, নিম্নবর্গ, লোককাহিনি, প্রতিবেশ, সৃষ্টিতত্ত্ব, দিকনির্ণয়, লিঙ্গদেমাগ, সমুদ্র-কৃত্য।

ডুবল জাহাজ লবলং সাগরে
জামালরূপে পাগল হইয়া
ডুবল জাহাজ লবলং সাগরে।।
(সূত্র: বাদশা বদিউজ্জামাল ছয়ফুলমুলক পুঁথি, ভেরামতলী, শ্রীপুর, গাজীপুর, বাংলাদেশ। ১২ মে ২০০৮, ব্যক্তিগত সংগ্রহ)

আলাপের ফেনা

বাংলাদেশের গ্রামীণ নিম্নবর্গের সমুদ্রজীবন থেকে চলতি আলাপখানির[২] বিস্তার। প্রতিবেশ, বৈচিত্র্য ও কৃত্য আরাধনার বিবেচনায় নিম্নবর্গের সমুদ্র-জিজ্ঞাসা এক প্রাথমিক স্তরের আলাপ। বলা ভালো, আলাপের খসড়া ভূমিকামাত্র। নদীমাতৃক বাংলাদেশে সাগরও কম নয়। দিনাজপুরের রামসাগর, গাজীপুরের লবলং সাগর, সুনামগঞ্জের কালিদহ সাগর, নীলফামারীর নীলসাগর আর বঙ্গোপসাগর। এ ছাড়া দেশে অনেক দিঘি আর স্থানের নামে জড়িয়ে আছে সমুদ্র। টাঙ্গাইলের ঘাটাইলের সাগরদিঘি, হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ের কমলারানীর সাগরদিঘি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলের টিঘর জামাল সাগরদিঘি। সাগরযান জাহাজের স্মৃতি নিয়েও আছে কত স্থানের নাম। পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জের শালডাঙ্গা ইউনিয়নের এক গ্রামের নাম জাহাজমনি, রংপুর শহরে আছে জাহাজ কোম্পানির মোড়। বিস্ময়করভাবে এক বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোথাও সমুদ্র নেই সশরীরে। চলতি আলাপখানি শুরুও হচ্ছে দেশের সমুদ্রহীন অঞ্চল থেকেই। সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা আর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিস্তৃত হাওরাঞ্চল দেশের মোট আয়তনের তিন ভাগের এক ভাগ। হাওরাঞ্চলের মৌখিক আখ্যানমতে, কালিদহ নামে এক বিস্তৃত সাগর থেকেই আজকের হাওরের জন্ম। পুস্তকি পণ্ডিতেরাও বলে থাকেন, সাগর থেকেই হাওর শব্দটি এসেছে[৩]। নীলফামারী সদরের গোড়গ্রাম ইউনিয়নে ৫৩.৯০ একর জায়গা নিয়ে নীলসাগরের অবস্থান। মহাভারতের কাহিনিকে ঘিরে এই দিঘির নাম হয়েছিল বিরাটদিঘি। পঞ্চপাণ্ডব যখন বিরাট রাজার রাজ্যে আত্মগোপন করে তখন তাদের জলতৃষ্ণা মেটাতে বিরাট রাজা এই দিঘি খনন করেন। তাঁর নামেই এটি পরিচিত ছিল। কেউ বলেন, বিরাট রাজার কন্যা বিন্যাবতীর নামে, এর নাম বিন্না দিঘি। ১৯৭৯ সালে সব নাম সরিয়ে নীলফামারীর তৎকালীন জেলা প্রশাসক এর নাম দেন 'নীলসাগর'। দিনাজপুর সদরের আউলিয়াপুর ইউনিয়নের তাজপুর গ্রামে অবস্থিত ৪,৩৭,৪৯২ মিটার আয়তনের রামসাগর দিঘি বর্তমানে জাতীয় উদ্যানও বটে। দিনাজপুরের রাজা রামনাথ পলাশীর যুদ্ধের আগে এই দিঘি খনন করেন। গাজীপুরের শ্রীপুরে রাথুরা শালবনের ভেতর প্রাকৃতিক এক জলাভূমির নাম লবলং সাগর। শোনা যায়, বাদশা বদিউজ্জামালের জাহাজ ডুবে যায় এই লবলং সাগরে। এ নিয়ে স্থানীয় পুঁথিপালাতে বলে, ডুবল *জাহাজ লবলং সাগরে/ জামালরূপে পাগল হইয়া/ডুবল জাহাজ লবলং সাগরে*[৪]। ভারত মহাসাগরের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এক উপসাগরের নাম বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়াকে ছুঁয়ে আছে ২,১৭২,০০০ বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত এই নোনা সমুদ্র[৫]। এই সমুদ্রের উত্তর-পূর্বেই দুনিয়ার দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার[৬]। বাংলাদেশের

কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, ভোলা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনা সরাসরি সমুদ্র উপকূলভূমি। কিন্তু চলতি আলাপটি সমুদ্র অঞ্চল থেকে শুরু হচ্ছে না। বঙ্গোপসাগর থেকে বহুদূরের সমুদ্রহীন জনপদ থেকে এই আলাপ শুরু হচ্ছে। অরণ্যভূমি থেকে জন্ম নিয়ে নানা স্মৃতির জলকণা নানা প্রবাহে নানা নামের নদী হয়ে 'মেশে' সমুদ্রে। চলতি আলাপখানি অনেকটাই নদীর সেই স্বভাবদর্শনটি ধার করেছে। অরণ্যভূমি থেকে সমুদ্রের স্মৃতি আর জাগরণ নিয়ে এক দীর্ঘ দূরের বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হওয়ার সাহস করছে। উজান-ভাটির জলপ্রতিবেশের ব্যাকরণ আর নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক সমুদ্র-জিজ্ঞাসাই এই সাহসের উৎস।

নামহীন সাগরের মাঝে কারাম গাছের উপরে
বাসা তো আমরা বানিয়েছি,
এখন কোথায় আমরা তাকাব
কোথায়ই বা আমরা থাকব না
এই সাগরের মাঝে কোনো স্থলভাগ নাই
বাবা ঈশ্বর চান্দোবঙ্গা আমাদের প্রার্থনা শোন
বলে দাও কোথায় আমরা থাকব
কোথায়ই বা আমরা থাকব না।
(সাঁওতাল সৃষ্টিপুরাণ নিয়ে রামদাস টুডু রেস্কা রচিত 'খেরওয়াল বংশা ধরম পুঁথি' থেকে নেওয়া হয়েছে[৭])

সমুদ্রফেনা, চিগেলবাড়িওয়ারিখুট্টি ও পিলচুদের সাঁতার

সমুদ্রফেনা ধান

সমুদ্রফেনা নামের এক ধানের সঙ্গে আমার পয়লা সাক্ষাৎ হয় মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের হাইল হাওরে। ধানটি বোরো মৌসুমের, চালের রং সাদা। যে সাদাকে 'সমুদ্রের ফেনার' মতো হিসেবে বর্ণনা করেন হাইল হাওরের কৃষক নারীরা। তাঁদের ভাষ্য, তাঁরা কখনোই সমুদ্র দেখেননি, এমনকি বড় নদীও। তবে শুনেছেন সমুদ্র অনেক বড়, সেখানে ঢেউ থেকে ফেনা হয়, ফেনার রং সাদা। পাতিহাঁসের ডিম, দুধ, পাকা চুল, চুন, বাতাসা, কদমা, দাঁত সাদা রঙের হলেও 'সমুদ্রফেনা' ধানের রং সমুদ্রের ফেনার মতোই সাদা। এভাবেই বংশ থেকে বংশে সমুদ্রের ফেনার রূপকল্প নিয়ে বঙ্গোপসাগর থেকে অনেক দূরের হাইল হাওরে টিকে আছে এক ধান। এককালে হাওরে জন্মাত সমুদ্রফেনার মতো টেপী, বোরো, রাতা, শাইল, লাখাই, মুরালী, চেংড়ি, কাচালত, হাসিকলমী, দুধলাকি, দুধসাগর, লাটলি,

আখনিশাইল, গাছমালা, খৈয়াবোরো, রাতাশাইল, দেউড়ি, কন্যাশাইল, বিচিবারই, লালাটেপী, পশুশাইল, হাঁসের ডিম, গুয়ারশাইল, বুয়ালের দাঁত, বেতী, ময়নাশাইল, গদালাকি, বিরঅইন, খিলই, ছিরমইন, আগুনী, গুলটিহি, ল্যাঠা, জাগলীবোরো এমনসব অবিস্মরণীয় গভীর পানির ধান জাত। দুনিয়ার প্রথম গভীর পানির ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৪ সালে হাওরের হবিগঞ্জ জেলার নাগুড়াতে। হাওরাঞ্চলে অনেক গভীর পানির ধান জাত থাকলেও কোনোটির নামই সমুদ্রকে ঘিরে নয়। তাহলে এই ধান কেন সমুদ্রের স্মৃতি নিয়ে টিকে আছে? কারা এই ধানের এমন নাম রেখেছে? যে অঞ্চলে সমুদ্রের কোনো শারীরিক সাক্ষাৎ নেই, সে অঞ্চলে সমুদ্রের ফেনা কীভাবে এক জটিল রূপকল্প হয়ে বিকশিত হয়ে পড়ল? তখন থেকেই এক গভীর 'সমুদ্র-জিজ্ঞাসা' উথলে ওঠে চারধারজুড়ে। সমুদ্র মানে কী? কী এর রূপ ও বিস্তার? তারপর দেশের সমুদ্রহীন ও সমুদ্র অঞ্চলের গ্রামীণ নিম্নবর্গের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ হয়েছে বিস্তর। সেখান থেকেই চলতি আলাপখানির প্রবাহ।

সৃষ্টিতত্ত্ব

দেশে বাঙালি-ভিন্ন প্রায় সব জাতির ভেতরেই মৌখিক বয়ানে সৃষ্টিতত্ত্ব বহমান। প্রায় সব সৃষ্টি-কাহিনিতেই দুনিয়ায় প্রথম তৈরি হয়েছে জল। বলা হয় 'বিস্তীর্ণ জলরাশি'। সৃষ্টি-কাহিনির এই জলবিস্তার সমুদ্রের কাছাকাছি। আর প্রায় প্রতিটি কাহিনিই বয়ান করে সমুদ্র থেকেই জীবনের উদ্ভব। গাজীপুরের বর্মণ-ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টিপুরাণ মতে, ভগবান কুম্ভী রানীকে মানুষ সৃষ্টির আদেশ দিলেন। কুম্ভী রানীর বাস অকূল সমুদ্রে। কুম্ভী রানীর পিঠের ময়লা মাটি থেকেই জন্ম হলো মানুষের। মান্দি সৃষ্টিপুরাণমতে, মিদ্দি (দেবতা) বাগবাবরম্বির চিপাং ফাকসা (তলপেট) থেকেই দুনিয়ার সব প্রাণ ও প্রকৃতি জন্ম নিয়েছে। তারপর সাগল আমার (সাগর) তলদেশ থেকে চিজং (কাছিম)-এর আনা মাটি দিয়ে নস্তনপান্ত প্রথম মানুষ আমা ফালদি ও আচ্ছুজানির জন্ম দিলেন। আর প্রাণের এই প্রথম বিকাশ ঘটেছে চিগেলবাড়িওয়ারিখুট্টি নামে সমুদ্রঘেরা এক অরণ্যদ্বীপে। সাঁওতালি ভাষায় জালাপুরি মানে সমুদ্র। দেবতা জিয়োর আদেশে ঈশ্বর বঙ্গা লিটো প্রথম জন্ম দিলেন পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুঢ়হির। তারা সমুদ্রে সাঁতার কেটে কেটে একসময় বসতি গড়ে তোলেন হিহিড়ি পিপিড়ি থেকে সাসাংবেডা হয়ে সিন্ধু অববাহিকার নানা গাঢ়ে (দুর্গ)। নিদারুণভাবে বর্মণ, সাঁওতাল কি মান্দি কেউই আজ আর সমুদ্র-বাসিন্দা নয়। সমুদ্র থেকে অনেক দূরেই তাদের বসতিস্থল। তাহলে আমরা যখন সমুদ্র নিয়ে আলাপ তুলব তখন কি দেশের নানা প্রান্তে ও জনজীবনে বহমান সমুদ্রস্মৃতিগুলোকে অস্বীকার করব? কেবল শারীরিকভাবে যাঁরা সমুদ্র অঞ্চলে বসবাস করছেন বা যাঁদের

একটা দীর্ঘ যাপিত সম্পর্ক তৈরি হয়েছে উজান-ভাটির সমুদ্র তরঙ্গে তাদের সংস্কৃতিকেই সমুদ্র-সংস্কৃতি হিসেবে পাঠ করব? নিদারুণভাবে তা-ই ঘটে চলেছে।

সমাপ্তি না উৎপত্তিস্থল

এ ক্ষেত্রে বিদ্যায়তনিক 'ভূগোলবিদ্যা' আমাদের কী জানায়? সচরাচর বলা হয়, অরণ্য পাহাড় থেকে বিন্দু বিন্দু জলে নদীর জন্ম। তারপর নদী কত পথ পাড়ি দিয়ে 'মিলিত' হয় সমুদ্রে। সব নদীর পরিণতি হচ্ছে সমুদ্রে মিলন, সমুদ্র হচ্ছে জলপ্রবাহের শেষ অন্তিম ঠিকানা। চলতি আলাপে এই চিন্তাটিকে আমরা 'অধিপতি' চিন্তা হিসেবে পাঠ করছি। সমুদ্রকে যেখানে দেখা হয় মিলনস্থল ও প্রবাহের সমাপ্তি আধার হিসেবে, সেখানে দেশের অনেক আদিবাসী সমাজে সমুদ্রকে দেখা হয় প্রাণের উৎপত্তিস্থল হিসেবে। জীবনপ্রবাহের শেষ ঠিকানা নয়, জীবনের শুরুই সমুদ্রে। সমুদ্রে জন্ম নেওয়া প্রাণের বিস্তার ঘটে নানা স্থানে নানা রূপে ও নানা ভঙ্গিতে। প্রাণের সেসব বিস্তার আবারও নদীপ্রবাহের ভেতর দিয়ে উৎপত্তিস্থলে এসে দেখা দেয়। জানান দেয় তার দীর্ঘ ভ্রমণের আখ্যান। সমুদ্র পরখ করে দেখে কোন প্রবাহের কী দশা। বিগত জীবনের আঘাতের দাগ ও বয়ে আনা ব্যঞ্জনাগুলো পাঠ করে। এখানে প্রাণপ্রবাহের হিসাবনিকাশ হয়। সব সৃষ্টি আর প্রবাহকে জায়গা দিতে হয় বলেই সমুদ্র অনেক বিস্তৃত আর গভীর। নালা, ঝিরি, পুকুর, দিঘি, ছড়া, ঝরনা, খাল, বাইদ, খাঁড়ি, দহ, কুণ্ড, নদ, নদী, হ্রদ, বাঁওড়, বিল, হাওর সবার চেয়ে। কারণ সমুদ্রকে নিরন্তর ধারণ করতে হয়, জন্মপ্রবাহ সচল রাখতে সজাগ থাকতে হয়। সমুদ্র নির্ঘুম, সদা জাগ্রত। নদীপথকে উজান আর সমুদ্রকে ভাটি হিসেবে দেখেন গরিষ্ঠভাগ জনগণ। নদীর উৎপত্তিস্থলের মানুষেরা মনে করেন নদীর মাথা সাগরের দিকে এগিয়ে যায়। সমুদ্র অঞ্চলের মানুষেরা নদীর সমুদ্রে মিশে যাওয়ার অংশকে সেই নদীর 'মুখ' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। চট্টগ্রামের পতেঙ্গা ও আনোয়ারার বারশত ইউনিয়নের দুধকুমড়ার (পারকি) কাছে কর্ণফুলী নদী সমুদ্রে মিশেছে। এ অংশটি স্থানীয়দের কাছে 'কর্ণফুলীর মুখ'।

হীরামন পাখির সমুদ্র

অধিকাংশ সময় সমুদ্রকে দেখা হয় অধিপতি পুস্তকি বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষের চোখেই। বাঙালি সমাজে প্রচলিত রূপকথাগুলোর ভেতর রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র বা কোটালপুত্রের 'সাতসমুদ্র তের নদী' পাড়ি দেওয়া এক বহুলব্যবহৃত রূপকল্প। রূপকথার ক্ষীরসাগর, দুধসাগর এখনো বিকশিত আছে মৌখিক বয়ানের স্মৃতিতে। এসব সমুদ্র পাড়ি দিলেই মেলে নানা রাজ্য কি জঙ্গল। তবে সমুদ্র এমনি এমনি বা যে কেউ পাড়ি দিতে পারে না। এর জন্য কসরত জানা লাগে, জাদুবিদ্যা লাগে,

'অলৌকিক বর' লাগে। বিস্ময়করভাবে কোনো রূপকথাতেই সমুদ্রকে 'অসীম', 'অনতিক্রম্য' হিসেবে দেখানো হয়নি। দেখানো হয়েছে সমুদ্রের একটা সীমা আছে, একে অতিক্রম করা যায়। এর একটি নির্দিষ্ট আয়তন ও অবস্থান আছে। আর তাই সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ওই পাড়ে পৌঁছে যায় রাজপুত্র কি কোটালপুত্র। কিন্তু সমুদ্রের ওই পাড়ে কখনোই মানুষ থাকে না, থাকে 'রাক্ষস খোক্কস বা দৈত্য দানো'। সেখানে মানুষ হিসেবে 'রাজকন্যাকে' ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়। রাক্ষস ও দৈত্যকে হত্যা করে রাজকন্যাকে জয় করে নিজ দেশে ফেরার ভেতর দিয়েই শেষ হয় কাহিনি। পাশাপাশি দেখা যায়, সমুদ্রের কথা এবং সমুদ্রপাড়ের 'রাক্ষসপুরির' কথা কোনো মানুষ জানে না, জানে শুকসারি কি হীরামন পাখিরা। রূপকথার নিরিখে দাঁড়াচ্ছে বর্ণিত রূপকথার *কারিগর বাঙালিরা* ঐতিহাসিকভাবে সমুদ্রবিচ্ছিন্ন বর্ণিত 'রাক্ষস দৈত্যদের' চেয়ে। এই রাক্ষস, দৈত্য, হীরামন পাখি কে বা কারা এ নিয়ে বিস্তর তর্ক তালাশ আছে। রহমান (১৯৯৭) 'রাক্ষসীর রূপকথা' শীর্ষক তাঁর একটি লেখায় জানান, রাক্ষস-রাক্ষসীরা এ দেশের প্রাচীনকালের কোনো অনুন্নত মানবগোষ্ঠী[৮]। তার মানে কি সাঁওতাল, কোল, লালেং, মান্দি, ম্রো, কডা, কড়া, খাসি, রাখাইন জাতির কেউ? পাশাপাশি পালিত (২০০৫) তাঁর এক লেখায় জানান, এ *দেশের আদিম আধিবাসীরা-হড়, হো (কোল) নামক জাতি, এরাই এ দেশের আদিব মানব; তারাই তাদের দেশকে বলত 'বাংলো'। এ দেশটা জলবহুল দেশ, জলাভূমি যথেষ্ট, ছেঁচে জল ক্ষেত্রে দিতে হতো না। বাং মানে না, আর লো মানে পাত্র ডুবিয়ে জল তোলা। তা থেকে জল ছেঁচাও বোঝায়। যে দেশে ছেঁচে জল দিতে হয় না, জল ছেঁচার আবশ্যক হয় না, অর্থাৎ ধান্যক্ষেত্রে জলের অভাব হয় না সেই দেশই 'বাংলোদিশম'। ইহাই তাদের জন্মভূমি (আয়ু-দিশম)। আর্য বৈদিকেরা এ দেশের নাম করেন নাই*[৯]। নামতর্ক যাই হোক না কেন, রাজধানী ঢাকায় তিন আদিবাসী জাতির নামে তিনটি এলাকার নাম মুছে না ফেললেও সেখানে তো আর আগের আদিবাসীরা নেই। মগবাজার, মণিপুরিপাড়া ও কুর্মিটোলা। এখনো তো বাঙালি ভিন্ন দেশের সব আদিবাসী জাতিসমূহকে 'অনুন্নত, আদিম, রাক্ষস, অনাধুনিক, বন্য, বর্বর' হিসেবেই দেখা হয় বা দেখার প্রবল[১০] মনস্তত্ত্ব জারি আছে।

লিঙ্গদেমাগ

প্রচলিত ইতিহাসগ্রন্থন ও উপস্থাপনের দুর্নিবার কায়দা বরাবরই জাত্যভিমানী, লিঙ্গদেমাগিও বটে। মধ্যবিত্ত বাঙালির সমুদ্রচিন্তা বারবার পুরুষালি কায়দায় বিবৃত ও নির্মিত হয়ে আসছে। 'ধরণি সর্বংসহা', সবকিছু সহ্য করতে পারে বলেই এই অধিপতি চিন্তাপদ্ধতিতে পৃথিবীকে মাতৃরূপে নারী হিসেবে দেখা হয়। ধরেই নেওয়া হয় দুনিয়ার বুকে যত জখম আর জালিয়াতি সবকিছু তাকে সহ্য করতেই হবে। সহ্য

করার ভেতর দিয়েই তাকে সর্বংসহা হয়ে জগৎজননী হিসেবে 'প্রমাণিত' হতে হবে। সমুদ্রকেও দেখা হয় সবকিছু ধারণ করার ক্ষেত্র হিসেবে। এমনকি 'পতিতদের' অঞ্চল। কারণ বলা হয় সব নদী সমুদ্রে 'পতিত' হয়। সমুদ্রের সঙ্গে নদীপ্রবাহের সাক্ষাৎ যেন নদীর চারিত্রিক স্খলন। তাই সমুদ্রে মিশে যাওয়ার আগে সে প্রবাহিত হয়, কিন্তু সমুদ্রের সঙ্গে সাক্ষাতে সে 'পতিত' হয়ে যায়। এভাবেই জলপ্রবাহের সারা জনমের দীর্ঘ পথযাত্রাকে অস্বীকার করে পুরুষালি বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। জনমভর নদী সবার তরে জান দিয়ে দিলেও যখনই নদীর জন্য কোনো বসত জমিন নিশ্চিহ্ন হয় তখনই মানুষ নদীকে 'রাক্ষুসী', 'প্রমত্তা' আর 'সর্বগ্রাসী' বানিয়ে দেয়। নদীর স্রোতের ফলে তীরের ভাঙনকে সচরাচর বলা হয় 'নদীগর্ভে বিলীন', গণমাধ্যমে লেখা হয় নদীর করালগ্রাস। নদীর কোনো বিশেষ সময়ের বৈশিষ্ট্যকে নেতিবাচক ও নারীর কাজ হিসেবে দেখা হয় এবং তখন একতরফাভাবে সমাজের লিঙ্গদেমাগি মনস্তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিস্ময়করভাবে সমুদ্রকে 'করালগ্রাসী', 'সর্বনাশী', 'রাক্ষুসী' হিসেবে আখ্যা দেওয়ার চল বিরল। এ বিষয়ে সমুদ্রহীন ও সমুদ্র অঞ্চলের জনগণ তেমন একটা লম্বা আলাপ করেননি।

সমুদ্রসঙ্গম

নদীপ্রবাহ ও সমুদ্রের সাক্ষাৎকে 'মিলন' হিসেবেই দেখার প্রচলিত চল। আর মিলনকে 'যৌনমিলন' হিসেবেই দেখা হয়। তাই তো নদী ও সমুদ্রের মিলনস্থল হলো 'সঙ্গমস্থল'। যেন নদীজন্মের একমাত্র গন্তব্য সমুদ্রের সঙ্গে সঙ্গম। নদী যেন তার দীর্ঘ পথে যৌনক্রিয়ার জন্যই মরিয়া থাকে। এভাবেই দীর্ঘ সময়জুড়ে নদীকে কামার্ত হিসেবে চিন্তা করার যৌনবাদী চিন্তার চল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমনিভাবে সমুদ্রও যেন যাবতীয় যৌনগ্রন্থি আর অঙ্গ মেলে জলপ্রবাহের জন্য প্রতীক্ষা করে, কখন ঘটবে যৌনসঙ্গম! বাংলাদেশে নদীপ্রবাহকে নদ ও নদী হিসেবে নারী-পুরুষদের ব্যঞ্জনা হিসেবে দেখা হয়। যেমন: ব্রহ্মপুত্র, কুমার, কপোতাক্ষ নদ। আবার কর্ণফুলী, করতোয়া, মেঘনা হলো নদী। নদ ও নদী সবাই তো সমুদ্রে 'মিলিত' হয়, নারী এবং পুরুষ জলপ্রকৃতির উভয়েই। সমুদ্রের কি কোনো লিঙ্গ পরিচয় আছে? সমুদ্র নারী, পুরুষ না হিজড়া কোন প্রকৃতির? নাকি সমুদ্র এতই বিশাল যে তার লিঙ্গপরিচয় বিলীন হয়েছে! তাহলে নদ ও নদীর সঙ্গে সমুদ্র সঙ্গমের সময় কি নদ ও নদী তাদের লিঙ্গপরিচয় খারিজ করে। নাকি বিবর্গীকরণ ঘটে? নদী ও নদ তার দীর্ঘ যাত্রাপথে প্রবল অধিপতি লিঙ্গদেমাগকে চুরমার করতে করতে সমুদ্রের কাছে হাজির হয়। নারী ও পুরুষদেহকে বিলীন করে জলদেহ নিয়ে নদ ও নদী মিশে যায় সমুদ্রের জলদেহে। তবে পুস্তকি দলিল আর বিদ্যায়তনে সমুদ্রকে কখনো কখনো নারী হিসেবে দেখার চল আছে। তাই বলা হয় 'সমুদ্রগর্ভ থেকে

উত্থিত হয়', সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলের সমুদ্রগামী জেলেদের ভাষ্য, সমুদ্র হলো নারীপ্রকৃতি। নদী এবং সমুদ্রদের সঙ্গম ঘটে। আর এই মিলনস্থল বা সঙ্গমস্থলটি সমুদ্রের সব সীমানার চেয়ে বেশি 'গরম'। এই গরম প্রত্যয়টি তাঁরা অধিক যৌনাবেগ হিসেবেই বোঝাতে চান। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার রাতে এই স্থলটি অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে চলাচলের জন্য বেশি 'বিপজ্জনক' হয়ে ওঠে। এখানে তখন স্রোত ও ঢেউয়ের প্রাবল্য বেশি হয়। তাদের ভাষ্য, সে সময়েই নদী ও সমুদ্রের 'মেলামেশা' বা 'সঙ্গমলীলা' চলে। আবার কক্সবাজারের মহেশখালী, সদর ও চকরিয়ার অনেকেই মনে করেন সমুদ্রের সঙ্গে নদীর মিলন বা সঙ্গম ঘটেনি, বরং একটি 'সংঘর্ষমূলক' আছে। সেখানে নদী ও সমুদ্রের তিনটি জলধারা একসঙ্গে না মিশে ত্রয়ী ধারার এক বিরল প্রবাহ তৈরি হয়েছে।

লবণ ও বিড়াল

চলতি সমুদ্র-জিজ্ঞাসার এক কেন্দ্রতল হচ্ছে সমুদ্রহীন ও সমুদ্র অঞ্চলের যাপিত জীবনে সমুদ্র তারপরও কীভাবে সম্পর্ক তৈরি করল। কীভাবে সমুদ্র অঞ্চল থেকে বহুদূরে থেকেও সাঁওতাল বা মান্দি জাতির মতো এক বিশাল বাংলাদেশ সমুদ্রকে বয়ে নিয়ে চলেছে? সমুদ্রের কি কোনো 'গৃহপালিত' রূপকল্প তৈরি হয়েছে? সমুদ্রচিন্তার এমনি এক সন্ধ্যারাতে চট্টগ্রামের আনোয়ারার পারকি সমুদ্রসৈকত থেকে ফেরার সময় ম্যাঁও করে উঠল এক বিড়াল। সাদা রঙের বিড়াল শিশু। বিড়াল নিয়ে সারা দেশে আছে নানা আচার। বিড়ালের মৃত্যু হলে সমপরিমাণ সামুদ্রিক লবণ দান করতে হয়। আর জিজ্ঞাসার একটি সূত্র যেন সেখান থেকেই থলের বিড়াল হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। সূত্রটি হলো লবণ। সমুদ্র থেকে কী অবলীলায় আজ দেশের প্রতিটি ঘরে জায়গা করে নিয়েছে লবণ। লবণ মানেই সমুদ্রের স্মৃতিস্মারক। ঠিক যেন বিড়ালের মতোই, একদা অরণ্য জীবন ছেড়ে কী অবলীলায় বিড়াল যেমন ঢুকে গেছে মানুষের ঘরে নিত্যসঙ্গী হিসেবে। কালো বিড়াল, সাদা বিড়াল, সাদা লবণ, কালো লবণ এসব নিয়েও আছে নানা আচার। সাঁওতালি ভাষায় লবণ মানে বুলুং আর মান্দিদের আচিক ভাষায় খাসিম। অনেকে বলতে পারে শংখ, শাঁখা এসবও সমুদ্রেরই স্মৃতিস্মারক, এসবও সঙ্গী হয়েছে সমাজের। সমুদ্রহীন কি সমুদ্র অঞ্চলে। কিন্তু এর বিস্তার ও আবশ্যকীয়তা সর্বজনীন নয়। লবণ সর্বজনীন সমুদ্রস্মৃতি হিসেবে নিরন্তর আমাদের সমুদ্র-সম্পর্ককে জানান দিয়ে চলেছে। চলতি আলাপটি এখন ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হওয়ার কিছুটা রসদ পেয়েছে। পরবর্তী অংশে মূলত চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সুন্দরবন অঞ্চলের সমুদ্রগামী জেলে ও সমুদ্রনির্ভর গ্রামীণ নিম্নবর্গের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে সমুদ্রপাঠের কিছু নমুনা হাজির হচ্ছে।

সমুদ্রের সীমা ও রূপ

সাগল আমা রিব্বক মিচ্চিক
বাল্ওয়া বালশিরি মি.শিখেল্ রংমিসেপ্মুঙ
মিখাচিখু বাদুরিমুং
দকদই মুগাদে
না.নিমামুঙ মি.নিমামুঙ
রূপফাদ্দি জাম্ফাদ্দি
মি.নিমা মুগনাবাদ্দি
না.নিমা সিম্ফাগিদ্দি
ও'নবো ম্যুক্খো...

(মান্দিদের হাবাহুইছাআ বা জুম আবাদের আগের কৃত্য গালমাকদুআ। গালমাকদুআ কৃত্যের একটি খ্রীতা বা মন্ত্রের এই অংশে বলা হচ্ছে : ও আমার সমুদ্রমাতা, ধবধবে নারী। ঝোড়ো হাওয়া-বাতাসের সাথে, উপর দিকে তুলে, অর্ঘ্য দিয়ে, ডালি সাজিয়ে ভাত দিয়েছি, তরকারি দিয়েছি। নামো বৃষ্টি হয়ে নামো, নামো...)

কক্সবাজার অঞ্চলে সমুদ্রকে বলে দইজ্জ্যা বা দরিয়া, চট্টগ্রাম অংশে বলে সাগর। কক্সবাজারের তঞ্চংগ্যারা সমুদ্রকে বলে 'দইয়া'। রাখাইন ভাষায় সমুদ্র মানে ম্রাইনা। বড় (পাটের রশি) জলে ফেলে সমুদ্রের পানির গভীরতা মাপে জেলেরা। এই মাপকে বাম বলে। এক বাম মানে সাড়ে তিন হাত। এক এক বামে এক এক রকম সমুদ্রের রং ও রূপ। সমুদ্রগামী জেলেরা মনে করে সমুদ্রের তলায় মাটি আছে। সমুদ্রের উপরের তল বা সমুদ্রপৃষ্ঠকে বলে চরএলাকা, তারপরের অংশটি খাঁড়ি, তারপর মাটি। এক এক অংশে এক এক রকম মাছ ও প্রাণী। উপরে থাকে নাইল্যা মাছ, এক বাম নিচে ইলিশ, তারপর মাইট্যা তারপর উন্দরা মাছ থাকে। ৬০-৭০ বাম নিচে থাকে হাঙ্গর ও বড় তিমি, সেখানে লাকু ও পুখা মাছও থাকে। তবে ২২ বামের নিচে নৌকা যেতে পারে না, সেখানে বড় বড় জাহাজ যায়।

সমুদ্রে 'আবাম-পানি' নামে একটা জায়গা আছে। আবাম মানে যার কোনো কূল বা বাম নেই। সমুদ্রগামী জেলেদের মতে এই স্থলটি দক্ষিণে। এখানে সচরাচর কোনো সমুদ্রযান যায় না, সেখানে যান গেলে উল্টে ডুবে যায়। চট্টগ্রামের সমুদ্রগামী জেলেদের কাছে সমুদ্রে পরপর তিনটি অঞ্চল আছে। ৫ থেকে ৬ বাম গভীরতায় মথুরা পানি, ১৫ থেকে ২০ বামে লাল পানি এবং ৩০ থেকে ৪০ বামে কালা পানি।

সমুদ্রের নানা জায়গায় নানা বর্ণ। সচরাচর সমুদ্রের 'সুন্দর নান্দনিক' ছবি হিসেবে সমুদ্রকে নীল বর্ণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু সমুদ্রের এই নীল রং সমুদ্রগামী জেলেদের জন্য নিদারুণ সংকেত। জলের রং নীল মানে সমুদ্রে মাছ পাওয়া যেতেও পারে আবার নাও পারে। একধরনের অনিশ্চয়তা। সমুদ্রের পানি

লালচে আভা ধারণ করলে বোঝা যায় সেখানে ইলিশ মাছ আছে। পানির রং ঘোলাটে ধূসর মানে কোরাল মাছ আছে। পানির রং কালচে হলে সেখানে মাইট্যা মাছের বিচরণ আর পানির রং সবুজ মানে সেখানে নাইল্যা মাছের ঘরসংসার। কক্সবাজার অঞ্চলের সমুদ্রগামী তঞ্চংগ্যারা মনে করে তাপমাত্রা বাড়লে ইলিশ কম দেখা যায়, কিছুটা ঠান্ডা আবহাওয়ায় ইলিশ বেশি দেখা যায়। শীতের সময় কুয়া (কুয়াশা) বেশি হলে ইলিশ দেখা যায় না। বেশি কুয়াশা পড়লে মাছ গভীর পানির নিচে চলে যায়। সমুদ্র উত্তাল হলে এবং বড় বড় ঢেউ হলে ইলিশ মাছ একেবারেই দেখা যায় না, তারা তখন নিরাপদস্থলে চলে যায়। সমুদ্রে সাত দিন 'জো' থাকে, জো-এর সময় সমুদ্র 'গরম (উত্তাল)' হয়ে যায়। এ সময় মাছ কম পাওয়া যায়। মাসের ২৮ তারিখ থেকে সমুদ্রের পানি নেমে যেতে থাকে। এই অবস্থাকে ডালা বলে, এটি ৩ থেকে ৭ দিন থাকে। ডালাতেও মাছ পাওয়া যায় না, তবে ইলিশ মাছ কিছু পাওয়া যায়। সমুদ্রে কোনো মিষ্টিপানি নেই, তবে সমুদ্রে এক এক জায়গায় লবণের স্বাদ ও মাত্রা এক এক রকম। তীর থেকে যত গভীরে যাওয়া যায় লবণের মাত্রা তত বাড়ে।

সমুদ্রের তলায় দেশ আছে[১১]

আমরা সচরাচর স্থলভাগের দেশের কথাই জানি। কিন্তু সমুদ্রেও দেশ আছে, জলের তলার দেশ। সেই দেশেরই নাম আইস্যারা। সাগরের একেবারে মাঝখানে এই দেশ। মেলা দূরের পথ। ওই খানে নানান জায়গার নানান নাম। নীল পানি, সাদা পানি, কালা পানি, মথুরা পানি। ওইখানে কেউ কোনো দিন যেতে পারে না। ওইখানে খোয়াজখিজিরের বাস। খোয়াজখিজির দরিয়ার মাঝে আইস্যারা দেশের মালিক। ওইখানে বড় বড় ছুছুম (ইরাবতী ডলফিন) থাকে। আইস্যারা দেশ পশ্চিম দিকে সমুদ্রের গভীরে জলের তলায়। জেলেরা খুব বেশি ৩০-৪০ বাম যায়, কিন্তু ওই দেশ আরও মেলা দূরে। এক বাম মানে প্রায় সাড়ে তিন হাত গভীর।

একবার সুলেমান বাদশা আইস্যারা দেশে যেতে চেয়েছিল। পুরো দরিয়া সে মাপতে চেয়েছিল। সাত মাস ধরে সে দরিয়াকে মাপতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও সেখানে থাকতে পারে না। আইস্যারা দেশে দরিয়ার বুকে শোলা ডুবে আর লোহা ভাসে। সুলেমান বাদশা যখন দরিয়ায় যাত্রা শুরু করে তখন প্রচণ্ড ঢেউ ওঠে। ঢেউয়ের ভেতর থেকে একটা বিশাল সাপ মাথা তোলে। সুলেমান বাদশা সাপটিকে ধরার জন্য একটি বড় বড়শি ফালায়। সাপ যখন বড়শি গিলতে উপরে ওঠে হাঁ করে তখন সুলেমান বাদশা সাপের মুখে গরম সিসা ঢেলে দেয়। সাপটি তখন মরে যায় এবং একটি পিলার হয়ে দরিয়ায় দাঁড়িয়ে থাকে। ওই পিলারই দরিয়ার শেষ সীমান্ত। এরপরে আর যাওয়া যায় না। এরপরেই আইস্যারা দেশের শুরু।

কিন্তু সুলেমান বাদশা আবারও যাত্রা শুরু করে। এবার বাদশা একটা দেচরু পাখিকে ধরে উড়িয়ে দেয়। বলে, পাখি তুমি ঘুরে এসে জানাও আইস্যারা দেশটি কত বড়। দেচরু পাখি উড়তে উড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। টানা ছয় মাস ধরে উড়ে উড়ে পাখি এক বিশাল মাছের দাঁড়ার ওপর গিয়ে বসে। মাছ বলে, পাখি তুমি কোথায় যাবে? পাখি বলে, সুলেমান বাদশা আমাকে হুকুম দিয়েছে আইস্যারা দেশ কত বড় তা জানানোর। মাছ বলে, তুমি এক্ষুনি ফেরত যাও। গিয়ে বলো, ওইখানে গেলে কেউ ফেরত আসতে পারে না। ওইখানে গেলেই তুমি মরবে। পাখিটি উড়ে উড়ে আবার ফেরত আসে।

সুলেমান বাদশা তারপর মাছেদের কাছ থেকে আইস্যারা দেশের কথা জানতে মাছেদের জন্য এক বিরাট দোদ (মেলা) করে। নানান জাতের মাছ আসে। চেউয়া, দামবুরুক, ফুলচিরিম, দনদনা ইলিশ, ছুরি, মুছ, পাইপচান্দা, ছুছুম, রূপচান্দা, ফিটকেলা অনেক জাতের মাছ। হঠাৎ সেখানে পানিতে ঢেউ তুলে একটা ইচা মাছ আসে। বিশাল বড় ইচা মাছ। ইচা মাছ সুলেমান বাদশার পুরো মাছের মেলা একাই গিলে ফেলে। ইচা মাছ বলে, তুমি মাছের মেলা করে আইস্যারা দেশের কথা জানতে চেয়েছ, আমি একাই সব খেয়েছি। আরও দিলে আরও খাব। সুলেমান বাদশা তারপর ক্ষান্ত হয় এবং দরিয়া থেকে চলে আসে। আইস্যারা দেশে যাওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয় না। তারপর সুলেমান বাদশা আইস্যারা দেশের মালিক খোয়াজখিজিরের নামে একটি কিল্লা বানায়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে কলার ভুরায় করে একটি এক রঙের কোড়া (মুরগি) দরিয়ায় ভাসিয়ে দেয় খোয়াজখিজিরের নামে।

দইজ্জ্যা-পরবাস

সমুদ্র অঞ্চল থেকে জেলেরা মাছ ধরতে গেলে প্রায় এক সপ্তাহ থেকে দশ দিন সমুদ্রে থাকে। সমুদ্রকালীন জেলেদের এ সময়টাকে 'দইজ্জ্যা-পরবাস' বলে। এ সময় সমুদ্র ও বাড়িতে নানা নিয়ম পালন করতে হয়। সমুদ্রে যাওয়ার সময় কোড়ার (মুরগি) ডিম খাওয়া যায় না। চলর (ছাগল) মাংস খেয়ে যাওয়া যায় না। সমুদ্রে থাকাকালীন সাম্পানে পাকা কলা খাওয়া যায় না এবং কলা খেয়ে যাত্রা করা যায় না। গোসল করে সমুদ্রে যাত্রা করতে হয়। সমুদ্রে যাওয়ার আগে চুল দাঁড়ি কাটা যাবে না, সমুদ্র থেকে ফিরে কাটতে হয়। সমুদ্রে পরবাসে সাধারণত পুরুষেরাই যায়। তবে বরগুনা, পিরোজপুর ও ভোলা অঞ্চলে অনেক পরিবারে নারীরাও পরবাসে নৌকায় থাকে। সমুদ্রে পরবাসকালীন সময়ে সহবাস ও সব ধরনের যৌনকাজ নিষিদ্ধ। বাড়ি থেকে কেউ সমুদ্রে গেলে সেই বাড়ির নারীদের নানা নিয়ম পালন করতে হয়। তারা পরবাসের সময়টাতে মাথায় তেল-সাবান দিতে পারে না। চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ানো যায় না। কোনো জলাধার থেকে পানি তুলতে গেলে উথালপাথাল শব্দ

করে পানি তোলা যায় না। এ সময়টায় ঘর লেপা যায় না। মাটির উনুন থেকে ছাই ও কয়লা বের করে পরিষ্কার করা যায় না। মাথার চুল বেঁধে মাথা ঢেকে রাখতে হয়। এ সময়টায় সুচ দিয়ে কোনো কিছু সেলাই করা যায় না। পরবাসে যাওয়ার জন্য সাম্পান, বোট, টেম্পো ও ট্রলার নৌকা ব্যবহৃত হয়। একটি দলে আট থেকে দশজন থাকে। দলের প্রধানকে মাঝি বলে, অন্যদের গইড়/গৌড় বলে। এদের একজন রান্না করে, অন্যরা নৌকা বায় ও জাল টেনে মাছ ধরে। সমুদ্রে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো মাছ ধরতে যাওয়া। কক্সবাজার অঞ্চলে একে বলে 'জাল মাইত্তো যাইয়ম'। তবে চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমুদ্রযাত্রায় একটি নৌকায় ৩০ থেকে ৩৫ জন থাকে। দলপ্রধানকে বলে স্রাং/সারেং, নির্দেশক হিসেবে থাকেন একজন, তাকে বলে গলাইয়া, গলাইয়ার অধীনে ৪ জন বরগুর থাকে, একজন বাবুর্চি এবং বাদবাকি সবাই গাউর বা নাইয়া মানে শ্রমিক।

বছরের প্রথম দরিয়াযাত্রার আগে পাড়ার সবাইকে নিয়ে মুসলিম সমাজে মিলাদ পড়ানো হয় এবং হিন্দুদের মধ্যে পূজা দেওয়া হয়। বছরের প্রথম ধরা মাছ সমুদ্র থেকে ফিরে এসে পাড়ার অনেককে নিয়ে খাওয়া হয় এবং একটা উৎসব তৈরি হয়। দরিয়াযাত্রার সময় মাঝি ঘাট থেকে নৌকা ছাড়ার আগে নৌকার আগায় তিন বালতি পানি ঢেলে নৌকাকে ডানে ঘুরিয়ে তারপর সোজা দক্ষিণ বরাবর নৌকা ছাড়ে। শুক্রবারে সাধারণত দরিয়াযাত্রা করা যায় না। সমুদ্র থেকে সাধারণত বিঙ্গি জাল বা কুড়ি জাল দিয়ে মাছ ধরা হয়, এ ছাড়া আছে বাসা জাল। আগের দিনে দরিয়াযাত্রার আগে প্রবীণেরা সংফুল সুতা দিয়ে জাল বানাত, এখন সেই সুতা নেই। এখন নাইলনের সুতা দিয়ে বানানো জালে মাছ ওঠে কম, মাছ পিছলে যায়। সমুদ্রে থাকাকালে নৌকায় নতুন জাল বানানো যায় না। আকাশে বিজলি চমকালে এবং বজ্রপাত হলে আর সমুদ্রে থাকা যায় না, তখন তীরে এসে উঠতে হয়। একটি সমুদ্রযাত্রার পর মাছ নিয়ে জেলেরা ফিরে আসে তীরে। অধিকাংশ সমুদ্রগামী জেলেই কোনো না কোনো মালিকের অধীনে একজন 'দাসশ্রমিক' হিসেবে কাজ করে। আগাম মজুরি বিক্রি করে সমুদ্রে নামতে হয় এবং ধৃত মাছের মজুত মালিকের জিম্মায় ঢেলে দিতে হয়। একটি সমুদ্রযাত্রা থেকে আরেক যাত্রায় যাওয়ার আগে ৭ থেকে ১০ দিনের একটি বিরতি থাকে। তখন জাল ও নৌকা মেরামত করতে হয়। বাইজ্যা বাঁশ দিয়ে বানানো দাইস্যা ও টবিল নামের সুই দিয়ে মাছ ধরার জালগুলো সারানো হয়।

পরবাস থেকেই হয়তো পরবাসী ও প্রবাসী ধারণাটি তৈরি হয়েছে। তবে জলের ওপর জীবিকার প্রয়োজনে সাময়িক অবস্থানই পরবাস। এটি জলজীবন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর উৎপাদনসম্পর্কের এক নিজস্ব মাত্রা। তবে মাঙতা-বেদেদের ভেতর বহর নিয়ে নদী থেকে নদীতে সাময়িক স্থানান্তরও 'পরবাস' নামেই প্রচলিত।

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময় সমুদ্রে থাকা যায় না। এ সময় সমুদ্র থেকে তীরের কাছাকাছি চলে আসতে হয়। গ্রহণের সময় সমুদ্রে মাছ ধরা নিষেধ এবং তখন কোনো আহার পর্যন্ত গ্রহণ করা যায় না। গ্রহণের সময় নৌকায় কোনো মাছ বা কোনো কিছু লাফিয়ে উঠলে তা খুব নিরাপদে আবার সমুদ্রের পানিতে ছেড়ে দিতে হয়।

সমুদ্রে দিকনির্ণয়

সমুদ্রে দিকনির্ণয় বহুচর্চার বিজ্ঞান। সমুদ্র অঞ্চলের মানুষেরা শৈশব থেকে প্রবীণ বয়স সারা জীবন এ বিজ্ঞান রপ্ত করে চলে। তবে এই দিকনির্ণয়ের জন্য প্রায় অঞ্চলেই দক্ষ লোক থাকেন। যাঁদের বিশেষভাবে কদর হয় সমুদ্রযাত্রায়। মূলত আকাশের তারা দেখেই দিক নির্ণয় করা হয়। এ ছাড়া বাতাসের গতি ও বেগ, কখনো চারপাশের গন্ধ, পাখির আচরণ ও মাছের বিচরণ, মেঘের ধরন, পানির স্রোত ও বর্ণ-গন্ধ এসব থেকেও দিক সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায়। সমুদ্রগামী জেলেরা বংশপরম্পরায় বিশ্বাস করেন সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে এবং পশ্চিমে ডুবে যায়। সূর্য ওঠা মানে দিনের শুরু এবং ডুবে যাওয়া মানে রাতের শুরু। সূর্য সব সময়ের জন্য আকাশে থাকে, কিন্তু চাঁদ ১৫ দিন ঘুমিয়ে থাকে এবং ১৫ দিন জেগে থাকে। চাঁদের নির্ঘুম রাতকে পূর্ণিমা বলে এবং তখন সমুদ্রে যৌবনতরঙ্গ বয়। এ সময় পূর্ব থেকে দক্ষিণে বাতাস বইলে সমুদ্র উত্তাল হয়ে ঝড়-জলোচ্ছ্বাস হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সূর্য সব সময় গোল থালার মতো হয়, কিন্তু চাঁদের আকার ভিন্ন ভিন্ন হয়। কখনো গোল, কখনো বাঁকা এবং কখনো অর্ধেক। সূর্য ও চাঁদ গোল থালার মতো হলেও তারাগুলো দেখতে ফালি ফালি করা কামরাঙা ফলের মতো। একটি তারার পাঁচটি আঙুল থাকে। তারাদের জন্ম ও মৃত্যু আছে। মাঝে মাঝেই মৃত তারারা আকাশ থেকে পড়ে যায়। তারাদের মৃতদেহ সমুদ্রের পানিতে মিশে যায়। সমুদ্রগামী জেলেরা অধিকাংশ সময়ই তারার অবস্থান দেখে মূলত পূর্বদিককে চিহ্নিত করে। ওলা তারা, সাত বইন সুরতি তারা এবং ডিঙ্গি তারার অবস্থান পূর্ব দিকে। রাতের আকাশে এই তারাদের দেখে তারা পূর্ব দিককে চিনতে পারে। পূর্ব দিক চিনলেই বাকি দিকগুলো চেনা হয়ে যায়। পূর্বের উল্টোদিক পশ্চিম, পূর্বের ডান দিক দক্ষিণ এবং বাম দিক উত্তর। তবে কুয়াশাচ্ছন্ন ও মেঘলা দিনে তারা দেখা যায় না, তখন বাতাসের গতিভাব দেখে দিক নির্ণয় করা হয়। শরীরে বাতাসের অনুভব করেই দিক নির্ণয় করা যায়। কক্সবাজারের সমুদ্রগামী জেলেদের ভাষ্য, সমুদ্রে থাকাকালীন কোনো বাতাস যদি শরীরে লেগে 'উটাল মারে (ডিগবাজি খেয়ে একধরনের শিহরণ তৈরি করে)' তবে বুঝতে হবে সেই বাতাস দক্ষিণ থেকে বইছে। উত্তর দিক থেকে আসা বাতাস শরীরে লাগলে শরীর জুড়িয়ে যায়, শরীর ঠান্ডা হয় এবং খুব আরাম লাগে। পূর্ব দিক থেকে আসা বাতাসকে জেলেরা 'নূরানী বাতাস' বলে, এই বাতাস

সচরাচর ভোর থেকে সকালের দিকে বয় এবং খুব আস্তে ধীরে। পশ্চিম দিক থেকে আসা বাতাস গভীর সমুদ্র থেকে মাছেদের টেনে তীরের কাছাকাছি কম গভীরতায় নিয়ে আসে। কিন্তু উত্তর দিকের বাতাসের ফলে মাছেরা আবার উত্তর স্রোতের মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে চলে যায়।

সমুদ্রের প্রাণ ও বৈচিত্র্য

কক্সবাজার, সুন্দরবন, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমুদ্রগামী জেলেদের ভাষ্য, গত ১০০ বছরে মাছেদের বিচরণস্থল ও বংশবিস্তার পাল্টে গেছে। অনেক মাছ খুব কম দেখা যাচ্ছে। সমুদ্র গভীরতায় মাছেদের বসতিস্থলও বদলে গেছে। পাইপচান্দা, পোকা, ছুরি, মুছ, রাঙাছই, গমদানা বা দনদনা ইলিশ, বোল, জৈর, করুল, রাচৈর, কালাকইল্যা, তেইল্যা, সিরসিরি, কাউয়া ইছা, উলাইল্যা, চাগা, টুইন্যা, খইরতা, বিষকৈ, বাড়া, হরুম, বিছাতারা, মুড় বাইল্যা, ছিরিং, লাকউয়া, লামপুকা, ফইল, উন্দরা, গুয়ারা, চান্দিকাঁটা, তেইল্যা, নারকেলি, পাঙাশ এসব মাছ বর্তমানে অনেক কম দেখা যায়। তবে চট্টগ্রামের সমুদ্রগামী জেলেরা জানালেন রূপচান্দা, কাউয়া, বোমমাইটা, মাইট্টা, তবল, পেটবাজানি, লেদরা, বরা, পাগলা, হাছিনা, লাল, মুছ, কাটা, কালপোয়া, পুগা, সোনালি, লগা মাছ এখন সমুদ্রে কম দেখা যায়। চট্টগ্রামের আনোয়ারা ও বাঁশখালী অঞ্চলের সমুদ্রগামী জেলেরা ইলিশকে 'ইলিম' বলেন। কক্সবাজারের তঞ্চংগ্যারা ইলিশকে বলে 'নাহলং মাত'। মিয়ানমার থেকে উচ্ছেদ হওয়া রোহিঙ্গারা ইলিশকে বলে 'ঙা জুলুক'। কক্সবাজারের সমুদ্রগামী জেলেরা পুইট্টা, গমদানা বা দনদনা ও জাতি ইলিশ এভাবে তিন জাতের ইলিশ ভাগ করেন। তাঁদের মতে, দনদনা বা গমদানা ইলিশ সমুদ্রের সবচেয়ে সুন্দর ইলিশ। এই মাছ না নারী না পুরুষ। খেতে স্বাদ কম। পেটে কোনো ডিম হয় না। শরীরে খুব গন্ধ হয়। বর্ষায় এই মাছ খুব পাওয়া যেত। দনদনা ইলিশ কখনোই একা চলাফেরা করে না। এদের সঙ্গে থাকে খইপুড়ি মাছ। সমুদ্রে জন্মানো উদ্ভিদ নিয়ে তেমন একটা হদিস রাখেন না সমুদ্রগামী জেলেরা। তবে সমুদ্রতটে জন্মানো গুল্মলতাগুলো স্থানীয়দের নানা কাজে লাগে। সমুদ্রের বালিয়াড়িতে মিউন্দ্যা হয় খুব, এর পাতা জ্বর সারাতে ও মুখে রুচি বাড়াতে কাজে লাগে। ইয়ানচি ফল, ছলেলাইদ্যা গুলা ফল খাওয়া যায়। কেউরগা গুলা, ছুনে গুলা, শিউলিগুলা, গাকগুলা, কেয়াড়াগুলা, উন্দুরাগুলা, চরকিগুলা, সুগুলা ও গুরুপ ফল ভেসে আসে স্রোতে। পরবাসকালীন এসব ফল জালে ধরে খায় সমুদ্রগামী জেলেরা। সমুদ্রের তীরজুড়ে থাকা লাল কেয়ারা (লাল কাঁকড়া) এখন কমে যাচ্ছে। ভাদ্র মাসে আগে তঞ্চংগ্যারা এই কাঁকড়া খেত, এখন তেমন দেখা যাচ্ছে না। সমুদ্রের তীরে জন্মানো বিউকাঁটা (হরগোজা) ফুল দিয়ে স্থানীয় রাখাইন ও বাঙালি হিন্দুরা পূজা করে।

সমুদ্র অববাহিকা ও তীর জন্ম দিয়েছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কৃষি আবাদের। পটুয়াখালীর সমুদ্রতীর ক্যানছাই চুয়ানে (কুয়াকাটায়) একসময় রাখাইনরা জুম আবাদ করত। কক্সবাজার অঞ্চলে সমুদ্র লাগোয়া ঢেউখেলানো ধাপ ধাপ স্তরের জমিনকে স্থানীয়ভাবে বলে পোয়াইন্যা জমি। এ ধরনের জমি বরেন্দ্র অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। পোয়াইন্যার জমির উপরের অংশকে বলে পিউক এবং তারপর পাহাড়। কক্সবাজারের টেকনাফ অঞ্চলের তঞ্চংগ্যারা আগে গিলাতইল্যা মুড়া, মগরশিয়া ও কাট্টলখাইয়াতে জুম আবাদ করত। কট্টমনি, আমে, টুই, গ্যাল্লং, রাঙা খবক, নাইজইল্যা বিনি, কালাবিনি এসব ধান জুমে হতো। পোয়াইন্যা জমিনে সমুদ্র উপকূলীয় বাঙালি পরিবার আগে চাষ করত বৈলাম, লম্বরু, কষ্টমনি, বিনি, জটাবেতি, লাড়ুম, গিরিং, কদমণি, চীনাগুরুম, আশাইল, পাইজাত, ছোট পাইজাত ধানের জাত। গেতু, আসাইল, লাটুম ছিল আউশ জাত। উল্লিখিত ধান জাতের আবাদ এখন উঠে গেছে।

দুনিয়ার বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবনের টিকে থাকার বিজ্ঞান সমুদ্রকে ঘিরে। সমুদ্র উপকূলেই দেশের গর্জন মাতৃবৃক্ষের শেষ অরণ্যস্থল। হাতি থেকে কাঁকড়াভুক প্যারাইল্যা বানর সমুদ্র উপকূলীয় বনগুলোকে করেছে বৈশিষ্ট্যময়।

সমুদ্র কৃত্য

ক্ষীরসাগরে ক্ষীরের ঢেউ ঢল ঢল করে
লক্ষ হাজার পদ্মফুল ফুটে আছে থরে।
ঢেউ থই থই সোনার কমল, তারি মাঝে কি?
দুধের বরণ হাতির মাথে গজমোতি।
(দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরমার ঝুলি নামের রূপকথা সংকলনের দুধের সাগর অংশে একটি রূপকথার নাম শীতবসন্ত। এই পদ্যখানি শীতবসন্ত থেকে নেওয়া)

সমুদ্রগামী জেলেরা বিশ্বাস করে সমুদ্রের রক্ষাকবচ মা গঙ্গা ও খোয়াজখিজির। গঙ্গার নাম একভাবে উচ্চারিত হলেও, বঙ্গোপসাগরের নানা অংশে খোয়াজখিজিরের নামের উচ্চারণে ভিন্নতা দেখা যায়। খোয়াজখিজির, খোয়াস খিতি, সোয়াস খিতি, খুয়াজ খিতির, খিজিরে সালাম, গাজী কালু এ রকম নামগুলো পাওয়া গেছে। সমুদ্রগামী জেলেরা বিশ্বাস করে পানিতে খোয়াজখিজিরই পানির সব জীবকে রক্ষা করে, এমনকি সমুদ্রগামী জেলেদেরও। মূলত বাংলা ভাদ্র মাসে খোয়াজখিজিরের নামে শিরনি দেওয়া হয় এবং বেড়া ভাসানো হয়। আষাঢ়-শ্রাবণ এ দুই মাস সমুদ্রে যাওয়া বারণ, তখন খোয়াজখিজির সমুদ্র থেকে উঠে আল্লাহর কাছে সওয়াল জবাবের জন্য চলে যায়। তখনই সাগর উত্তাল হয়ে ওঠে।

খোয়াজখিজির আবার সমুদ্রে ফিরে এলে সমুদ্রে নামে জেলেরা। সমুদ্রে পূর্ব দিকে পাহাড়ে মোহাম্মদ হানিফার টং, তার ঠিক পশ্চিমে নাফ নদী ও সমুদ্রের মিলনস্থলে একটি মসজিদ আছে। ওইখানেই বিশ্রাম নেন খোয়াজখিজির। সমুদ্রগামী জেলেরা এখানে নামাজ পড়েন। এখান থেকে কখনোই মাছ ধরা হয় না। কখনো কখনো গভীর সমুদ্রে 'গায়েবি আজান' ও 'শঙ্খধ্বনি' শোনা যায়। তখন মাছ ধরা বন্ধ রেখে জেলেরা খোয়াজখিজির ও মা গঙ্গার কাছে প্রার্থনা করেন। খোয়াজখিজিরের নামে মানস (মানত) করা হয়। লাল রঙের কোড়া (মুরগি) মাটির হাঁড়িতে ভরে কলার ভুরায় (ভেলা) সমুদ্রের পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

সমুদ্রগামী জেলেরা বিশ্বাস করে সমুদ্রে জিনও থাকে। এই জিনের নাম জেইক্ক। এই জিন যাকে নজর দেয় তার পেছন ছাড়ে না, এর শক্তি বেশি। এ ছাড়া সমুদ্রে থাকে মাচ্ছাদেইও। এরা সমুদ্রে জেলেদের কাছে মাছ চায়, মাছ দিলে কোনো ক্ষতি করে না। না দিলে নৌকা ডুবিয়ে দেয়। তবে চট্টগ্রামের সমুদ্রগামী জেলেরা মনে করেন সমুদ্রে বসবাস করে 'কাল'। এই কাল খুবই ভয়ংকর, সবাই ভয় পান। তাই কালের নামে সমুদ্রগামী জেলেরা ফাতিহা পাঠ করেন এবং মানস (মানত) করেন।

সমুদ্রে অনেক সময় কোনো কোনো মাছ এমনিতেই লাফিয়ে নৌকায় উঠে আসে। সেই মাছ যত্নে তুলে আবার পানিতে ছেড়ে দিতে হয়। জেলেদের বিশ্বাস খোয়াজখিজির তার কোনো সঙ্গীকে এভাবে মাছের রূপ ধরে পাঠিয়ে জেলেদের লোভ পরীক্ষা করতে চায়। শুধু জালে যেসব মাছ ওঠে তাই জেলেরা সংগ্রহ করেন। তবে সব ধরনের মাছ বাঙালি মুসলিম জেলেরা খায় না। তারা ছুছুম, মুতরা ইছা, দামবুরুক ও চেউয়া মাছ খায় না। কক্সবাজারের মহেশখালীতে বাঁকখালীর টেক বা নাজিরাটেকের মাথার কাছে সমুদ্র ও নদীর মিলিত প্রবাহস্থলে সমুদ্রগামী জেলেরা সমুদ্রে নামার আগে ফুল, চাল, ফলফলাদি উৎসর্গ করেন।

সুন্দরবনের সমুদ্র-রাস

জলপ্রবাহের নানা প্রান্তে নানা স্রোতে নানা নাম, নানা আচার। দীর্ঘ বঙ্গোপসাগরের সব অংশও রূপে ও চর্চায় ভিন্ন ভিন্ন। বিস্তৃত সমুদ্রও কোথাও কোথাও পেয়েছে 'পবিত্রস্থলের' আখ্যা। দক্ষিণাঞ্চলের সুন্দরবনের দুবলারচরের সমুদ্রতট এমনি এক আরাধনার থান। প্রতিবছর রাসপূর্ণিমা তিথিতে সমুদ্রস্নানের মানতে মানুষে মানুষে ভরে ওঠে সৈকত। সুন্দরবনের দুবলারচরে রাসমেলা আয়োজনের শুরুর কাহিনিগুলো খুব একটা জানা না গেলেও এখানকার রাসেও স্থানীয় বনজীবীদের নিজস্ব বিশ্বাস ও রীতি-রেওয়াজই প্রাধান্য পেয়েছে। খুলনা, সাতক্ষীরা, শরণখোলা ও চাঁদপাই রেঞ্জের ভেতর বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলা ও সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জে প্রায় আটটি কাছাকাছি চর নিয়ে দুবলারচর।

দুবলারচরের প্রায় আটটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপচরের পঁচিশটি এলাকায় প্রায় ২০ হাজার মৌসুমি জেলে মাছ ও কাঁকড়া ধরার জন্য অক্টোবর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত গোল-গরানের মাচাঘর তৈরি করে বসবাস করে। সুন্দরবনের রাসমেলার মূল আনন্দের অংশীদার এরাই। দুবলারচরে রাস উৎসবের মূল প্রাণ সাগর সঙ্গমে রাসস্নান। রাস স্নানের সঙ্গে জমে ওঠে মেলা, কীর্তন গান এবং পূজা। আছে মানতকারীদের মানত উৎসর্গ করার বৈচিত্র্যময় আচাররীতি। সাধারণত পরিবার বা গ্রামভিত্তিক এক একটি বড় নৌকায় দুই থেকে চার দিনের জলপথ পাড়ি দিয়ে দুবলারচরের রাসমেলাতে পৌঁছাতে হয়। খাওয়াদাওয়া, রান্নাবান্না, ঘুম, গানবাজনা সবই নৌকাতে করতে হয়।

তিথি অনুযায়ী রাসে আগত মানতকারী ও তীর্থযাত্রীরা সাগরের কিনারে ঠায় বসে মাঝরাত থেকেই অপেক্ষা করে। পুণ্যতিথির সঙ্গে সঙ্গে স্নান শুরু হয়, কেউ কেউ পিণ্ডদান করতে বসে পড়েন। কেউ কেউ মানত উৎসর্গ করেন। মানতের পাঁঠা-মুরগি-কবুতর সাগরের জলে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে এগুলো জল থেকে তুলে বনের কিনারে ছেড়ে দেওয়া হয়, আবার অনেকে খাওয়ার জন্যও নিয়ে যান।

রাস স্নানের আগের দিন শিবঠাকুর ও গঙ্গাদেবীর পূজা দিয়ে রাসের পূজা শুরু হয় আলোরকোলে। সন্ধ্যায় বনবিবির পূজা হয়। রাতে চম্পকলতা, বিশখা, বুড়িমা, বৃন্দী, রাধা-কৃষ্ণ, ললিতা, চন্দ্রাবলী, ইন্দুরেখা, তুঙ্গবিদ্যা, গাজী, কালু ও মৎস্যদেবীর পূজা হয়। রাসমন্দিরে বনবিবি, কালু, গাজীদের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের অষ্টসখী যেমন : বৃন্দী, ললিতা, চন্দ্রাবলী, ইন্দুরেখা, তুঙ্গ-বিদ্যা, বিশখা, চম্পককলা ও বুড়িমার পূজার চল কয়েক বছর হলো শুরু হয়েছে। আগে এখানে রাস উৎসবে বনবিবি-গাজী-কালু ও রাধাকৃষ্ণের পূজা হতো। আগে এখানে কেবল বনবিবির পূজা হতো রাতের বেলায় আর ভোরে স্নান করে সবাই চলে যেত। এখন রাস উৎসবে রাতের বেলা আলোরকোলে রাসপ্রাঙ্গণে জমে ওঠে রাসলীলাকীর্তন।

রক্তলাগা লবণফুল[১২]

সূর্য ওঠেরে তেজমারি
ও ভাই লবণ বসেরে ফুলকুটি
দল পুইজ্জা উঠিলাম মাঠে যাই
পূবালী বাতাসন লাগে আঁরার গায়
সে বাতাসে কত আরাম আঁরা পায়,
আরো কত শান্তি লাগে—
লবণ বেচি টাকা লইলে হাতে[১৩] ।।

(লবণ চাষের গান, *লবণচাষি সম্প্রদায়* বই থেকে গানটির অংশবিশেষ উল্লেখ করা হলো)

মৌলঙ্গী সম্প্রদায় সমুদ্রজল থেকে লবণ উৎপাদনের বিজ্ঞান উপহার দিয়েছিলেন দুনিয়াকে। যেন সমুদ্রের তরতাজা স্বাদ আর ঝাঁঝ লেগে থাকে যাপিত জীবনের প্রতিটি ক্ষণে। এক দানা লবণ যেন এক দানা সমুদ্রের বিস্তার। এভাবেই নানা ব্যঞ্জনার সমুদ্রস্মৃতিগুলো এক করেছে লবণ। অধিপতি ইতিহাস মৌলঙ্গীদের অস্বীকার করে দুমড়েমুচড়ে তৈরি করেছে করপোরেট লবণ-বাণিজ্যের মারদাঙ্গা বাজার। সুন্দরবন ও সমুদ্র উপকূলে সমুদ্রের পানি জাল দিয়ে লবণ বানাতেন মৌলঙ্গীরা। বর্তমানে ওই পদ্ধতি নেই, বলা ভালো জোর করে তা রুদ্ধ করা হয়েছে। ব্রিটিশ উপনিবেশকালে লবণ উৎপাদনে নিষেধাজ্ঞা[১৪] আনা হয়, তখনো গোপনে মৌলঙ্গীরা লবণ বানাতেন। এমনও তথ্য[১৫] আছে প্রতিবছর সন্দ্বীপ থেকে ২০০ জাহাজ লবণের চালান যেত ইউরোপে। লবণ এমনই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পণ্য হয়ে ওঠে যে লবণ থেকেই 'বেতন' কথাটির জন্ম হয়[১৬]। ব্রিটিশ শাসকেরা লবণকে নিজেদের জিম্মায় নিয়ে যায়। ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধী লবণ আইন অমান্য করে আন্দোলন শুরু করেন। পাকিস্তান আমলে লবণ উৎপাদনের ওপর ধার্য করা হয় উচ্চ কর। ১৯৬০ সালে ৪০ সের লবণের দাম ছিল ১ টাকা। কিন্তু ১৯৬১ সালে হঠাৎ লবণের দাম বেড়ে যায়। একটি দেশলাই বাক্সের খোলের ভেতর যতটুকু লবণ ধরে ততটুকু লবণের দাম হয়েছিল ৪ আনা। ১৯৭১ সালে ১ মণ লবণের দাম হয় ৪০০ টাকা।

জোয়ারের পানি জমিতে আটকে প্রায় সাতটি পর্বে লবণদানা তৈরি হয়। অগ্রহায়ণ মাস থেকে শুরু হয় লবণ মৌসুম, শেষ হয় বৈশাখে। আয়োডিন অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ আইন ১৯৮৯ অনুসারে, তৈরি প্যাকেট ব্যাতীত কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো প্রকারে ভোজ্য লবণ বিক্রয়, গুদামজাত, বিতরণ ও প্রদর্শন করতে পারবে না। আইন লঙ্ঘন করলে তিন বছরের কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে। পৃথিবীর আর কোনো দেশে আইন করে লবণে আয়োডিন মিশিয়ে খাওয়ানোর নজির নেই[১৭]। সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল থেকে গ্রামীণ জনগণের ঐতিহাসিক লবণ উৎপাদনের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। পাশাপাশি সমুদ্র উপকূলীয় কৃষিজমিগুলো প্রায় জোর করে দখল করে নিচ্ছে শহর থেকে আসা লবণ কোম্পানিরা। কৃষিজমি হারিয়ে অনেকেই দিনমজুরি এবং অনেকে দরিয়ার জেলে বা শহরের পথে প্রতিদিন নিরুদ্দেশ হচ্ছে। আগে টেকনাফের শাহপরীতে সব ছিল চাষের জমি, এখন সব নোনার মাঠ। এত লবণ যে কেডায় খায় ন বুঝি। এই নোনার মাঠের জন্যই আমাদের সব দুঃখ[১৮]। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উপকূলীয় অঞ্চলে যে প্রশ্নহীনভাবে করপোরেট লবণ-বাণিজ্য শুরু হয়েছে তা কিন্তু স্থানীয় খাদ্য সুরক্ষাকেই আঘাত করছে যে তা নয়, একই সঙ্গে তা মিয়ানমার থেকে আসা রাজনৈতিক শরণার্থী রোহিঙ্গাদের সঙ্গেও সংঘর্ষমূলক পরিস্থিতি তৈরি করছে।

অংশেংথা ম্রো ও হলুদ ফুলের দেশ[১৯]

দেশের সমুদ্র উপকূলের আদি বাসিন্দা রাখাইনদের ভাষায় সমুদ্র উপকূলের প্রায় জায়গারই একটি রাখাইন নাম আছে। ক্যানছাই-চুয়ান মানে কুয়াকাটা, ঠিক তেমনই রামুকে রাখাইন ভাষায় বলে প্যাঙ-ওয়া মানে হলদে ফুল। একসময় রামু আরাকানের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। আবুল কাশেম তাঁর *রামুর ইতিহাস* বইতে লিখেছেন, গৌতম বুদ্ধ রাজা চানসুরিয়ার আমলে সেবক আনন্দকে নিয়ে ধান্যবতীর এক ধর্মসম্মেলনে আনন্দকে বলেছিলেন ভবিষ্যতে পশ্চিম সমুদ্রের পূর্ব উপকূলে গৌতম বুদ্ধের বক্ষাস্থি স্থাপিত হবে। তখন এর নাম হবে রাং-উ মানে বুকের হাড়। অনেকে মনে করেন বর্মী শব্দ 'রাং-উ' থেকেই এই রামু নামের উৎপত্তি। সম্প্রতি আক্রান্ত রামুকে অনেকে বলছেন এককালের প্রাচীন মগধ রাজ্যের অংশ, যেখানে বাংলা অঞ্চলের বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও রাখাইন বৌদ্ধ সংস্কৃতির এক মিশ্রণ ঘটেছে। রাখাইনরা এ অঞ্চলের সভ্যতার আদি কারিগর হলেও নানান কারণে এখানে রাখাইনরা উদ্বাস্তু ও নিরুদ্দেশ হয়েছেন। রামুর জোয়ারিনালা ইউনিয়নে একসময় এক সমৃদ্ধ রাখাইন গ্রাম ছিল ছেংঘ্রি, এখন এই গ্রামের নাম মাছুয়াখালী ধলীরছড়া। এখানে এখন কোনো রাখাইন বসতি নেই। ঠিক তেমনি এক রাখাইন জনপদের নাম তংছাওয়ারা, এটিও জোয়ারিনালা ইউনিয়নেই। এখন আর এখানে কোনো রাখাইন বসতি নেই।

১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান রাজা সুধম্মার মৃত্যুর পর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রাজপুত্র ঙা থ্যেং খাইন আরাকান থেকে পালিয়ে অরণ্যে আশ্রয় নেয়। পরিবারের অন্য সদস্যরা চট্টগ্রামের ক্যানথায় চলে আসে। আরাকানের এক মন্ত্রী ঙা লাৎ রুং বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে চট্টগ্রামে আসেন। তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়ে অগ্গামেধাবী নাম ধারণ করেন এবং বাঘোলি (বাঁকখালী) নদীর তীরে অংশেংথা নাম নিয়ে জনবসতি গড়ে তোলেন। অংশেংথা মানে সমৃদ্ধ শান্তিময় নগর। ১৭৯৪ সালের দিকে ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স অংশেংথা গ্রামে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং রাখাইনরা তাঁর নামে গ্রামের নতুন নাম দেয় 'ফালংশেই বা ফালংঝেই ম্রো' মানে অধিকর্তা বা অফিসারের বাজার। সেখান থেকেই নাম হয়ে যায় কক্স সাহেবের বাজার 'কক্সবাজার'। কক্সবাজারের চৌফলদণ্ডীর রাখাইন নাম ছ-লি-গ্যা, ভারুয়াখালীর নাম লে-ছং-র, পানেরছড়ার নাম ন-রৌ-তং, মহেশখালীর নাম মাহাঝো, পটুয়াখালীর খেপুপাড়ার নাম শেং-ফ্রু-র।

সমুদ্রের সঙ্গে রাখাইনদের ঐতিহাসিক সম্পর্ককে কখনোই ন্যায়বিচার করা হয়নি। এই জনপদ বাংলাদেশকে লবণ, পান, নাপ্পি, শুঁটকি আর মাছ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু রাষ্ট্র এই সমুদ্র উপকূলের আদিবাসী জীবন ও বৌদ্ধসভ্যতাকে অস্বীকার করে চলেছে। বঙ্গোপসাগরের ব্যাকরণ বুঝতে রাখাইন সমুদ্র জীবনের আপন বিকাশ জরুরি।

মসলিন, মৌলঙ্গী ও 'নীল অর্থনীতি'

চলতি আলাপটি সমুদ্রের কাছে চলে এসেছে। আর কাছে এসেই সমুদ্র ঘিরে ঔপনিবেশিক মারদাঙ্গা আর নয়াউদারবাদী বাহাদুরির জখম দেখতে পাচ্ছে। আলাপটি মসলিন, নীল, গাঁজা, পাট হয়ে সমুদ্রের লবণের ভেতর এক মিল খুঁজে পাচ্ছে। এদের সবাইকেই পাড়ি দিতে হয়েছে এক দীর্ঘ ঔপনিবেশিক ক্ষত আর অন্যায়। কারণ এরা সবাই এই জনপদের অবিস্মরণীয় ভৌগোলিক নির্দেশনা। এই জনপদ দুনিয়াকে এসব উপহার দিয়েছে। মসলিন, নীল, গাঁজা, পাট আর লবণের উৎপাদন, প্রক্রিয়া ও কারিগরি এখানেই জন্ম নিয়েছে। দীর্ঘ ঔপনিবেশিকতা এসবকে ছিনিয়ে নিয়েছে। মসলিন তাঁতিদের কবজি কেটেছে, মৌলঙ্গীদের লবণ তৈরি নিষিদ্ধ করেছে। সম্পদ ও জ্ঞানের ওপর নিম্নবর্গের সার্বভৌমত্ব খারিজ করে দিয়ে তৈরি করেছে একতরফা নিয়ন্ত্রিত বাজার।

সমুদ্র আজ নিজেই নয়াউদারবাদী যন্ত্রণায় কাতর। সমুদ্রগামী জেলেদের ভাষ্য, সমুদ্রতল দিনে দিনে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। কক্সবাজারের সমুদ্রগামী মধ্যবয়স্ক জেলেদের ভাষ্য, সমুদ্রে পানি বাড়ছে না, দিনে দিনে সমুদ্রের পানি কমছে। অনেকে এই পানি কমে যাওয়াকে সমুদ্রের গভীরতা কমে যাওয়া হিসেবে ব্যাখা করেন। তাদের অভিজ্ঞতায় ১৯৬০ সালের দিকে এই গভীরতা ১৫০ থেকে ২০০ বাম ছিল। পরবর্তী সময়ে এই গভীরতা কমতে কমতে বর্তমানে এই গভীরতা ৫ থেকে ৪০ বামে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮০ সালের দিকেও সমুদ্রগামী জেলেরা ১৪ থেকে ২০ বাম থেকে মাছ ধরতেন, কিন্তু চলতি সময়ে ৫ থেকে ৭ বামেই মাছ ধরা হয়। পাশাপাশি সমুদ্র আজ নানা রাসায়নিক বর্জ্য, তেল আর প্লাস্টিক দূষণে অস্থির। ষাটের দশকে চালু হওয়া তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লবের' ধাক্কায় কৃষি জমিনে ব্যবহৃত রাসায়নিক বিষের তলানি জমা হচ্ছে সমুদ্রতলেই। দুনিয়াজুড়েই সমুদ্র আর বর্জ্যের ভাগাড়। তেল-গ্যাস খননের আওতা থেকেও মুক্ত নয় বঙ্গোপসাগর। সোনাদিয়ায় প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্রবন্দর নিয়ে তর্ক উঠেছে। বাগেরহাটে সুন্দরবনে রামপাল তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের দূষণ-বর্জ্যের যন্ত্রণাও সইতে হবে সমুদ্রকেই। সমুদ্র-দ্বীপগুলোর কোনো সুরক্ষাই আজ নিশ্চিত নয়। সমুদ্র উপকূলের অরণ্য ও পাহাড়ে পড়েছে করপোরেট বাণিজ্য কোপ। একের পর এক পাহাড় ধসে পড়ছে সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে। ২০০০ সালের ১৭ আগস্ট প্রভাবশালীদের নির্বিচার পাহাড় দখল ও কাটার ফলে কক্সবাজারের বৈদ্যেরঘোনা পাহাড়ে অবস্থিত শত বছরের প্রাচীন বৌদ্ধ প্যাগোডাটি ধসে পড়ে এবং প্রায় ১২ জন আহত হয়[২০]। কক্সবাজারের সমুদ্র উপকূলের পাহাড়টিলা জঙ্গল পুরোটাই আজ বাণিজ্যিক পর্যটনের দখলে। লাগাতার হোটেল আর বাণিজ্যিক বসতি তৈরি করে সমুদ্র-পাহাড়ের জটিল বাস্তুসংস্থান চুরমার করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই দখলদারদের সঙ্গে সমুদ্রের কোনো জন্মসম্পর্ক

কি রক্তসম্পর্ক নেই। এরা একেবারেই বহিরাগত প্রভাবশালী অন্যায় কারবারি।

সমুদ্রে লাগাতার রাসায়নিক ও তেল-দূষণের কোনো নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকার নেই। বাগেরহাটের মংলায় দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য বন্দর। এ বন্দরের কাছাকাছি ১৯৮৮ সালের ১ জুলাই তেল কার্গো ফুটো হয়ে সুন্দরবনে ডিজেল ছড়িয়ে পড়ে এবং একই সালের ১০ আগস্ট সুন্দরবনের মাজহার পয়েন্টে ট্যাংক সংঘর্ষে উচ্চমাত্রার সালফারযুক্ত তেলে ছড়িয়ে যায় সুন্দরবনে। ১৯৯৪ সালের আগস্টে মংলা বন্দরগামী একটি বিদেশি জাহাজ সুন্দরবনের পাশে বানীশান্তায় ডুবে যায় এবং ভাটিতে ২০ কিলোমিটার এলাকায় তেল ছড়িয়ে পড়ে (সূত্র : পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন, ২০০২)। ২০১৪ সালের ৯ ডিসেম্বর সুন্দরবন বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জের মৃগমারী এলাকায় 'এমটি সাউদার্ন স্টার-৭' নামের এক কার্গোবোট ডুবে ৩ লাখ ৫৭ হাজার ৬৬৪ লিটার ফার্নেস তেল ছড়িয়ে পড়ে শ্যালা নদীসহ চাঁদপাই রেঞ্জের প্রায় ২০টি খাল, দুটি ভাড়ানী ও বন স্তরে। ২০১৩ সালের ৩১ জুলাই চট্টগ্রামের দোহাজারীর কালুরঘাটে তেলবাহী ওয়াগন লাইনচ্যুত হয়ে কর্ণফুলীসহ আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে ফার্নেস তেল। প্রায় সব কটি তেল-বিপর্যয়েই দেখা গেছে জোয়ারের পানিতে তেল-দূষণ ঘটেছে সমুদ্র পর্যন্ত, এ ছাড়া সমুদ্রে নিত্য তেল-দূষণ তো আছেই। পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণহীন বাণিজ্যিক পর্যটনের চাপে দেশের সব কটি সমুদ্র তীর আজ ছিন্নভিন্ন, চলছে সমুদ্রতট দখলের লাগাতার নৈরাজ্য।

এ রকম এক নয়াউদারবাদী করপোরেট এজেন্সি নিয়ন্ত্রিত বিশ্বায়িত দুনিয়ায় 'সমুদ্রের টকটকে নীল পানিকে' নিয়ে 'নীল অর্থনীতির' শোরগোল উঠেছে। এই নীল অর্থনীতি কার চোখে, কার জিম্মায়? জানা যায়, ব্রিটিশ উপনিবেশকালে লবণ উৎপাদনে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল বলে অনেক মানুষ আরাকানে চলে যায়। রাজনৈতিক পালাবদলে ভূগোলের নাম পরিবর্তন হয়। আবারও মিয়ানমার থেকে উদ্বাস্তু রোহিঙ্গারা আসতে থাকে বাংলাদেশে, বাংলাদেশ থেকে সমানে মানুষ জীবিকার সন্ধানে ভাসে অকূল দরিয়ায়। বাস্তব কি স্বপ্নে, দেখা কি অদেখায়, ধরা কি অধরায় সমুদ্র যেন বাংলাদেশের নিম্নবর্গের বিকাশমান সভ্যতার এক অনিবার্য অভিজ্ঞতা। সমুদ্র কি সমুদ্রহীন অঞ্চল সবখানেই সমুদ্র এক টানটান রূপকল্প আর স্মৃতিময়তা। সমুদ্রবিষয়ক সব ভাবনা ও কারিগরি সবকিছুতেই সমুদ্র ঘিরে নিম্নবর্গের এই বহুমাত্রিক জিজ্ঞাসাকে মর্যাদা ও স্বীকৃতি দেওয়া জরুরি। রূপকথা থেকে চলতি সময়ের রাজপথ, রাখাইন থেকে রোহিঙ্গা, মসলিন থেকে লবণ, মগবাজার থেকে প্যাঙওয়া, মান্দি থেকে ক্ষমতার মসনদ বাংলাদেশের সব গ্রন্থিতেই লেগে আছে সমুদ্রের দাগ। এই দাগ কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। সমুদ্রহীন ও সমুদ্র অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় আখ্যানে এই সমুদ্র-সম্পর্ককে জোয়ার-ভাটার বিজ্ঞান হিসেবেই পাঠ করা হয়। চলতি আলাপখানি সমুদ্র দেখার সাহস করেছে।

আবারও এক ক্ষুদ্র জিজ্ঞাসা দিয়ে চলতি আলাপের বিস্তার এখানে ইতি টানছে। সচরাচর বলা হয়, নদী সমুদ্রের পানে ছুটে যায়। সমুদ্র তাহলে ছোটে কার পানে? সমুদ্র কি তবে স্থির, টানহীন?

হর্ণফুলি দুলি দুলি
হুদু যেবে হনা
যেদুং চাং ত সমারে
মরে নে জানা।
হুন মোনত্তুন এচ্চোত তুই
হুন সায়রত যেবে
মই যেম ত সমারে
মরে তুই হি নিবে?

(একটি চাঙমা প্রচলিত গান। এখানে কর্ণফুলী নদীকে অনুরোধ করা হচ্ছে নদীর সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য, জিজ্ঞেস করা হচ্ছে কোন পাহাড় থেকে জন্ম তোমার, কোন সাগরে তুমি যাবে। এই চাকমা গানটিতেও নদীর সঙ্গে সমুদ্র মিলনের অনিবার্যতাকে পাঠ করা হয়েছে।)

তথ্যসূত্র :

১. 'কক্সবাজার আন্তর্জাতিক দ্বি-বার্ষিক চিত্রকলা উৎসবে' 'সমুদ্র-জিজ্ঞাসা' শিরোনামে চলতি আলাপখানির প্রাথমিক রূপটি পঠিত হয়েছিল। ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫, কক্সবাজার।

২. মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মাগুরা, ঝিনাইদহ, যশোর, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, ঢাকা, গাজীপুর, নাটোর, রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার, ঝালকাঠি, নোয়াখালী দেশের এই ৪৫ অঞ্চলের গ্রামীণ নিম্নবর্গের জ্ঞানভাষ্য ও যাপিত জীবনের সমুদ্র-অভিসন্দর্ভের ভেতর দিয়ে চলতি আলাপটি দাঁড়িয়েছে। চলতি আলাপে বিবৃত সকল তথ্যের মালিকানা এসব অঞ্চলের বাঙালি ও আদিবাসী জনগণের। বিবৃত তথ্যের একতরফা বাণিজ্যিক ব্যবহার মেধাস্বত্ত্ব অধিকার লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচ্য হবে।

৩. দেখুন : *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ২০০২, 'হ' অংশ, সম্পাদনা করেছেন ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, স্বরোচিষ সরকার, বাংল একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১২২৪

৪. দেখুন : পাভেল পার্থ, ২০১৩, 'ভাওয়াল শালবন বনাম দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম সাফারি পার্ক', http://www.obosorbd.com/

৫. দেখুন : উইকিপিডিয়া/বঙ্গোপসাগর, https://bn.wikipedia.org/wiki/

৬. দেখুন : http://www.smh.com.au/news/travel/theworldslongestbeach/2007/01/31/1169919381993.html

৭. রামদাস টুডু রেস্কা রচিত সাঁওতাল ধর্ম ও সংস্কৃতির আদিগ্রন্থ *খেরওয়াল বংশা ধরম পুঁথি* অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন সুকুমার টুডু ও সারদা প্রসাদ কিস্কু, নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ভারত, পৃ. ৯৪।

৮. আতোয়ার রহমান, ১৯৯৭, 'রাক্ষসীর রূপকথা,' লেখাটি *লোককৃতি কথাগুচ্ছ* পুস্তক থেকে নেওয়া, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১৯-২০

৯. শ্রী হরিদাস পালিত, ২০০৫ (এই লেখাটি *কায়স্থ সমাজ* পত্রিকায় ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল)। বাংলার আদিম জাতি ও সভ্যতা, দীপংকর ঘোষের সংকলন ও সম্পাদনায় ভারতের প্রাক-স্বাধীনতাপর্বে প্রকাশিত নৃতত্ত্ব ও আদিবাসীচর্চা বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা* নামক পুস্তক থেকে লেখাটি নেওয়া হয়েছে, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত, পৃ. ৫৪-৫৫।

১০. বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পাঠ্যপুস্তকে লেখা ছিল, সাঁওতালদের প্রধান খাবার ভাত, পিঁপড়া ও মদ। চারুলাল মুখার্জির *দ্য সান্তালস* বইয়ের ৭১ নং পাতায় বলা আছে, 'O, they (Santals) will eat anything that flies except aeroplanes and anything that swims except boats'.

১১. চলতি এই আখ্যানটির একটা ছোট ফিরিস্তি আছে। কক্সবাজারের টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র উপকূলের এক সমুদ্রগামী জেলে জনপদ। সমুদ্রগামী জেলেদের ভাষ্য, শাহপরী নামে এক বুজুর্গ নারীর নামে এই এলাকার নাম শাহপদ্দি বা শাহপরী হয়েছে। অনেকে বলে, আগে এই দ্বীপে পরীরা বসবাস করত। নোয়াপাড়ার ঝিনাখালে বাঁধ দিয়ে লবণ চাষ করার আগ পর্যন্ত শাহপরীর দ্বীপ পুরোটাই সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ ছিল। টেকনাফ থেকে প্রায় ২০ কি.মি. দূরের এই দ্বীপ জনপদের মানুষেরা একেবারে শিশুকাল থেকেই সাগরে সাগরে বড় হয়। বর্ষায় ২-৭ দিন আর শীতে প্রায় এক মাস দূর দরিয়ায় (সাগর) কাটিয়ে মাছভর্তি নৌকা নিয়ে ফেরে পুরুষেরা। নারীরা সমুদ্রের নোনা জল থেকে লবণ বানায়, মাছ শুকিয়ে রাখে। শাহপরীর দ্বীপে ১৩৪০ বাংলায় জন্ম আবদুল জলিলের। মা খদিজা, বাবা মতলুব হোসন। শাহপরীর দ্বীপের সাহসী সমুদ্রগামী জেলেদের ভেতর দনদানা ইলিশ ধরায় তাঁর বেশ সুনাম। ভূমিহীন এই পরিবার বর্তমানে কক্সবাজারের টেকনাফের সাবারাং ইউনিয়নের ডাংগরপাড়ায় থাকেন। সমুদ্রগামী জেলেরা বঙ্গোপসাগরকে বলেন দরিয়া। দরিয়ার সবখানে যাওয়া যায় না। সমুদ্রগামী জেলেদের ভেতর নানান নিষেধাজ্ঞা আছে। দরিয়ার রক্ষক খোয়াজখিজির। তাকে মেনেই সমুদ্রগামী জেলেদের সব কাজকারবার। দরিয়ায় জেলেদের জীবন বাঁচায় গাজী-কালু। তবে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে যদি কেউ দরিয়ায় নামে আর মারা যায় তবে গাজী-কালু তার জবাব দিতে পারে না। ২৩ জুলাই ২০১০ তারিখে সন্ধ্যায় শাহপরীর দ্বীপে সমুদ্র থেকে ফিরে আসা জেলেদের আড্ডায় আইস্যারা দেশের কাহিনিটি শোনান আবদুল জলিল। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, *মানুষ এখন কোনো নিয়ম মানতে পারছে না। অভাবের তাড়নায় আষাঢ়-শ্রাবণ মাসেও দরিয়ায় নামতে বাধ্য হয় মানুষ। অশান্ত দরিয়ায় তাই অনেকে জান হারায়। গাজী-কালুরও একটা নিয়ম আছে, আমরা সেই নিয়ম মেনেই চলার চেষ্টা করি।* আবদুল জলিল দরিয়া নিয়ে এ ধরনের কাহিনি সমুদ্রগামী জেলেদের আড্ডাতেই শুনে শুনে বড় হয়েছেন।

১২. সমদ্রের পানি লবণ উৎপাদনের জমিনে রোদের তাপে শুকিয়ে লবণ তৈরির ধাপে যখন প্রথম দানাদার লবণ তৈরি হতে থাকে সেই দানাকে স্থানীয়ভাবে বলে 'লবণ ফুল'। এই অংশটুকু তৈরি করা হয়েছে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের লবণচাষিদের গ্রামে দলগত আলোচনা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। এতে অংশ নিয়েছেন : মো. মোস্তাফিজ (৭০), লবণচাষি, মা-আলমাছ খাতুন, বাবা-আলা মিয়া, বদরুদ্দিনপাড়া, রাজাখালী ইউনিয়ন, পেকুয়া, কক্সবাজার; নূর আলম (৭৫), লবণচাষি, মা-রসিদা খাতুন, বাবা-আমির হামজা, রাজাখালী, পেকুয়া, কক্সবাজার; মোস্তাক (৫৬), লবণচাষি, মা-হাজেরা খাতুন, বাবা-কালা মিয়া, রাজাখালী, পেকুয়া, কক্সবাজার; রাসেল (১০), লবণ পরিবহনকারী শ্রমিক, মা-খজিদা বেগম, বাবা-সৈয়দ নূর, রাজাখালী, পেকুয়া, কক্সবাজার; ফিরোজ আহমেদ (৮০), লবণচাষি, মা-মোবারেকা, বাবা-মতিয়ার রহমান, হায়দারঘোনা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম; সুলতান আহমেদ (৭০), লবণচাষি, মা-রওশন আরা, বাবা-মখলেছুর রহমান, ছনুয়া, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

১৩. খান, শরীফুজ্জামান আগা। ২০০৫, লবণচাষি সম্প্রদায়, প্রগতিশীল নাগরিক সমাজ, ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ, পৃ. ৬২

১৪. ১৯২৫ সালে ধীরাজ ভট্টাচার্য কক্সবাজারের টেকনাফের সহকারী দারোগা ছিলেন, সেই স্মৃতি নিয়ে লিখেছেন *যখন পুলিশ ছিলাম*। সেই বইতে আছে মাত্র ৪ সের লবণ পাওয়া গিয়েছিল বলে এক প্রবীণ নারী ও ২০ সের লবণের জন্য এক পুরুষকে আটক করে সরকার।

১৫. দেখুন : ছৈয়দ আহমেদুল হক, ১৯৯০, 'শিল্প ও বাণিজ্য,' লেখাটি *কক্সবাজারের ইতিহাস* শীর্ষক পুস্তকে প্রকাশিত, কক্সবাজার ফাউন্ডেশন, পৃ. ১৬৬-১৭৭

১৬. ল্যাটিন শব্দ salarium থেকে salary শব্দটি এসেছে। স্যালারিয়াম মানে লবণ যা মুদ্রা বা মজুরি হিসেবে ব্যবহৃত। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনির উদ্ধৃতি দিয়ে এটি লিখেছে উইকিপিডিয়া। দেখুন : http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/31*.html

১৭. শরীফুজ্জামান আগা খান, ২০০৫, *লবণচাষি সম্প্রদায়*, প্রগতিশীল নাগরিক সমাজ, ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ, পৃ. ৫১

১৮. মো. সিরাজ মিয়া (৫৬), সমুদ্রগামী জেলে (আগে ছিলেন কৃষক), মা-লালমতি, বাবা-ওমর হামজা, মাঝেরপাড়া, শাহপরীর দ্বীপ, সাবারাং ইউনিয়ন, টেকনাফ, কক্সবাজার।

১৯. আলাপের এ অংশটুকু *বাংলাদেশের রাখাইন সম্প্রদায় : ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনধারা* শীর্ষক পুস্তকের কাছে ঋণ স্বীকার করছে। এটি লিখেছেন মং বা অং (মং বা), প্রকাশ করেছেন লেখক নিজেই, প্রকাশকাল-২৫৪৭ বুদ্ধাব্দ (২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ), কক্সবাজার।

২০. দেখুন : *দৈনিক কক্সবাজার*, ১৮ আগস্ট ২০০০, কক্সবাজার।

আঞ্চলিক সহযোগিতা

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী অববাহিকায় বাঁধ নির্মাণ প্রতিযোগিতা এবং পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ

মোহাম্মদ আতিক রহমান

সারসংক্ষেপ

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী অববাহিকা প্রায় ১.৭ মিলিয়ন কিলোমিটার জায়গাজুড়ে বিস্তৃত; যেখানে চীন, ভারত, নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের মিলিয়ন জনসংখ্যার বাস। এই তিন নদী এই পাঁচ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিল্পায়ন, কৃষি-বাণিজ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। দক্ষিণ এশিয়ার এই অঞ্চলে বিশ্বের মোট দরিদ্রের ৪০ শতাংশের বসবাস। বর্তমানে রাষ্ট্রগুলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দ্রুত শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে পানিসম্পদের ওপর অব্যাহত চাপ মোকাবিলা করছে। আর এই চাপ মোকাবিলায় এই নদী অববাহিকায় রাষ্ট্রসমূহ গড়ে তুলছে বিশালকার বাঁধ/ড্যাম। বাঁধ তৈরির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো, সেচের জন্য পানি সরবরাহ, শুষ্ক মৌসুমে পানি সংরক্ষণ করা ইত্যাদি। যদিও গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী অববাহিকার রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে এখনো তেমন কার্যকর আন্তসীমানা নদীর পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত চুক্তি ও আঞ্চলিক অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি। এ অবস্থায় অব্যাহত বাঁধ নির্মাণ পরস্পরের মধ্যে তৈরি করছে সন্দেহ ও অবিশ্বাস। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই নদী অববাহিকায় বাঁধ নির্মাণ প্রতিযোগিতা কীভাবে আন্তসীমানা নদীর পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনাকে সংকটে ফেলছে তা এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়। এখানে বাঁধ নির্মাণ কীভাবে আন্তসীমানা নদীর পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার তিনটি মূলনীতি যথা : পানির সমতাভিত্তিক ও যৌক্তিক ব্যবহার, পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো নির্মাণ ও দায়িত্ব পালনের মানসিকতা, সংকট ও দণ্ড নিরসন-কাঠামোর প্রতি হুমকি সৃষ্টি করছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

নদী, দক্ষিণ এশিয়া, পানিসম্পদ, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, বাংলাদেশ, বাঁধ, পানি ও রাজনীতি।

ভূমিকা

দক্ষিণ এশিয়ার বিশাল ও সুগভীর নদীসমূহ বিশ্বের কাছে অতিপরিচিত। হিমালয় থেকে উৎপন্ন এসব নদী বঙ্গোপসাগরের মাঝ থেকে দক্ষিণ এশিয়ার সৃষ্টিতে হাজার হাজার বছর ধরে পলিমাটি সরবরাহ করে আসছে। এই নদীগুলোর দুই পারে গড়ে উঠেছে বহু সভ্যতা, নগররাষ্ট্র আর জনবসতি। দক্ষিণ এশিয়ার নদীগুলোর মধ্যে অন্যতম তিন নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকায় পৃথিবীর বৃহত্তর জনবসতি গড়ে উঠেছে, যা আজকের আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রগুলো দ্বারা পরিচিত। আয়তনের দিক থেকে বিশ্বে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার অবস্থান তৃতীয়, যা আমাজন ও কঙ্গো নদী অববাহিকার পরে অবস্থান করছে।[১] এই অববাহিকার অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচটি রাষ্ট্র যথা : ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও চীনের মধ্যে, যা এই দেশগুলোর বিলিয়ন জনগোষ্ঠীর জীবন ধারণ ও জীবিকার ব্যবস্থা করেছে। সেচের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করে হাজার হাজার জমিকে আবাদি করেছে।[২] যদিও ক্রমাগত জনসংখ্যার চাপ ও চাহিদা মোকাবিলা, শিল্পকারখানার বিকাশ, বিদ্যুৎ উৎপাদনে এর ব্যাপক চাহিদা এই নদী অববাহিকার পানিসম্পদের ওপর ক্রমান্বয়ে চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। প্রকৃতির এই সম্পদ পানি এখন হয়ে গেছে প্রতিযোগিতামূলক পণ্য, যা রাষ্ট্রগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তাদের নিজ নিজ ভূখণ্ডে গড়ে তুলছে বিশাল বাঁধ, ড্যাম ও জলাধার। প্রাকৃতিক সম্পদ এই পানির ওপর রাষ্ট্রগুলোর অধিক নিয়ন্ত্রণ প্রকারান্তরে তাদের ভেতর তৈরি করছে পারস্পরিক অবিশ্বাস আর আস্থাহীনতা। রাষ্ট্রগুলোর নদীর পানিতে অধিকার, এর ব্যবহার এবং অভিগম্যতা বিষয়ে দেশগুলোর মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে মতানৈক্য। চালেনির ভাষায়, বর্তমানে আন্তর্জাতিক নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ আন্তরাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বের অন্যতম উৎস।[৩] তাঁর মতে, এশিয়ায় বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বাঁধ রয়েছে, যার সঙ্গে আরও বেশ কিছু নির্মাণাধীন বাঁধ আগামী কয়েক বছরে যোগ হবে। দক্ষিণ এশিয়ার গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকায় আরও কিছু বাঁধ যুক্ত হবে। সম্প্রতি চীন তিব্বতের জাংবো নদীতে ৫১০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন 'জাংবো মেগা ড্যাম' চালু করেছে। জাংবো নদীটি প্রায় তিব্বতের ভেতর দিয়ে ১৬২৫ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে ভারতের অরুণাচল প্রদেশে সিয়াং নাম ধারণ করেছে। অরুণাচলে নদীটি দুটি ধারায় যথাক্রমে ডিবাং ও লোহিত নামে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণ করে প্রবাহিত হয়েছে।

রাষ্ট্রগুলো কেন বাঁধ নির্মাণে আগ্রহী? এর কারণ অনেক। যার মধ্যে কৃষির জন্য সেচকার্য, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সুপেয় পানি সরবরাহ, কলকারখানায় পানি সরবরাহ এবং জলজ সম্পদ আহরণ করা। বাঁধ নির্মাণে এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো

পশ্চিমা দেশগুলোকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। চীনের ইয়াংটজি নদীর ওপর নির্মিত থ্রি গর্জেস বাঁধ ১.৪ কিলোমিটার লম্বা ও ৬০৭ ফুট উঁচু, যা যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো নদীর ওপর নির্মিত হোভার ড্যাম থেকে ৫ গুণ বড়।

কিন্তু বাঁধ নির্মাণের ফলে রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠীকে যেমন কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তেমনি অভিন্ন নদীর ওপর নির্ভরশীল পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের জনগণকেও এর ফল ভোগ করতে হয়। ১৯৫০ থেকে ২০০০ পর্যন্ত সময়কালে চীনে বাঁধ নির্মাণের ফলে ১২ মিলিয়ন মানুষ স্থানচ্যুত হয়েছে।[৪] ভারতে বাঁধ নির্মাণের ফলে স্থানচ্যুতির সংখ্যা প্রায় ৪০ মিলিয়ন।[৫] বাঁধ নির্মাণের ফলে জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক, পারিবারিক, সামাজিক যোগাযোগ ও প্রকৃতির ক্ষতির হিসাব ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও বাঁধ নির্মাণের প্রতিযোগিতা অব্যাহত আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তনদী পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি নির্মোহ আলোচনার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধের পরবর্তী অধ্যায়গুলোকে সাজানো হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তসীমানা নদীর পানি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম, যা পানিকে বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক পণ্য থেকে গণপণ্যে রূপান্তর করবে। রাজনৈতিক-অর্থনীতির দিক দিয়ে গণপণ্যের সংজ্ঞায় বলা হচ্ছে যে এই পণ্য সবার জন্য উন্মুক্ত, এর ব্যবহার সবাই করতে পারে এবং এই পণ্যের প্রতি অভিগম্যতার জন্য কাউকে বাধা দেওয়া যাবে না। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার পানিসম্পদের সঠিক ব্যবহারের জন্য অববাহিকায় অবস্থিত রাষ্ট্রগুলোর সমন্বিত ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন, যাতে এর সুফল সবাই ভোগ করতে পারে। এবং এক রাষ্ট্রের পানি ব্যবহারে অন্য রাষ্ট্র যেন ক্ষতির শিকার না হয় এটাই আন্তসীমানা নদীর পানিসম্পদ পানি ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য। যদিও এই অববাহিকার পানি রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকার, নাকি গণপণ্য তা নিয়ে মতবিরোধ আছে। কিন্তু একটা বিষয় উল্লেখ না করলেই নয় যে, দক্ষিণ এশিয়ার জনগণ ইতিমধ্যে পানির সংকট মোকাবিলা করছে। পানিসম্পদের অব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিকভাবে ক্ষতিকর অবকাঠামো নির্মাণ, মাত্রাতিরিক্ত দূষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব ও রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের ঘাটতি এই অঞ্চলের পানিসংকটকে আরও তীব্রতর করবে।[৬] এই অববাহিকায় প্রায় ৬৩০ মিলিয়ন মানুষের বসবাস। সুতরাং বাঁধ নির্মাণ প্রতিযোগিতা তাদের জন্য আর্থসামাজিক ও পারিবারিক ঝুঁকি সৃষ্টি করবে। এই উদ্ভূত সংকটকে মাথায় রেখে এই প্রবন্ধকে তিনটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশে আন্তসীমানা নদীর পানি ব্যবস্থাপনা ও আন্তরাষ্ট্রীয় নদীর পানি বণ্টন ও ব্যবহারকেন্দ্রিক সংঘাতের মধ্যে তাত্ত্বিক যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। এই অংশে কিছু বৈশ্বিক উদাহরণ আনা হয়েছে নদীর পানিকেন্দ্রিক সংঘাতের পক্ষে।

দ্বিতীয় অংশে এই অববাহিকায় বাঁধ নির্মাণ প্রতিযোগিতা কীভাবে আন্তনদী পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনাকে সংকটে ফেলছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে সন্নিবেশ করা হয়েছে কিছু সুপারিশ।

আন্তসীমানা নদীর পানি ব্যবস্থাপনা এবং পানিকেন্দ্রিক সংকট ও সংঘাতের মধ্যে তাত্ত্বিক যোগসূত্র

অ্যানা স্যুলজ-এর মতে, পানি প্রকৃতির সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, যা মানুষের জীবন ও জীবিকার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু এই পানি নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয় যখন এই সম্পদ বণ্টনব্যবস্থা কার্যকর, টেকসই ও সবার জন্য সুবিধাজনক না হয়।[৭] গত কয়েক দশকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রগুলো প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করেছে। এই প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রমত্তা নদীর ওপর বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা করেছে। এর ফলে রাষ্ট্র বিপুল পরিমাণে অর্থ ও প্রযুক্তি ব্যবহার করছে আন্তনদীর পানিসম্পদ আহরণের জন্য।[৮] পৃথিবীতে যেসব নদী একাধিক রাষ্ট্রের সীমানার অভ্যন্তরে প্রবহমান তাদের আন্তর্জাতিক নদী বলা হয়ে থাকে। 'অ্যাটলাস অব দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেসওয়াটার অ্যাগ্রিমেন্ট'-এর মতে, পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি বড় নদী এক বা একাধিক রাষ্ট্রের ভেতর দিয়ে প্রবহমান।[৯] যার মধ্যে কঙ্গো, নাইজার, নাইল, রাইন ও জাম্বেজি নদীগুলো প্রবাহিত হয়েছে ৯ বা এর অধিক রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে আমাজন, ওরাল সাগর, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা, জর্ডান, মেকং, নেমান, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস-শাতিল আরব ও ভলগা নদীগুলো প্রবাহিত হয়েছে কমপক্ষে পাঁচটি দেশের মধ্য দিয়ে।[১০] যদিও এসব নদীর পানির ব্যবহার নিয়ে রয়েছে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিবাদ ও দ্বন্দ্ব। পৃথিবীতে প্রায় ২৬৩টি আন্তসীমানা নদী অববাহিকা রয়েছে, যা একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত। আর তাই রাষ্ট্রগুলো সর্বদা বিভিন্ন কূটনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত থাকে এই অপ্রতুল ও অপরিহার্য সম্পদ আহরণের জন্য।[১১] আন্তসীমানা নদীর পানিকেন্দ্রিক সংকট এবং সংঘাত সাধারণত সৃষ্টি হয় যখন নদীর পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনাকেন্দ্রিক কোনো প্রকার চুক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং কর্তৃপক্ষ কার্যকর থাকে না। যার ফলে নদীকেন্দ্রিক অববাহিকা রাষ্ট্রগুলোর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের দ্বারা নদীর পানিপ্রবাহের ব্যাপক পরিবর্তনকে যথাযথভাবে আমলে আনা সম্ভব হয় না। ফলে অববাহিকা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পরস্পরের উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আন্তনদীর ওপর নির্মিত বাঁধ, ব্যারাজ, আন্তনদী প্রকল্প নদীর পানিপ্রবাহের ওপর স্থায়ী পরিবর্তন সাধন করে। নদী অববাহিকা রাষ্ট্রগুলো এই পরিবর্তনের কুফল ভোগ করে। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নদীশাসন চুক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এই কুফলের মাত্রা কমাতে পারে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে। এই

সহযোগিতামূলক নদী অবকাঠামোগত প্রতিষ্ঠান উজানে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলোকে একতরফা নদীর পানি প্রত্যাহার করতে নিরুৎসাহিত করে। অন্যথায় একতরফা অবকাঠামো নির্মাণ ও পানি প্রত্যাহার চলতেই থাকে। এতে করে অববাহিকা অঞ্চলে পানিকেন্দ্রিক সংকট সৃষ্টি হতে পারে। পানি সরবরাহের ঘাটতি একটি দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্যও হুমকি। বর্তমানে শিল্প ও কৃষি খাতে ব্যাপক পানির চাহিদা বাড়ছে। কোনো কারণে সেই পানির ঘাটতি হলে দেশের শিল্প ও কৃষি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যাতে করে বেকারত্ব, মহামারি, খাদ্যসংকট ও কোন্দলের সৃষ্টি হতে পারে। এই বিষয়টি উপলব্ধি করে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান বলেছিলেন, 'পৃথিবীতে সুপেয় পানি নিয়ে চলমান ভয়াবহ প্রতিযোগিতা ভবিষ্যতে সংকট ও যুদ্ধের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াবে'।[১২] দ্বন্দ্ব-এর ইংরেজি rival শব্দটি এসেছে লাতিন (rivus) থেকে, যার অর্থ পানির ধারা, যা অনেকে ব্যবহার করে থাকে।[১৩] আন্তর্জাতিক নদীর পানি নিয়ে দ্বন্দ্ব সাধারণত কূটনৈতিক পর্যায়ে শুরু হয় অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের মাধ্যমে। এসব অভিযোগের সঠিক তদন্ত ও সমাধানের উদ্যোগ না নিলে পরবর্তী সময়ে তা স্থায়ী সংঘাতে রূপ নেয়। অনেক সময় এসব দ্বন্দ্বের কারণে রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে। উদাহরণস্বরূপ জর্ডান নদীর পানিবণ্টনকে কেন্দ্র করে ইসরায়েল, জর্ডান, লেবানন, সিরিয়া এবং পশ্চিম তীরের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে আসছে। ১৯২০ সাল থেকে মিসর ও সুদান নীল নদের পানি ব্যবহার করে আসছে। বর্তমানে ইথিওপিয়া নীল নদের ওপর বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যা মিসর ও সুদান বিরোধিতা করেছে। ১৯৫০-এর দশক থেকে দুই কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধাবস্থা চলে আসছে। ১৯৮০-এর প্রথমভাগে দক্ষিণ কোরিয়া কর্তৃক হান নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ দুই কোরিয়ার মাঝে প্রায় যুদ্ধাবস্থা তৈরি করে।

পানি নিরাপত্তাবিষয়ক আন্তর্জাতিক 'মিনিস্টেরিয়াল ডিক্লারেশন অব দ্য হ্যাগ অন ওয়াটার সিকিউরিটি ইন দ্য টোয়েন্টিফার্স্ট সেঞ্চুরি'-এ 'আন্তসীমানা নদী' শাসন বলতে পানিকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যৌক্তিক উপায়ের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনাকে বোঝানো হয়েছে, যাতে করে নদীর ওপর নির্ভরশীল সব জনগোষ্ঠী, রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠানসহ সকল পক্ষের স্বার্থ রক্ষা হয়।[১৪] পরবর্তী সময়ে 'গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশিপ ডায়ালগ অন ইফেক্টিভ ওয়াটার গভর্নেন্স' আন্তসীমানায় অবস্থিত নদীগুলো ব্যবস্থাপনার জন্য পানি সুশাসনের ওপর একটি ধারণাগত কাঠামো তৈরি করেছে।[১৫] তাদের মতে, পানি ব্যবস্থাপনা শাসন হতে হবে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, দীর্ঘমেয়াদি টেকসই ও সাম্যতার ভিত্তিতে। ১৯৯৭ সালের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত 'কনভেনশন অন দ্য ল অব দ্য নন-নেভিগেশনাল ইউজেস অব ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটারকোর্সেস'[১৬] আন্তসীমানা নদীর পানি ব্যবস্থাপনার জন্য পানি সুশাসনের

তিনটি মূলনীতিকে সমর্থন করে। সেগুলো হলো :

- পানির সমতাভিত্তিক ও যৌক্তিক ব্যবহার।[১৭]
- পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো নির্মাণ ও দায়িত্ব পালনের মানসিকতা।
- সংকট ও দ্বন্দ্ব মোকাবিলায় সকল পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

নদী অববাহিকায় রাষ্ট্রগুলোর জন্য এই বিশেষ তিনটি দায়িত্ব পালনের আহ্বান করা হয়। এদের মধ্যে যৌক্তিক ও সাম্যতার ভিত্তিতে নদীর পানির ব্যবহারকে আন্তসীমানা নদীর পানি সুশাসনের অন্যতম বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তর মেকং নদী অববাহিকায় অবস্থিত রাষ্ট্রগুলো এই নদীর পানি ব্যবস্থাপনায় যে চুক্তিতে উপনীত হয় সেখানে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রগুলো তাদের ভূখণ্ডে এই নদীর পানি যৌক্তিক ও সাম্যতার ভিত্তিতে ব্যবহার করবে। হেলসিংকি রুলে বলা আছে, প্রত্যেক রাষ্ট্র এই মূলনীতি পালন করবে সবার জন্য কল্যাণকর পানি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে।[১৮] এদিক থেকে বলা যায়, আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবস্থাপনা অববাহিকা রাষ্ট্রগুলোর একই সঙ্গে দায়িত্ব ও অধিকার। নিজ প্রয়োজনে নদীর পানি ব্যবহার হচ্ছে রাষ্ট্রগুলোর অধিকার, আর তাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই অধিকার নিশ্চিত করতে গিয়ে অন্য রাষ্ট্রগুলোর অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা এবং পারস্পরিক সাহায্য ও আদান-প্রদানের মাধ্যমে নদী অববাহিকার পানি সম্পদের নিরাপত্তা ও টেকসই উন্নয়ন সাধন, যা পক্ষান্তরে আঞ্চলিক সহযোগিতার একটি অনন্য মাইলফলক।

পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক মূলনীতি অববাহিকায় অবস্থানরত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের অংশের পানিসম্পদের উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছে। পারস্পরিক সহযোগিতার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে, পানিসম্পদ উন্নয়নসংক্রান্ত নিজ নিজ রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের তথ্যের আদান-প্রদান, সম্ভাব্য ক্ষতি ও লাভ-লোকসানের জরিপের ব্যবস্থা, অববাহিকার জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ পানির চাহিদা নিরূপণ, বৃহৎ নির্মাণ যেমন : বাঁধ, ড্যাম, ব্যারেজ প্রভৃতি নির্মাণের সময় আগাম তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা। অববাহিকা রাষ্ট্রগুলোর অবাধ তথ্যপ্রবাহ নদীসংক্রান্ত যেকোনো ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ দূর করতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। 'ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটারকোর্স কনভেনশন'-এর ৮.১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, সহযোগিতামূলক এই মূলনীতিটি রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাস্তবায়ন সম্ভব, যখন তা অনুসরণ করা হয় সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা,

পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে। এভাবে যেকোনো আন্তর্জাতিক নদী অববাহিকার সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব।[১৯]

তৃতীয় ও সর্বশেষ মূলনীতি হচ্ছে, অববাহিকা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব নিরসনে একটি 'দ্বন্দ্ব নিরসন ব্যবস্থা' তৈরি এবং সেই ব্যবস্থা থেকে গৃহীত যেকোনো সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে সবাই মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি ও মানসিকতা। ওয়াটারকোর্স কনভেনশন-এ বলা হয়েছে, 'দ্বন্দ্ব নিরসন ব্যবস্থা'-এর সঙ্গে একটি স্বাধীন তথ্য অনুসন্ধানব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় অববাহিকার রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে, যাতে করে যেকোনো অভিযোগের অনুসন্ধান করা যায় এবং তথ্যের আদান-প্রদান করা যায়।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকায় পানির ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত সুশাসন অত্যন্ত জরুরি। বিশ্বের দুটি বৃহৎ জনবহুল রাষ্ট্র ভারত ও চীনের অবস্থান এই অববাহিকায়। এ ছাড়া এসব নদী নেপাল, বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্য দিয়েও প্রবাহিত হচ্ছে। এই অঞ্চলে যেভাবে দ্রুত হারে বাড়ছে জনসংখ্যা, সেভাবে বাড়ছে নগরায়ণ ও শিল্পায়ন, যা পানির চাহিদা দিনে দিনে বৃদ্ধি করছে। ইতিমধ্যে এই অঞ্চলে মাথাপিছু পানি ব্যবহারের পরিমাণ কমছে। বিভিন্ন রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে ২০৫০ সাল নাগাদ ভারতের জনগোষ্ঠী ১ দশমিক ৬ বিলিয়ন হবে, যাতে করে মাথাপিছু পানির ব্যবহার কমে দাঁড়াবে ১৭৩১ কিউবিক মিটার।[২০] বাংলাদেশে ২০২৫ সাল নাগাদ মাথাপিছু পানির পরিমাণ ৮৪৪৪ থেকে ৭৬৭০ কিউবিক মিটারে দাঁড়াবে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা আরও কমতে থাকবে।[২১] এই অববাহিকার রাষ্ট্রগুলোর এই বর্ধিত চাহিদা মোকাবিলায় একতরফাভাবে এসব নদীর ওপর বিভিন্ন বাঁধ ও স্থাপনা নির্মাণ করে চলেছে, যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ ব্যাহত হচ্ছে। ফলে নদীর ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী নানাভাবে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এই অববাহিকা পৃথিবীর মোট স্থলভাগের ১ ভাগ কিন্তু এই ক্ষুদ্র অংশে পৃথিবীর মোট জনগোষ্ঠীর ১০ ভাগ মানুষ বসবাস করে। ফলে এই অঞ্চল অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এবং এ কারণে নদীর স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ কোনো অঞ্চলে ব্যাহত হলে তা বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য হুমকি হয়ে ওঠে। এই অঞ্চলে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দরিদ্র লোকের বাস। সুতরাং তাদের জন্য পরিবেশগত হুমকি মোকাবিলা, নতুন জীবিকার সন্ধান ও নতুন আবাসস্থল নির্মাণ কষ্টসাধ্য। ডেভিড মাইকেল এবং অমিত পান্ডে তাঁদের *ট্রাবলড ওয়াটার-ক্লাইমেট চেঞ্জ, হাইড্রো পলিটিকস অ্যান্ড ট্রান্সবাউন্ডারি রিসোর্স* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে দক্ষিণ এশিয়া ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল এবং এর অধিকাংশ জনগোষ্ঠী নদী অববাহিকায় বসবাস করে।[২২] তারা আরও বলে, দক্ষিণ এশিয়ার পানি 'খুব কম আবার খুব বেশি' এই গোলকধাঁধায় আটকে আছে। অর্থাৎ যখন পানির প্রয়োজন

তখন তা অপ্রতুল, আবার যখন প্রাকৃতিক উপায়ে (যেমন বৃষ্টি) পানির সরবরাহ প্রচুর তখন প্রয়োজনের তুলনায় নদীতেও প্রচুর পানি থাকে। এবং এটা সম্ভব হয়েছে, পানিসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে পারস্পরিক সমঝোতা, আদান-প্রদান ও ব্যবস্থাপনার অভাবে। তাই প্রতিবছর অববাহিকার নিম্নাঞ্চলে আকস্মিক বন্যা হয়ে থাকে। তারা এই পরিস্থিতি উত্তরণের জন্য আন্তনদী পানি ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেয়। এই নদী অববাহিকায় দুটি জনবহুল ও দ্রুত উন্নয়নকামী রাষ্ট্রের অবস্থান, যাদের ভবিষ্যৎ পানির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। তবে ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক দিয়ে চীন যেকোনো রাষ্ট্র থেকে সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। Pomeranz-এর মতে, চীন অববাহিকার উজানে অবস্থান করার কারণে হিমালয়ের তিব্বত থেকে উৎপন্ন ইয়াংটজি, মেকং, ব্রহ্মপুত্র, ইন্দুজ নদীগুলোর জলরাশি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। চীনের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তার বিদ্যুতের চাহিদা। চীনের জন্য জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের রয়েছে ব্যাপক সম্ভাবনা। চীনে নীতিনির্ধারকেরা ইন্দুজ, সুটলেজ, ব্রহ্মপুত্র, সালওয়েন, ইরাবতীসহ মেকং নদীতে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করেছেন। তাই Pomeranz আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে সমীক্ষা না করে যেকোনো ধরনের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ভাটির দেশে যেমন বাংলাদেশ ও ভারতের জন্য পানি সরবরাহে ঘাটতি সৃষ্টি করবে।[২৩] তাই পানি সুশাসনের জন্য পর্যাপ্ত কাঠামো ও ব্যবস্থাপনার মূলনীতিগুলো এই অববাহিকায় তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এই অঞ্চলে পানির ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে রাষ্ট্রগুলোর মর্জির ওপর। এখন পর্যন্ত এই অববাহিকায় শতাধিক ব্যারাজ, ড্যাম, বাঁধ, জলাধার নির্মিত হয়েছে, যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী অংশে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার ওপর অব্যাহত বাঁধ নির্মাণ প্রতিযোগিতা আন্তনদী পানি ব্যবস্থাপনার ওপর কীরূপ বিরূপ প্রভাব ফেলছে, তা আলোচনা করা হলো।

একনজরে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী অববাহিকা

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীসমূহ দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম নদী অববাহিকা গড়ে তুলেছে। দক্ষিণ এশিয়ার বিস্তীর্ণ উর্বর ভূমি গঠনে এই অববাহিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে হাজার বছর ধরে। বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবন গড়ে ওঠার পেছনে রয়েছে এই অববাহিকার অবদান। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী অববাহিকা এশিয়ার ১.৭ মিলিয়ন কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত, যার শাখা-প্রশাখা বিশ্বের দুটি জনবহুল ও দ্রুত উন্নয়নকামী রাষ্ট্র যথা চীন ও ভারতে প্রবাহিত হয়েছে। এ ছাড়া এই অববাহিকা নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশে

বিস্তৃত। নিচের টেবিলে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী অববাহিকাগুলোর প্রধান নদী ও তাদের অববাহিকা এলাকাসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো :

সারণি-১ : গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার নদীসমূহ :

নদী	আয়তন (কিলোমিটার)	অববাহিকার দেশসমূহ	অববাহিকার দেশসমূহে নদীর আয়তন (শতকরা)
গঙ্গা	১০৮৭৩০০	ভারত	৭৯
		চীন	৩
		নেপাল	১৪
		বাংলাদেশ	৪
		ভুটান	
ব্রহ্মপুত্র	৫৪৩৪০০	ভারত	৩৬
		চীন	৫২
		নেপাল	---
		বাংলাদেশ	৭
		ভুটান	৭
মেঘনা	৮২০০০	ভারত	৫৭
		চীন	---
		নেপাল	---
		বাংলাদেশ	৪৩
		ভুটান	---
মোট	১৭১২৭০০	ভারত	৬৪
		চীন	১৮
		নেপাল	৮
		বাংলাদেশ	৭
		ভুটান	৩

সূত্র : http://www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/gbm/index.stm

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদ হিমালয় থেকে উৎপন্ন। গঙ্গা হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। ভারত এই নদীর অসংখ্য শাখা-উপশাখা সৃষ্টি করেছে। ভারতের মধ্য দিয়ে গঙ্গা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে

প্রবাহিত হয়ে পদ্মা নাম ধারণ করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। উল্লেখ্য যে পদ্মা বাংলাদেশের অন্যতম নদী। ব্রহ্মপুত্র চীনের অংশে অবস্থিত হিমালয় থেকে উৎপন্ন, যার নাম Yurlung Tsangpo। চীনের তিব্বত অংশের Burang Countyতে অবস্থিত হিমালয়ের Angsi Glacier থেকে উৎপন্ন হয়ে Yarlung Tsangpo Grand Canyon-এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এই নদী অরুণাচল প্রদেশ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। ভারতে এই নদীর নাম Dihang অথবা Siang। অরুণাচল প্রদেশ থেকে এই নদী দক্ষিণ-পশ্চিমে মোড় নিয়ে আসাম ভ্যালি দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মপুত্র নামে বাংলাদেশের উত্তর সীমানা দিয়ে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশে এই নদী থেকে উৎপন্ন বৃহৎ নদীর নাম যমুনা। তিব্বত মালভূমি থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মপুত্র পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থানকারী নদী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিব্বত মালভূমিতে গড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪,০০০ মিটার উঁচু দিয়ে ২০৫৭ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে এই নদী ভারত ও শেষে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। অন্যদিকে মেঘনা ভারতের পূর্বে বরাক পাহাড় থেকে উৎপন্ন। সেখান থেকে এই নদী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। মেঘনা, যমুনা ও পদ্মার মিলিত প্রবাহ বাংলাদেশকে বিধৌত করে বঙ্গোপসাগরে বিলীন হয়েছে। বাংলা বদ্বীপ গঠনে এই তিন নদীর ভূমিকা অপরিসীম।

চিত্র-১ : গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী অববাহিকার ভৌগোলিক অবস্থান



উৎস : https://www.google.be/search?q=Map+of+GBM+Basin&biw

জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে এই অববাহিকা অন্যতম। প্রায় ৬৩০ মিলিয়ন মানুষের বসবাস, যা গোটা আফ্রিকার দুই-তৃতীয়াংশের সমান। কিন্তু আয়তনের

দিক দিয়ে আফ্রিকা থেকে ১৮ ভাগের মাত্র ১ ভাগ। গোটা বিশ্বের জনসংখ্যার চার ভাগের এক ভাগ এই অঞ্চলে বসবাস করে অথচ সারা বিশ্বের মাত্র ৪ ভাগ জলজ সম্পদ এই অববাহিকায় বিদ্যমান। যার ফলে বিপুল জনসংখ্যার চাপ মোকাবিলা করতে হয় এই তিন মিলিত জলসম্পদকে। তাই মাথাপিছু পানি ব্যবহারের হার অত্যন্ত কম, যা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আরও বাড়ছে। এ জন্য এই অঞ্চলের দেশগুলোকে তাদের স্যানিটেশন, খাবার পানি, কৃষির জন্য সেচ, শিল্পকারখানার জন্য পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য এই অববাহিকাজুড়ে ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা নিতে হয়েছে। ২০০০ বছর আগে থেকেই এই অববাহিকায় সেচের জন্য খালসংযোগ নির্মাণ ও বন্যা থেকে বাঁচার জন্য বাঁধ নির্মাণ শুরু হয়। ১২ শতকে মোগল শাসকেরা শতাধিক সংযোগ খাল নির্মাণ করে কৃষি খেতে সেচকার্যের ব্যবস্থা করার জন্য। বর্তমানে ৩৫ মিলিয়ন হেক্টর কৃষিজমি এই অববাহিকার পানি সেচকার্যে ব্যবহার করা হয়। ১৯৪০-এর দশক থেকে এই অববাহিকায় বিভিন্ন বাঁধ নির্মাণ শুরু হয় নদীর গতিপথ পরিবর্তন, সেচকার্য ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য। নিম্নে কিছু উল্লেখযোগ্য বাঁধের পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হলো।

সারণি-২ : গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী অববাহিকায় উল্লেখযোগ্য বাঁধসমূহ

দেশ	বাঁধের নাম	নদী	বছর	মূল উদ্দেশ্য
ভুটান	Chhukha	Ti Chu	১৯৮৮	জলবিদ্যুৎ
	Tala-Wankha	Wang (Raidak)	২০০৬	জলবিদ্যুৎ
	Kurichhu	Kuri	২০০২	জলবিদ্যুৎ
	Basochu	Baso Stream	২০০১	জলবিদ্যুৎ
ভারত	Rihand	Rihand	১৯৬২	জলবিদ্যুৎ
	Farakka Barrage	Ganges	১৯৭৪	সেচ ও নদীপ্রবাহ
	Bhimgoda	Ganges	১৯৮৩	জলবিদ্যুৎ
নেপাল	KaliGandaki	Gandaki	২০০২	জলবিদ্যুৎ
	Kosi	Kosi	১৯৫৬	বন্যানিয়ন্ত্রণ
বাংলাদেশ	Manu Barrage	Manu	১৯৯০	সেচ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ
	Tangon Barrage	Tangon	১৯৮৯	সেচ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ
	Teesta Barrage	Teesta	১৯৯৮	সেচ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ

সূত্র : বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত

কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এসবই প্রায় এককভাবে নেওয়া উদ্যোগ, যেখানে পারস্পরিক সহযোগিতার কোনো ব্যবস্থা নেই। যেখানে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম নদী অববাহিকা লাতিন আমেরিকার 'লা প্লাটার' পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য ১৯৬৭ সালেই অববাহিকার রাষ্ট্রসমূহ আলোচনা শুরু করে এবং ১৯৭০ সাল নাগাদ তারা একটি চুক্তিকাঠামো তৈরি করতে সমর্থ হয়। লা প্লাটা দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় ৩ মিলিয়ন কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। এই নদী অববাহিকায় লাতিন আমেরিকার সামরিক ও অর্থনৈতিক দুই পরাশক্তি দেশ আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের অবস্থান। এ ছাড়া এই অববাহিকায় বলিভিয়া, উরুগুয়ে ও প্যারাগুয়ের অবস্থান। এত বিপুল অঞ্চল নিয়ে অবস্থিত এই অববাহিকার জনসংখ্যা গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী অববাহিকা থেকে অনেক কম। ১৯৬০-এর দশকে যখন লাতিন আমেরিকার এই পাঁচটি দেশ তাদের নিজ স্বার্থকে পাশ কাটিয়ে সমগ্র অঞ্চলের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য 'লা প্লাটার' পানিসম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য একটি কাঠামোগত চুক্তির জন্য কাজ করছে তখন তার মোট জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৬১ মিলিয়ন, যা ২০০০ সালে দাঁড়িয়েছে ১৩২ মিলিয়ন।[২৪] পাহাড়ি এলাকা দিয়ে প্রবাহিত লা প্লাটার জলজ বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা অপরিসীম। তাই এই নদীর অববাহিকার পাঁচটি রাষ্ট্র যৌথভাবে বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প হাতে নিয়েছে এই অঞ্চলের বিদ্যুৎ ও সেচ চাহিদা মেটানোর জন্য। এ পর্যন্ত এই নদীর থেকে সম্ভাব্য ৯২,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের প্রায় ৬০ ভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করেছে। ব্রাজিলের মোট ৯০ ভাগ বিদ্যুতের জোগান আসে লা প্লাটা নদী থেকে।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকায় সাম্প্রতিক কালের বাঁধ নির্মাণ প্রতিযোগিতা ও আন্তনদী পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ

আন্তসীমানা নদী বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে, যা ওই সব রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠী ও সরকার ব্যবহার করে থাকে। সুতরাং এই পানিসম্পদ ব্যবহার, প্রয়োজনীয়তা, বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে অবস্থানরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে পানি ব্যবহারের ধরনের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। আন্তনদীর পানি ব্যবস্থাপনা একটি জটিল প্রক্রিয়া, কারণ আন্তসীমানা নদীর পানি শুধু রাষ্ট্রের সীমানাই অতিক্রম করে না, বরং এর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের উন্নয়নভাবনা ও নীতি, আইনি কাঠামো, জননিরাপত্তা, রাজনৈতিক স্বার্থ ও লক্ষ ইত্যাদি। আন্তসীমানা পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি আলোচনা অতীতে হলেও, এর বেশি ব্যবহার দেখা যায় ১৯৭২ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত পরিবেশ ও উন্নয়নবিষয়ক সম্মেলনের পর থেকে। পরবর্তী সময়ে ১৯৯২ সালে রিও সম্মেলন, ১৯৯৮-এ হারারেতে অনুষ্ঠিত 'এক্সপার্ট গ্রুপ মিটিং অন ওয়াটার

রিসোর্সেস অ্যান্ড সাস্টেইনেবল ডেভলপমেন্ট' এবং ১৯৯৮-এ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ কমিশন অন সাস্টেইনেভল ডেভলপমেন্ট-এর মিটিংয়ে আন্তসীমানা নদীর পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য কিছু আন্তর্জাতিক মূলনীতি গ্রহণ করা হয়।[২৫] সেগুলো যথাক্রমে :

১. মূলনীতি এক : আন্তসীমানা নদীর পানি অতিমূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ, যা বেঁচে থাকার জন্য, উন্নয়ন ও পরিবেশের জন্য অতি দরকারি।
২. মূলনীতি দুই : আন্তসীমানা নদীর পানির উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা অবশ্যই হতে হবে অংশগ্রহণমূলক, যা পানি ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী, পানি ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত পরিকল্পনাকারী, নীতিনির্ধারক ও পানি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে হতে হবে।
৩. মূলনীতি তিন : আন্তসীমানা নদীর পানি ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি।
৪. মূলনীতি চার : আন্তসীমানা নদীর পানি অর্থনৈতিকভাবে মূল্যবান এবং এই সম্পদ সবার মাঝে সমান বণ্টনের ব্যবস্থা করা, যাতে সকলে উপকৃত হতে পারে।

ওপরে উল্লেখিত মূলনীতিগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে আন্তসীমানা নদীর পানি ব্যবস্থাপনা এমন একটি প্রক্রিয়া, যা সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পানিসম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা করা। এর সঙ্গে যুক্ত কৃষিজমি, বনাঞ্চল, জলাভূমি ও জলজ সম্পদেরও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন, যাতে করে নদী অববাহিকা অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি হয়। তবে এই ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক ভারসাম্যও বজায় রাখতে হবে এবং দূষণের হাত থেকে নদীকে ও নদীর ওপর নির্ভরশীল মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষা করতে হবে। যদিও বাস্তবে আন্তসীমানা নদীর পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই মূলনীতি সব সময় মেনে চলা হয় না। আর যেখানে কোনো প্রকার ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত চুক্তি ও প্রটোকল নেই সেখানে এই মূলনীতি বাস্তবায়ন করা আরও কষ্টসাধ্য। দক্ষিণ এশিয়ার ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা ও মেঘনা অববাহিকা এই অঞ্চলের ১.৫ বিলিয়ন জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এই অঞ্চলে সমন্বিত আন্তনদী পানি ব্যবস্থাপনার ধারণা অত্যন্ত সীমিত আকারে বাস্তবায়ন হয়েছে, যা মূলত দ্বিপক্ষীয়। কিন্তু অববাহিকার সব রাষ্ট্রের সমন্বয়ে এখনো কোনো প্রকার ব্যবস্থাপনা-কাঠামো গড়ে ওঠেনি। এ জন্য জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি) এবং 'এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি' (এআইটি) কর্তৃক ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত *ফ্রেশওয়াটার আন্ডার থ্রেট : সাউথ এশিয়া* রিপোর্টে বলা হয়েছে যে মাত্রাতিরিক্ত পানিসম্পদের আহরণ ও এর যথেচ্ছ ব্যবহার, পরিবেশগত

পরিবর্তন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার অভাবে পৃথিবীর বড় বড় নদী অববাহিকার জন্য হুমকি সৃষ্টি করছে, যার মধ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকা অন্যতম। এই পরিপ্রেক্ষিতে অববাহিকায় ব্যাপক আকারে ও সংখ্যায় বাঁধ নির্মাণ প্রতিযোগিতা সেই আন্তনদী পানি ব্যবস্থাপনার ধারণা ও এর ভবিষ্যৎ প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে।[২৬]

এশিয়া তথা দক্ষিণ এশিয়ায় যে হারে বাঁধ নির্মাণ চলছে তাতে অনেকে এই প্রতিযোগিতাকে স্নায়ুযুদ্ধের সময়ে অস্ত্র প্রতিযোগিতার সঙ্গে তুলনা করেছে। এবং এই প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যে বিশ্বের পরিবেশবাদী, গবেষক, পানি ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত নীতি গবেষক, পরিবেশ রক্ষার নীতিনির্ধারকসহ সাধারণ মানুষের এই অঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার ব্যাপারে উদ্বেগ তৈরি করেছে। দ্রুত উন্নয়নশীল রাষ্ট্র ভারত ও চীনের কাছে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পানিসম্পদ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যদিও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার অভাবে সেই সম্পদ দ্রুত কমে যাচ্ছে বা ব্যবহারের জন্য অনুপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। পানি বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যে এই অঞ্চলকে ওয়াটার স্ট্রেসড হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।[২৭] কারণ বিভিন্ন রাষ্ট্রে শিল্পায়ন ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ পানির জোগানের ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করছে এবং রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ভবিষ্যৎ পানিসংকট মোকাবিলার ভীতি তৈরি করছে। যদিও এই অববাহিকার রাষ্ট্রগুলো তাদের পানি সংরক্ষণের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করছে তা জনসংখ্যার চাহিদা মোকাবিলায় সক্ষম নয়। ফলে পানি ব্যবস্থাপনার জন্য গ্রহণযোগ্য কোনো আঞ্চলিক কাঠামো না থাকায় পরস্পরের প্রতি রয়েছে চরম অবিশ্বাস ও সন্দেহ। তাই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের যেকোনো পানি উন্নয়নমূলক প্রকল্প তথা বাঁধ নির্মাণকে দেখা হচ্ছে চরম অবিশ্বাসের সঙ্গে। এ ছাড়া দ্রুত বর্ধমান জনগণ, কৃষি বিপ্লব, শিল্পায়ন ও ব্যাপক নগরায়ণ ইত্যাদি অববাহিকা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একধরনের চাপ সৃষ্টি করেছে এই সম্পদের ওপর যত বেশি বেশি করে মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা যায় ভবিষ্যতের পানিসংকট মোকাবিলার জন্য। এ ধরনের বাস্তবতায় পরবর্তী অংশে এই নদী অববাহিকায় বর্তমানের বাঁধ নির্মাণ প্রতিযোগিতা ভবিষ্যতে আন্তনদীর পানি ব্যবস্থাপনায় কী ধরনের প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

বাঁধ নির্মাণ প্রতিযোগিতার মুখে সমতাভিত্তিক ও যৌক্তিক উপায়ে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার দেশগুলো সর্বদা তাদের অভ্যন্তরীণ পানির চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয় না। সেদিকে ভারত ও চীনের জন্য তা আরও বেশি প্রকট তাদের ক্রমবর্ধমান জনগণের চাহিদা মোকাবিলার জন্য। আবার শহর ও

গ্রামের মানুষের ভেতর পানি বণ্টনেও রয়েছে বৈষম্য। নিরাপদ পানীয় ও শৌচাগারে গ্রামের মানুষের অভিগম্যতা শহরের মানুষের থেকে অনেক কম। এক হিসাবে দেখা যায়, প্রায় ভারতের ১৪০ মিলিয়ন এবং চীনের ১৪৭ মিলিয়ন মানুষের বিশুদ্ধ খাবার পানি থেকে বঞ্চিত এবং ৮১৫ মিলিয়ন ভারতের ও ৬০০ মিলিয়ন চীনের জনগণ উন্নত শৌচাগার থেকে বঞ্চিত।[২৮] ভারতে বর্তমানে পানির জোগান কমতির দিকে। ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের পানির ঘাটতি ৫০ ভাগে গিয়ে দাঁড়াবে। ভারতে ১২টি বৃহৎ নদ-নদীর নেটওয়ার্ক রয়েছে যার মধ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকা বৃহত্তর। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর থেকে ভারত তার নদ-নদীগুলোতে পানি সংরক্ষণের নানা পদক্ষেপ নিয়েছে, যা বর্তমানে প্রতিবছর ২১২.৭৮ বিলিয়ন কিউবিক মিটার।[২৯] কিন্তু বর্তমান চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে হলে ভারতে অত্যন্ত প্রয়োজন আন্তসীমানা নদীর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, যাতে তাদের ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা পূরণ করা যায়।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকা হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এবং ভৌগোলিক দিক দিয়ে চীন এই অববাহিকার উজানে অবস্থিত। যার ফলে চীন সব সময় এই অববাহিকার পানি ব্যবহারে তুলনামূলক বেশি সুবিধা লাভ করছে। এবং ভারতের মতো চীনেরও পানির চাহিদা দিনে দিনে বাড়ছে। চীনের বিদ্যুৎশক্তির চাহিদা ২০৩৫ সালের মধ্যে ৬০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে।[৩০] চীন তাই আন্তনদীগুলোর ওপর ব্যাপক আকারে বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। এই বাস্তবতায় দেখা যাচ্ছে যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার দুটি বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র তাদের ব্যাপক চাহিদা মেটানোর জন্য একতরফাভাবে নদীর ওপর নানা স্থাপনা তৈরি করছে, যার মধ্যে বাঁধ অন্যতম। এদের বাদ দিলে ভুটান ও নেপালেও দেখা যায় বাঁধ নির্মাণের নানা আয়োজন। নির্মাণাধীন বাঁধ মূলত পানি ধরে রাখার আধার হিসেবে কাজ করবে, যা বন্যার হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রথম পর্যায়ের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। এ ছাড়া বাঁধ নির্মাণের উদ্দেশ্য হচ্ছে নদীর স্বাভাবিক গতিধারা রোধ করে শুষ্ক অঞ্চলে পানি সরবরাহ করা, সেচকার্যের জন্য পানি সংরক্ষণ করা এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা। তবে রাষ্ট্র তাদের বাঁধ নির্মাণ অব্যাহত রাখছে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও যৌথ চাহিদা সমীক্ষা ছাড়াই। ফলে আন্তনদীর পানি সরবরাহ থেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো বঞ্চিত হবে। এর ফলে সমতাভিত্তিক যৌক্তিক উপায়ে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক মূলনীতি গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার পানি ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে মেনে চলা অত্যন্ত দুরূহ বলে প্রতীয়মান। অন্যদিকে ভবিষ্যতে চীনে আরও বেশি বাঁধ নির্মাণ ভারত-চীনের মধ্যে সম্পর্কে অবিশ্বাস ও সন্দেহ সৃষ্টি করবে, যা ব্রহ্মপুত্র নদে বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে। বার্কেফের মতে, চীন 'নর্থ-সাউথ ওয়াটার ট্রান্সফার

প্রজেক্ট' হাতে নিয়েছে যা দেশের অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা, শক্তি ও খাদ্য উৎপাদনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করার সঙ্গে সঙ্গে এই অববাহিকার অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনও সৃষ্টি করবে।[৩১]

বাঁধ নির্মাণ প্রতিযোগিতা আন্তসীমানা নদীর পানি ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতামূলক মূলনীতির পরিপন্থী

আন্তসীমানা নদীর পানি ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতামূলক মূলনীতি বলতে পারস্পরিক তথ্য, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও উন্নয়ন কৌশলের আদান-প্রদানকে বোঝানো হয়ে থাকে। নিদেনপক্ষে রাষ্ট্রগুলো তাদের অংশে গৃহীত পানি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঠিক তথ্য অববাহিকার অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছে সরবরাহ করবে। যদিও ব্রহ্মপুত্র নদে চীনের Yurlung বাঁধ নির্মাণবিষয়ক তথ্যের আদান-প্রদান ভারতসহ অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছে তেমন হয়নি। ১৯৭০ সালে গৃহীত এই প্রকল্প সম্পর্কে চীন খুব কমই সরব থেকেছে। আশির দশকে জাপান একে মেগা-ড্যাম প্রকল্প বলে আখ্যায়িত করে। যদিও এই বাঁধ নির্মাণের পর চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিল্লি ও ঢাকাকে আশ্বস্ত করেছে যে এই বাঁধ এই দুই দেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে না।[৩২] চীন নিকট ভবিষ্যতে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর আরও ২৮টি বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে, যা বিশ্বের বড় হোভার ড্যাম যা ২২১ মিটার উঁচু তার থেকেও বড় হবে উচ্চতা ও আয়তনে। ২০০৮ সালে চীন তার বিখ্যাত থ্রি গর্জেস বাঁধ ইয়াংটজি নদীর ওপর নির্মাণ শেষ করে, যা হোভার ড্যামের তুলনায় ১০ গুণ বেশি জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারে। ১৯৫০-এর দশক থেকে চীন প্রায় ২২ হাজার ড্যাম নির্মাণ করেছে, যাদের উচ্চতা ১৫ মিটারের বেশি। ২০২০ সাল নাগাদ চীন তার জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ১২০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হবে।[৩৩] সম্প্রতি চীনের 'নর্থ-সাউথ ওয়াটার ট্রান্সফার প্রজেক্ট' চীনের চারটি নদী যথা Yangtze, Yellow, Huaithe and Haihe-এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে তিনটি সংযোগ ক্যানালের মাধ্যমে চীনের মধ্য, পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে পানি সরবরাহ করবে। অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করছে যে এই প্রজেক্ট আন্তসীমানা নদীর পানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটাবে। চীনে এসব বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার Mekong, Nu যাকে মিয়ানমারে Salween বলে ও Yarlung Tsangpo, যাকে ভারতে ও বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্র নামে ডাকা হয়, এই নদীগুলোর পানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটাবে। তিব্বত মালভূমি থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মপুত্র নদ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উঁচু নদী, যার গড় উচ্চতা ৪০০০ মিটার। এই নদীর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন ক্ষমতা ব্যাপক তিব্বত অঞ্চলে। একে মাথায় রেখে চীন ইতিমধ্যে জাংমু জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করেছে, যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৩০০ মিটার উঁচু। আগামী কয়েক বছরে এর নির্মাণকাজ শেষ হলে এর উচ্চতা

গিয়ে দাঁড়াবে ৩৮১ ফুট বা ১১৬ মিটারে।[৩৪] এই ব্রহ্মপুত্র নদ তিব্বত থেকে প্রসারিত শতাধিক শাখা-উপশাখায় বিভক্ত হয়ে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। চীনের এই বাঁধ স্বাভাবিকভাবেই এসব অঞ্চলে পানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটাবে বলে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। পানি সরবরাহে বিঘ্ন হলে তা নদীর জলজ সম্পদের ওপরও বিরূপ প্রভাব ফেলবে। সঙ্গে সঙ্গে নদীর তীরে বসবাসরত বিশাল জনগোষ্ঠীর ওপরও মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। বাঁধ নির্মাণ-প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও সহযোগিতার অভাব এই অববাহিকা অঞ্চলে একধরনের ডমিনো অ্যাফেক্ট সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ অন্যান্য রাষ্ট্রও তাদের দেশের সীমানায় ব্যাপক হারে বাঁধ নির্মাণ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ ব্রহ্মপুত্র নদের উপশাখা ডিবাং নদীর ওপর ভারতের ৩০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের কথা বলা যায়। এর ফলে ব্রহ্মপুত্র নদের পানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটবে। ডিবাং ছাড়াও আসাম ও অরুণাচল অঞ্চলে আরও ১৬৮টি বাঁধ নির্মাণের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে, যা সম্পন্ন হলে ভারত ৫৭ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারবে।[৩৫] এ কারণে 'উত্তর-পূর্ব ভারত'কে ভারতের ভবিষ্যৎ শক্তির উৎস বলা হয়ে থাকে।

বাঁধ নির্মাণ প্রতিযোগিতা এবং আন্তসীমানা নদীর পানি ব্যবস্থাপনায় দ্বন্দ্ব নিরসনব্যবস্থা

ওপরের আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী অববাহিকায় রাষ্ট্রগুলোর একতরফা বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প তাদের ভেতর তৈরি করছে সন্দেহ ও সংঘাতময় পরিস্থিতি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আন্তসীমানা নদীর পানিসম্পদ নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসনে আন্তর্জাতিক পানি আইনে দ্বন্দ্ব নিরসনব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই দ্বন্দ্ব নিরসনব্যবস্থা আন্তনদী পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম মূলনীতি। উল্লেখ্য যে সব কটি আন্তসীমানা নদীর পানি ব্যবস্থাপনায় দ্বন্দ্ব নিরসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছে অববাহিকা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে চুক্তির আলোকে। এবং এসব চুক্তি আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসনব্যবস্থা থেকে গৃহীত যেকোনো সিদ্ধান্ত চুক্তির সদস্যরাষ্ট্রসমূহ মেনে নেয়। অ্যানা স্যুলজ (২০০৭)-এর মতে, অববাহিকা অঞ্চলে পানিসম্পদের সঠিক ব্যবহার, মানুষের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা, কৃষির জন্য সেচকার্যের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য নদীর পানি বণ্টন ও উন্নয়নমূলক চুক্তির প্রয়োজন। এসব চুক্তির মধ্যে নিহিত কিছু মূলনীতি পরবর্তী সময়ে যেকোনো দ্বন্দ্ব নিরসনে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ 'দ্য ডকট্রিন অব অ্যাবসলিউট ইন্টিগ্রিটি'-এর কথা বলা যায়, যেখানে বলা হয়েছে যে সদস্যরাষ্ট্রগুলো কখনোই তার দেশের সীমানার মধ্যে বয়ে চলা নদীর পানির

স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করবে না, হোক না তার অবস্থান নদীর উজান বা ভাটিতে।[৩৬] অন্যদিকে 'দ্য ডকট্রিন অব লিমিটেড টেরিটোরিয়াল সভ্রেনিটি'-এর মতে, রাষ্ট্রগুলো এর দ্বারা সাধারণ নীতিমালা মেনে চলবে যে তাদের সীমানার মধ্যে পানিসম্পদের এমন যথেচ্ছ ব্যবহার করবে না, যা অন্য রাষ্ট্রের পানিসম্পদের ওপর হুমকি সৃষ্টি করে। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় এই দুটি মূলনীতি কোনোটিই মানা হচ্ছে না কোনো প্রকার আন্তসীমানা নদী পানি ব্যবস্থাপনা চুক্তি না থাকার কারণে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার রাষ্ট্রগুলো, বিশেষ করে হারম্যান নীতি দ্য ডকট্রিন অব অ্যাবসলিউট সভ্রেনিটি অনুসরণ করছে। যার অর্থ সর্বময় সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলো তাদের সীমানার আন্তসীমানা নদীর পানিসম্পদের স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এমনকি সর্বউজানে অবস্থানরত রাষ্ট্রগুলোও এই নীতি অনুসরণ করছে। উদাহরণ হিসেবে ভারত ও চীনের গৃহীত বিভিন্ন পানি উন্নয়ন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। শুধু গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকা নয়, চীন তার মেকং ও সালওয়েন নদীতেও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ করছে, যা মেকং নদী অববাহিকার অন্যান্য রাষ্ট্রের জন্য উদ্বেগের বিষয়। মালহোত্রা ও আরোরার মতে, চীন ও ভারত ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন দ্য ল অব নন-নেভিগেশনাল ইউজেস অব ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটারকোর্স'-এ অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে।[৩৭] এর ৫ নম্বর ধারায় বলা আছে, 'a State sharing an international watercourse with other States utilize the watercourse, in its territory, in a manner that is equitable and reasonable vis-à-vis the other States sharing it।[৩৮] কিন্তু এই কনভেনশন এখনো বাস্তবায়ন হয়নি এবং গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার পানি নিয়েও হয়নি কোনো চুক্তি। এমন অবস্থায় অব্যাহত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পগুলো তৈরি করবে পারস্পরিক সন্দেহ। একটা কার্যকর আন্তসীমানা নদীর পানি ব্যবস্থাপনাকাঠামো কেবল পারে নির্মোহ সত্য অনুসন্ধান, ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং অববাহিকা রাষ্ট্রগুলোর কার্যকলাপের ওপর নজরদারির মাধ্যমে জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা তৈরি করতে। এর ফলে উদ্ভূত যেকোনো দ্বন্দ্ব নিরসন করা সম্ভব।

ভবিষ্যৎ করণীয়

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম নদী অববাহিকা, যেখানে বিশ্বের প্রায় ৪০ ভাগ দরিদ্র মানুষের বসবাস। মানব উন্নয়ন এর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক ও জীবনযাত্রার মানের সূচকের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর অবস্থান নিচের দিকে। দ্রুত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এই পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলছে। আবার এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছে শিল্পায়নের। ফলে বিভিন্ন জায়গায়

গড়ে উঠছে শিল্প ও নগর। ১৯৯৫ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালে নগরায়ণের হার ছিল যথাক্রমে ৫.২%, ৩.০% এবং ৬.৫%, যা ইউরোপ (০.৫%), দক্ষিণ আমেরিকা (২.৩%) এবং অস্ট্রেলিয়া (১.২%) থেকে বেশি।[৩৯]

ভারত, বাংলাদেশ ও নেপালের অর্ধেকের বেশি মানুষ ২০২৫ সাল নাগাদ শহরে জীবিকার অন্বেষণে স্থানান্তরিত হবে। অপরিকল্পিত শিল্পকেন্দ্রিক নগরায়ণের চাপ পড়বে পানি, ভূমি, বিদ্যুৎ ইত্যাদির ওপর। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার অবারিত পানির সঠিক ব্যবস্থাপনা ছাড়া এই ধরনের চাপ মোকাবিলা করা কষ্টকর। এই অববাহিকার পানিসম্পদের যথাযথ ও সঠিক ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের মাধ্যমে মিলিয়ন মিলিয়ন হতদরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব। এবং এর জন্য দরকার রাষ্ট্রসমূহের সদিচ্ছা ও পানিসম্পদকে যৌথ মালিকানার সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করার মানসিকতার। পানিসম্পদকে শুধু ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে নিয়ন্ত্রণ না করে এর যথাযথ উন্নয়ন করার মাধ্যমে পুরো অববাহিকা অঞ্চলের মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা ও টেকসই উন্নয়ন সাধন করা। প্রশ্ন আসতে পারে, কীভাবে তা সম্ভব? এক হিসাবে দেখা যায়, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এই তিন নদীর মিলিত পানিপ্রবাহ বছরে ১৩৫০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার, যার অর্ধেক প্রবাহিত হয় ব্রহ্মপুত্র দিয়ে। এই তিন নদীর মিলিত পানিপ্রবাহ পৃথিবীর সম্মিলিত পানিপ্রবাহের তিন গুণ বেশি। সুতরাং এই বিপুল জলরাশির সঠিক ব্যবহার করলে এই অঞ্চলের পানির চাহিদা, সেচকার্য ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যাপক উন্নতি সাধন সম্ভব। এই অববাহিকার প্রায় সব রাষ্ট্রই একটি সমস্যার সম্মুখীন হয় তা হলো বর্ষাকালে ব্যাপক পানিপ্রবাহ আর শুষ্ক মৌসুমে পানির স্বল্পতা। তাই এই খেয়ালি প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।[৪০]

উজানের দেশ চীন ও ভারত ভাবতে পারে, আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক পানিসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে তাদের অংশগ্রহণ স্বার্থের পরিপন্থী। কিন্তু সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা, তথ্যের আদান-প্রদান শুধু ভাটির দেশ যেমন বাংলাদেশ, ভুটান বা নেপালকেই লাভবান করবে না, বরং তা ভারতের উত্তর, পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারত ও চীনের বিভিন্ন অংশে জলবিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, নৌপথে বাণিজ্য সম্প্রসারণ, সর্বোপরি বন্যা ব্যবস্থাপনা, নদীভাঙন রোধে সহায়ক হবে। দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ তাদের ঘরবাড়ি হারিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয় বন্যা ও নদীভাঙনের কারণে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো এখনো তাদের নিজ স্বার্থ ও পরস্পরের প্রতি সন্দেহ আর অবিশ্বাস থেকে পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একতরফাভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তা যেমন ব্যয় ও কষ্টসাধ্য, আবার স্বল্প আয়ের দেশের পক্ষে

সেগুলো বাস্তবায়ন করা অসম্ভব। যেমন নেপাল মোট সম্ভাব্য জলশক্তির মাত্র ০.৬ ভাগ ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে।[৪১] এ জন্য নেপাল যদি যৌথভাবে অববাহিকা অঞ্চলের অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে জল-বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে সক্ষম হয়, তাহলে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎশক্তি নেপাল ভারত, বাংলাদেশ ও ভুটানে সরবরাহ করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে ভুটানের মধ্যে বয়ে চলা Kuri Chu নদীর ওপর ভারত ও ভুটান যৌথভাবে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তুলেছে ১৯৯৩ সাল থেকে। এ ছাড়া ভুটানের Sunkosh নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ বিষয়ে ১৯৯৩ সালে চুক্তিতে উপনীত হয়। এই বাঁধ নির্মাণ করা শেষ হলে উভয় রাষ্ট্রই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুফল লাভ করবে। Kosi নদীর পানি ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে ভারত ও নেপাল ১৯৫৪ সাল থেকে যৌথ নদী কমিশন গঠন করেছে। এ ছাড়া নেপাল ও ভারত Chandra Canal, Western Kosi Canalগুলোর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য যৌথভাবে কাজ করছে। ১৯৯৬ সালে ভারত ও বাংলাদেশ গঙ্গা পানিচুক্তি সম্পাদন করে, যা এই উপমহাদেশে ভারত ও নেপালের মধ্যে ১৯৯৬ সালে সম্পাদিত 'মহাকালি' নদী চুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি চুক্তি বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। লক্ষণীয় যে চুক্তিগুলো সবই দ্বিপক্ষীয় যা গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অপ্রতুল। এই অববাহিকায় অবস্থিত ভারত, চীন, ভুটান, নেপাল ও বাংলাদেশ এই সব রাষ্ট্রেরই যৌথভাবে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে কাজ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন আঞ্চলিক যোগাযোগ ও তথ্যের আদান-প্রদান, দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা, পানিসম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অর্থ ও জ্ঞানের সমন্বয় ও অংশীদারির ভিত্তিতে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা। এ ছাড়া রাজনৈতিক সদিচ্ছার বড় প্রয়োজন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মানুষের জন্য ও সামগ্রিকভাবে আঞ্চলিক পরিবেশ রক্ষার জন্য ক্ষতিকর এমন পানি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকা।

শেষ কথা

বর্তমানে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকায় যে গতিতে বাঁধ নির্মাণ-প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে তা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ভবিষ্যতে আরও দূরত্ব সৃষ্টি করে চলবে। পানিকেন্দ্রিক সংঘাতও সৃষ্টি হতে পারে এ অঞ্চলে। তাই বাঁধ নির্মাণ-প্রক্রিয়াকে অববাহিকার সব রাষ্ট্রের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা দরকার। এই জন্য দরকার আন্তনদী পানি ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক চুক্তি ও আঞ্চলিক কাঠামো, যাতে বাঁধ নির্মাণ-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সদস্যরাষ্ট্রকে সম্পৃক্ত করা যায়। আন্তনদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ নদীর ওপর নির্ভরশীল সব রাষ্ট্রের জন্যই ভবিষ্যৎ পানির সহজলভ্যতাকে হুমকির মুখে ফেলবে। তৈরি করবে হাজার হাজার উদ্বাস্তু, জীবনযাত্রার মান করবে নিম্নগামী। পানিকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব এই অঞ্চলকে করতে পারে অস্থিতিশীল আর তাই পরিশেষে উপমহাদেশের বিখ্যাত মানবতাবাদী সংগীতবিদ (সংগীতজ্ঞ) ভুপেন হাজারিকার একটি গানের চরণ দিয়ে শেষ করতে চাই।

মোরা যাত্রী একই তরণীর, সহযাত্রী একই তরণীর
যদি সংঘাত হয় তবে ধ্বংস হবে গর্ব মোদের প্রগতির

(We're in the same boat brother, we're in the same boat brother. And if you shake one end, / you gonna rock the other / it's the same boat brother.)

তথ্যসূত্র :

১. Chowdhury R. & Ward N, "Hydro-Meteorological variability in the greater Ganges-Brahmaputra-Meghna basins", *International Journal of Climatology*, no: 24, 2004. (Published online in Wiley InterScience, 2004), p-1.

২. Ahmad Q. K., Biswas A. K., Rangachari R, Sainju M. M, *Ganges-Brahmaputra-Meghna Region: A Framework for Sustainable Development*, (the University Press Limited, Dhaka 2001).

৩. Chellaney, B, *From Arms Racing to "Dam Racing" in Asia: How to Contain the Geopolitical Risks of the Dam-Building Competition*. (Translantic Academy Paper Series, 2012) Washington, USA.

৪. Fuggle, R., Smith, W. T., Hydrosult Canada Inc., & Androdev Canada Inc, *Experience with Dams in Water and Energy Resource Development in The People's Republic of China*. Country Review Paper, (published by the World Commission on Dams. Cape Town, South Africa, 2000), P-72.

৫. Taneja, B. & Thakkar, H. *Large Dams and Displacement in India*, (the World Commission on Dams, Cape Town, South Africa, 2000).

৬. Maryam Mastoor, "Environmental Degradation: Focus on Water Scarcity", *South Asia, Regional Studies*, Vol XXVII, 2009, No 1, p-1.

৭. Schulz, A., "Creating a Legal Framework for Good Transboundary Water Governance in the Zambezi river and Incomati River Basins", *Georgetown International Environmental Law Review*, Winter 2007, no. 19, issue. 2, p. 117.

৮. Gleick, P., "Water and Conflict: Fresh Water Resources and International Security", *International Security*, Vol. 18, No. 1, p. 1993, p-84.

৯. Meredith A. G. & Aaron T. W., *The World's International*

Freshwater Agreements (Oregon State University 2000), USA.

১০. Wolf, Aaron T., "Criteria for Equitable Allocations: The Heart of International Water Conflict", *Natural Resources Forum*, Volume 23, Issue 1, 1999, pp. 3-30.

১১. Conca, K. Wu, F., Mei, C., "Global Regime Formaton or Complex Institution Building? The Principle Content of International River Agreements", *International Studies Quarterly, 2006,* Volume 50, Issue 2, pp. 263–285.

১২. A. Carius, GEOFFREY D. and Aaron, T. W. *The United Nations and Environmental Security*, Issue no. 19 (ECSP REPORT 2004), p-1.

১৩. Swain, A. Managing Water Conflict: Asia, Africa and Middle East (NY: Routledge, 2004).

১৪. Ministerial Declaration of The Hague on Water Security in the 21st Century, www.worldwatercouncil.org/fileadmin/world_water_council/documents/world_water_forum_2/The_Hague_Declaration.pdf

১৫. Peter Rogers and Alan W Hall, *Effective Water Governance,* TEC Background Paper No. 7 (Global Water Partnership Technical Committee (TEC) GWP Secretariat 2003), p.15.

১৬. United Nations, *Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses*, UN General Assembly resolution no. 51/229, available at: http://www.un.org/documents/ga/res/51/ares51-229.htm.

১৭. Article-5 on "Factors Relevant to Equitable and Reasonable Utilization and Participation", the United Nations, *Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses*, UN General Assembly resolution no. 51/229, available at: http://www.un.org/documents/ga/res/51/ares51-229.htm.

1. Watercourse States shall in their respective territories utilize an international watercourse in an equitable and reasonable manner. In particular, an international watercourse shall be used and developed by watercourse States with a view to attaining optimal and sustainable utilization thereof and benefits there from, taking into account the interests of the watercourse States concerned, consistent with adequate protection of the watercourse.

2. Watercourse States shall participate in the use, development and protection of an international watercourse in an equitable and reasonable manner. Such participation includes both the right to utilize the watercourse and the duty to cooperate in the protection and development thereof, as provided in the present Convention.

১৮. Salman, M. A. "The Helsinki Rules, the UN Watercourses Convention and the Berlin Rules: Perspectives on International Water Law", *Water Resources Development*, 2007, Vol. 23, No. 4, p.629.

১৯. Article 8 on "General Obligation to Cooperate", the United Nations, *Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses*, UN General Assembly resolution no. 51/229, available at: http://www.un.org/documents/ga/res/51/ares51-229.htm.

1. Watercourse States shall cooperate on the basis of sovereign equality, territorial integrity, mutual benefit and good faith in order to attain optimal utilization and adequate protection of an international watercourse.

2. In determining the manner of such cooperation, watercourse States may consider the establishment of joint mechanisms or commissions, as deemed necessary by them, to facilitate cooperation on relevant measures and procedures in the light of experience gained through cooperation in existing joint mechanisms and commissions in various regions.

২০. Iram, K., Mukhtar, A., & Ahmed, Z., "Water Scarcity in South Asia: A Potential Conflict of Future Decades", *Journal of Political Studies*, Vol. 21, Issue - 1, 2014. P.260.

২১. John, W. *Water security in South Asia: Issues and Policy Recommendations*, (Observer Research foundation, 2011), p.3.

২২. Michael, D., & Pandya, A. *Troubled Waters: Climate Change, Hydropolitics, and Transboundary Resources* (The Henry L. Stimson Center: Washington DC, 2009).

২৩. Pomeranz, K. Asia's Unstable Water Tower: The Politics, Economy and Ecology of Himalayan Water Projects. Asia Policy ((Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press, 2013) pp. 1-50.

২৪. Mugetti, A., et.al. *Global International Waters Assessment Patagonian Shelf* (University of Kalmar, 2004), pp.1-180.

২৫. McIntyre, O., *Improving Transboundary Water Governance through the Application of Integrated Water Resources Management*, The United Nations Enviornment Programme, available at: www.unep.org/environmentalgovernance/.../ENGLISH%20Improving%20Transboundary%20Water%20Governance.html.

২৬. *Freshwater under Threat: South Asia: Vulnerability Assessment of Freshwater Resources to Environmental Change*, United Nations Environment Programme (UNEP) & Asian Institute of

Technology (AIT), 1999.
২৭. Gareth Price et. al. *Attitudes to Water in South Asia*, Chatham House Report (Royal Institute of International Affairs, 2014), p.1.
২৮. Rosenfield J., "Exploring the China-India Relationship: Roundtable Report", CNA China Studies, 2010, p. 8.
২৯. Prakash, A., Sharma, M., & Chourey, J. Water in India: Situation and Prospects. Delhi: UNICEF, 2013.
৩০. Agency, I. E. *World Energy Outlook 2012*, International Energy Agency, 2012.
৩১. Berkoff, J., *China: The South–North Water Transfer Project— is it justified*? Water Policy No-5, 2013.
৩২. Ranjan R., "Damming The Brahmaputra: Setback To South Asian Stability", Centre for East Asian Studies, JNU, Aug. 12, 2010.
৩৩. Lewis, C., *China's Great Dam Boom: A Major Assault on Its Rivers*, 2013, available at: www.yale.edu/feature/chinas_great_dam_boom_an_assault_on_its_river_systems/2706/.
৩৪. Sanyal, A., China Building Dams in Brahmaputra: Tarun Gogoi Asks PM Modi to Take Up Issue, 2014, www.ndtv.com/india-news/china-building-dams-in-brahmaputra-tarun-gogoi-asks-pm-modi-to-take-up-issue-706313
৩৫. Duarah, C.K., *India Gives Green Light to Build Country's Largest Dam*, 2014, available at: https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/7359-India-gives-green-light-to-build-country-s-largest-dam
৩৬. Hazarika, O.B.Riparian Relations between India and China: Exploring Interactions on Transboundary Rivers, *International Journal of China Studies*, Vol. 6, No. 1, 2015.
৩৭. Malhotra, P. & Arora, "Sino-Indian Water Wars?", in D. Vajpeyi (ed.), Water Resource Conflicts and International Security: A Global Perspective, Plymouth: Lexington Books, 2011.
৩৮. Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, 1997
৩৯. Biswas, A.K. (2008), Management of Ganges-Brahmaputra-Meghna System: Way Forward, Water Resources Development and Management.
৪০. Shah RB (2001) Ganges-Brahmaputra: The Outlook for 21st Century. In: Biswas AK, Uitto JI (eds) Sustainable Development of the Ganges-Brahmaputra-Meghna Basin. United Nations University Press, Tokyo.
৪১. Biswas, A.K. (2008).

ঢাকায় বাংলাদেশি নবীন এবং শিক্ষিতদের মধ্যে অভিবাসন আকাঙ্ক্ষা

অ্যালেন ব্যাল

সারসংক্ষেপ

বর্তমানে, পূর্বের যেকোনো সময়ের তুলনায় অধিক মানুষের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য তাদের জন্মস্থানের পরিবর্তে অন্য কোনো স্থান। এই প্রবণতা 'বৈশ্বিক দক্ষিণে' বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। ঢাকার শিক্ষিত (নিম্ন) মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি উদাহরণ অনুসরণ করে এই প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে অনেক 'সম্ভাব্য অভিবাসীর' জন্য, নিজের জন্মভূমি ত্যাগের ব্যাকুলতা আন্তর্জাতিক অভিবাসনের মূল কারণ নয়; বরং তা হতাশা এবং অসম্পৃক্ততার একটি রূপকবিশেষ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দ্রুত নগরায়ণ এবং শিক্ষায় ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ; উদীয়মান শহুরে (নিম্ন) মধ্যবিত্ত নবীনদের মধ্যে নতুন 'আধুনিক' জীবনাচরণের আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা তাদের নিজেদের দেশে পূরণ করা সম্ভব হয় না। এর ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের একধরনের অসম্পৃক্ততার অনুভূতির জন্ম হয়। সাংস্কৃতিক আবহে নির্মিত বৈদেশিক স্থানসমূহের কল্পনা কীভাবে স্থানীয় জীবনের ব্যক্তিগত (পুনঃ) মূল্যায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা এই প্রবন্ধের বিশেষ মনোযোগের বিষয়। প্রায় সব তথ্যদাতাই স্থানীয় আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক এবং অস্তিত্বের নিরাপত্তাহীনতা কীভাবে তাদের 'নিরাপদ' স্থানের জন্য প্রলুব্ধ করেছে তা ব্যাখ্যা করেছেন। তারা বিশ্বাস করেন সেখানে তাদের স্বপ্ন পূরণ হতে পারে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

বাংলাদেশ, অভিবাসন আকাঙ্ক্ষা, মধ্যবিত্ত শ্রেণি, নবীন, নিরাপত্তাহীনতা, নাগরিক (অ) সম্পৃক্ততা।

ভূমিকা

২০১০ সালের মার্চের এক সন্ধ্যায় আমার বন্ধু সুবর্ণা এবং আমি ঢাকায় নবনির্মিত উপশহর খিলক্ষেতে যাওয়ার জন্য একটি সিএনজি অটোরিকশা ভাড়া করি।

কয়েক বছর আগে পর্যন্ত এই জায়গাগুলো ধানখেত ছিল। এখন এই এলাকা জনবহুল, যেখানে বস্তি, ঘর, অফিস, রাস্তার পাশের দোকান এবং ছোট ছোট রেস্টুরেন্ট মিলে একটি নতুন পরিবেশ তৈরি করেছে। প্রধান সড়ক ছাড়িয়ে একটি জনবহুল বাজারের মধ্য দিয়ে আমরা আরও তিন কিলোমিটার পথ অতিক্রম করলাম। রাস্তাটিতে কাদার ছড়াছড়ি এবং সরু ছিল। এরপর আমরা ১৫তলাবিশিষ্ট প্রায় আটটি অ্যাপার্টমেন্টের একটি আবাসিক এলাকায় প্রবেশ করলাম। ওইখানে আমরা একজন অবসরপ্রাপ্ত এনজিও কর্মকর্তা সাঙমার সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছিলাম। যখন আমরা বসলাম, তখন আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন সাঙমার ১৮ বছর বয়সী ছেলে জন। তিনি হঠাৎ যুক্তরাষ্ট্রে একটি আইভি লিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির স্বপ্নের কথা আমাদের জানালেন। যেহেতু জন ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন, তাই তিনি ইংরেজি বলছিলেন বেশ দক্ষভাবে। তার বাবার উপস্থিতিতে, জন অভিযোগ করলেন যে, কেউ তার স্বপ্নকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। এই স্বপ্নে অটুট থাকা কতটা কঠিন, তা তিনি আমাদের বলেছিলেন। জন তাকে উৎসাহিত না করায় তাঁর বিদ্যালয় এবং মা-বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন। কিছুক্ষণ পর জন কেন বাংলাদেশ ছাড়তে দৃঢ়ভাবে ইচ্ছুক, তার কারণ আমাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। 'চারপাশে তাকিয়ে দেখুন, পরিবেশটা কী স্যাঁতসেঁতে', তিনি নালিশ করলেন।

জন মনে করেন এই দেশে উন্নতি করা সম্ভব না। যখন আমি জনকে প্রশ্ন করলাম যে অনেক লোক বাংলাদেশ ত্যাগের স্বপ্ন দেখছে, এ কথাটি অতিকথন কি না; তখন জন উত্তর দিলেন, 'আমাদের এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই, এটি সহজবোধ্য একটি বিষয়, এটি সবাই জানে।' তখন আমাদের আলোচনা অন্যদিকে মোড় নিল। বাবা ও ছেলে দেশপ্রেম নিয়ে তর্কে জড়িয়ে পড়লেন। সাঙমা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, যার জন্য তিনি সম্প্রতি একটি ক্রেস্ট পেয়েছেন। সে সময়ে তাঁর বয়স ছিল প্রায় ২১ বছর এবং তিনি দেশের জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি জোর দিয়ে বললেন যে দেশের জন্য ভালো কিছু করা, দেশপ্রেম, এখনো প্রাসঙ্গিক; কিন্তু বর্তমানে দেশের প্রধান শত্রু দারিদ্র। তাঁর ছেলের দেশপ্রেম তুলনামূলক কম। সে তাঁর মেধাকে ব্যবহার করতে তৈরি, তবে দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই।[১]

আমার সাদা চামড়া হয়তো জনকে তার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তবে এই আকাঙ্ক্ষার পেছনে অন্য কারণও কাজ করেছে। তার স্বপ্নগুলো দৃঢ় এবং কোনো অর্থেই অদ্ভুত কোনো বিষয় নয় (এমনকি এটাকে সাধারণ বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়)। এমনটা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা এবং বিশ্বময় অনেক নবীনেরই (এবং ততটা নবীন না হলেও) স্বপ্ন। অর্থ উপার্জন,

সুযোগ বৃদ্ধি বা একটি পেশায় স্থায়ী হওয়ার জন্য 'বৈশ্বিক দক্ষিণ', পূর্ব ইউরোপ এবং অন্য আরও অনেক স্থানে ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য মানুষেরা তাদের নিজেদের দেশ ত্যাগের স্বপ্ন দেখছে। ১৯৯৬ সালে আপ্পাদুরাই উল্লেখ করেন, 'অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন অনেক বেশি মানুষ নিয়মিতভাবে কল্পনা করে যে তারা বা তাদের সন্তানেরা যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছে, সে দেশের পরিবর্তে অন্য দেশে বাস করবে এবং কাজ করবে' (১৯৯৬, পৃ. ৬)। একটি সাম্প্রতিক গ্যালাপ জরিপে দেখা গিয়েছে, প্রায় ৭০০ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ অন্য দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের ইচ্ছা পোষণ করে (আইসিপোভা এবং অন্যান্য, ২০১০-২০১১)।[২] অন্য কথায়, অসংখ্য মানুষের কল্পিত এবং বাস্তব গন্তব্য তাদের জন্মভূমির পরিবর্তে অন্য স্থান। সাম্প্রতিক বিশ্বায়ন আমরা কোথায় এবং কার সঙ্গে সম্পৃক্ত, সে ধারণারই পরিবর্তন সাধন করেনি; একই সঙ্গে আমরা কোথায় যেতে চাই, সেটাও বদলে দিয়েছে।

দুই দশক বা এ রকম সময় ধরেই অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা অভিবাসন আকাঙ্ক্ষার অর্থনৈতিক প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিকটি ক্রমাগতভাবে তুলে ধরছেন (যেমন- ক্যানডেল এবং মেসি, ২০০২; ব্যাস, ২০০৯; রুডনিক, ২০০৯)। তারা (উচ্চাকাঙ্ক্ষী) অভিবাসীদের (এককভাবে) শুধু বিচক্ষণ অর্থনৈতিক কর্মক হিসেবে এখন আর বিবেচনা করছেন না, যারা পুস-ফ্যাক্টরগুলোর (যেমন- দারিদ্র্য ও বেকারত্ব) এবং পুল-ফ্যাক্টরগুলোর (উচ্চ বেতন এবং চাকরির প্রাপ্যতা) প্রতি সাড়া দেয়। এখন বিশেষজ্ঞরা অভিবাসন করতে মানুষের প্রণোদনা ও সক্ষমতার জটিলতা এবং বৈচিত্র্যের বিষয়গুলোও তুলে ধরছেন। সর্বোপরি, অর্থনৈতিক বৈষম্য, বেতনের অসমতা, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং 'সামাজিক কল্যাণ'-এর পার্থক্য (দেখুন, ক্যাসলু, ২০০০ : পৃ. ২৭২) (উচ্চাকাঙ্ক্ষী) অভিবাসনের সবচেয়ে সুস্পষ্ট কারণ হতে পারে; কিন্তু এই বিষয়গুলো সবার জন্য এবং সবখানে একই মাত্রায় কাজ করে না। অন্যদিকে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার অভিবাসনের হারকে বৃদ্ধি করে, এ রকমটাও দাবি করা যায় না। প্রতিটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রই অভিবাসন-ইচ্ছুকদের রাষ্ট্র নয় এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর সব নাগরিকও অভিবাসন করতে ইচ্ছুক নয় (দেখুন, উল্লাহ, ২০১০ : পৃ. ৮)।

কয়েকজন অভিবাসন বিশেষজ্ঞ অভিবাসন আকাঙ্ক্ষার সাংস্কৃতিক নির্মাণের বিষয়টির ওপর বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছেন। তাঁদের গবেষণার মূল বিষয়গুলো হলো : 'অভিবাসনের সংস্কৃতি' (যেমন- ম্যাসেই এবং অন্যান্য, ১৯৯৩; আলী, ২০০৭; হরভ্যাত, ২০০৮; জনসন, ২০০৮), আন্তদেশীয় অভিবাসন এবং স্থানীয় কল্পনায় বিদেশকে উপস্থাপনের মধ্যে সম্পর্ক (যেমন- গার্ডেনার, ১৯৯৩, ২০০৮;

জেইটলিন, ২০১২), বা অভিবাসন আকাঙ্ক্ষা এবং তার বাস্তবায়নের মধ্যে ব্যবধান (যেমন- কার্লিং, ২০০২)।

যা হোক, সবগুলো পন্থাই অভিবাসন আকাঙ্ক্ষাকে এখনো (আন্তদেশীয়) অভিবাসনের একটি কাঠামোতেই ধারণায়ন করে। জন এবং তার বাবার সঙ্গে আমাদের আলাপ অভিবাসন আকাঙ্ক্ষা পাঠের অন্য একটি ধারণাকে সামনে নিয়ে এসেছে, যা তুলনামূলকভাবে অধিক স্পষ্ট। অভিবাসন হিসেবে শারীরিক স্থানান্তরের সঙ্গে এই ধারণার খুব কম সম্পর্কই রয়েছে। বিদেশের প্রতি জনের আকর্ষণ, তার দেশত্যাগের পূর্ব লক্ষণের চেয়ে অসন্তোষ, হতাশা এবং অসম্পৃক্ততার একটি বহিঃপ্রকাশ বা রূপক হিসেবে দেখা যায়। জনের বাবা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, দেশপ্রেমের অঙ্গীকার এবং কাজের মাধ্যমে এখনো দেশে জীবনের উন্নয়ন সম্ভব। কিন্তু তাঁর সন্তান বেড়ে উঠেছে অত্যধিক জনবহুল মেগাসিটির একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে। এই শহরের প্রতি তিনি বিতৃষ্ণাভাব পোষণ করেন এবং এখানে তার নিজেকে দমবন্ধ মনে হয়। তার কথায় বাংলাদেশে ব্যক্তিগত উন্নয়ন-সম্ভাবনার অপ্রতুলতা, সর্বোপরি একধরনের হতাশা এবং ওইসব জায়গার কথা, যেখানে সব সম্ভাবনা অবারিত এবং যেখানে তিনি যেতে ইচ্ছুক, সেসব কথা উঠে আসে। তার ভবিষ্যৎ আকাঙ্ক্ষার একটি আন্তদেশীয় মাত্রা আছে, যা তার বাবার যুবক বয়সে ধারণাতীত ছিল, যদিও তা আপাতত অভিবাসনের ভবিষ্যদ্বাণী করে না।

অতঃপর, এই প্রবন্ধ এটা ধরে নিয়ে শুরু হচ্ছে যে বিদেশ যাওয়ার ব্যাকুলতা অভিবাসনের আগে ঘটে, যখন এটি স্পষ্টত আকাঙ্ক্ষা এবং অভিবাসন কৌশলে পরিণত হয়। এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী অনেক তরুণ-তরুণীর জন্য বিদেশ যাওয়ার এই আকাঙ্ক্ষা কখনো বাস্তবে পরিণত হবে না এবং সম্ভবত এই আকাঙ্ক্ষা উবে যাবে বা পুরোপুরি ভিন্ন মনোভাবে পরিণত হবে। ঢাকা/বাংলাদেশে প্রাত্যহিক জীবনযাপন এবং নিত্যদিনের অভিজ্ঞতার বিষয়ে অধিকাংশ তথ্যদাতারই স্পষ্ট অভিযোগ রয়েছে, কিন্তু তাদের স্বপ্নগুলো সাধারণত অস্পষ্ট। অন্যদিকে তাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে কীভাবে যেতে হবে, তার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও তাদের কাছে নেই। অন্য সবকিছুর পরও, দেশত্যাগের এই আকাঙ্ক্ষা নিজেদের দেশে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা (কল্পনাপ্রসূত) এবং বৈশ্বিক সম্ভাবনাসমূহের মধ্যকার পার্থক্য থেকে উদ্ভূত হতাশা এবং অসম্পৃক্ততার একটি রূপক হিসেবে প্রতীয়মান হয়। এই অনুভূতিগুলো অভিবাসন-পূর্ব কর্মকাণ্ড এবং অভিবাসনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সাধারণভাবে বোঝা যাবে না। এসব অনুভূতি বুঝতে একটি বিস্তৃত পর্যালোচনাগত কর্মকাঠামো প্রয়োজন। এই লক্ষ্য পূরণে এই প্রবন্ধটি একটি পদক্ষেপ। ঢাকার শিক্ষিত (নিম্ন) মধ্যবিত্ত শ্রেণির

তরুণ-তরুণীদের মতামত ব্যবহার করে এটি দেখানো হবে যে বিশেষত হতাশা, অসন্তোষ, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার দ্রুত রূপান্তর, সাম্প্রতিক বিশ্বায়ন, স্থানীয় সুযোগ এবং বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতির মধ্যকার অনুভূত বৈসাদৃশ্য একীভূত হয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পৃক্ততার বিষয়টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং এমন স্থানের জন্য আকাঙ্ক্ষা তৈরি করছে, যেখানে যেতে পারলে আমাদের তথ্যদাতাদের চাহিদাগুলো পূরণ হবে। গবেষণা পদ্ধতি এবং বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলোর নাতিদীর্ঘ বর্ণনার পর গোটা গবেষণায় উঠে আসা চারটি মূল প্রসঙ্গ এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে: শিক্ষার প্রতিশ্রুতি এবং স্থানীয় সুযোগগুলোর মধ্যকার পার্থক্য, ঢাকায় দৈনন্দিন বাস্তবতার দুঃসহ প্রভাবগুলো, হতাশার অনুভূতি এবং এর থেকে উদ্ভূত 'জন্মভূমির' সঙ্গে অসম্পৃক্ততার এবং অভিবাসন স্বপ্নগুলোর অস্পষ্ট প্রকৃতি। এগুলো ঢাকায় অনেক তরুণ-তরুণীরই ইচ্ছা কিন্তু তা পূরণ হয়নি।

অভিবাসন আকাঙ্ক্ষার পাঠ

ঢাকায় ছয় মাসব্যাপী (ফেব্রুয়ারি, ২০১০ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১০) নিবিড় অ্যাথনোগ্রাফিক তথ্য সংগ্রহের ওপর ভিত্তি করে এই প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ, বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক কথোপকথন এবং স্থানীয় তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে ত্রিশটিরও বেশি আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার।[৩] বাংলাদেশে অর্ধেকেরও বেশি মানুষের বয়স ২৫ বছরের কম। নগর জীবনের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণের জন্য বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীরা—যাদের শিক্ষা, চাকরি এবং বিয়ে সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয়—কীভাবে তাদের (বিদেশে) ভবিষ্যতের জীবনের ধারণা নির্মাণ করে এবং কীভাবে কল্পিত ভবিষ্যৎ অনুসারে কাজ করে, সে সম্পর্কে সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। আমরা আটটি অভিবাসন এবং বৃত্তি পরামর্শ কেন্দ্রে যাই, যেগুলো সাধারণত মিডিয়া সেন্টার নামে পরিচিত। অনুমতি সাপেক্ষে আমরা সেখানকার কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি।

গবেষণাটি লেখক এবং দুজন স্থানীয় (স্নাতকোত্তর) গবেষকের দ্বারা করা হয়েছিল। স্থানীয় গবেষকেরা বিস্তারিত সাক্ষাৎকারগুলো গ্রহণ করেছেন।[৪] আমরা আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত পরিচয় এবং স্নোবল স্যাম্পলিংয়ের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে তথ্যদাতা নির্বাচন করি (ওরেইলি, ২০১২: পৃ. ৪২-৪৪)। বাংলাদেশে আমার ব্যক্তিগত গবেষণার অভিজ্ঞতা এবং দুজন গবেষকের ভিন্ন নৃতাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় পটভূমির (মুসলিম বাঙালি এবং হিন্দু হাজং) কারণে আমরা তুলনামূলকভাবে তরুণ-তরুণী (যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর) এবং একটি

মিশ্র গোষ্ঠীর তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার নিতে পেরেছি।[৫] আমাদের অধিকাংশ তথ্যদাতা বাঙালি এবং মুসলমান (১১ জন ছেলে এবং ৮ জন মেয়ে), ১০ জন (সবাই পুরুষ) সাক্ষাৎকারদাতা হিন্দুধর্মাবলম্বী এবং ৪ জন (২ জন ছেলে এবং ২ জন মেয়ে) ছিল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সদস্য (চাকমা, হাজং ও ত্রিপুরা)। ফলে মোট বাংলাদেশি জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের গবেষণা দলটি নৃতাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় দিক দিয়ে অধিক বৈচিত্র্যময় ছিল। ফলে তথ্যদাতাদের আমরা বিভিন্নভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছি। প্রায় সব তথ্যদাতাই অভিবাসনের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বিদেশে যেতে চাওয়ার কারণ হিসেবে তারা মোটামুটি একই ধরনের (অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অস্তিত্বগত) নিরাপত্তাহীনতা প্রকাশ করেছেন। যারা সংখ্যালঘু (নৃতাত্ত্বিক/ধর্মীয়) সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন, তারা রাষ্ট্রে তাদের সংখ্যালঘু অবস্থার কারণেও নিরাপত্তাহীনতার কথা জানান। আমাদের নারী তথ্যদাতারা ইভ টিজিংয়ের কারণে নিরাপত্তাহীনতার কথা সরাসরি প্রকাশ করেন। ইভ টিজিং বলতে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রে পুরুষদের দ্বারা নারীদের জনসমক্ষে যৌন হয়রানিকে বোঝায়।

আমাদের প্রায় সব তথ্যদাতাই প্রথম প্রজন্মের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বা স্নাতক। তারা গ্রামীণ এলাকায় (গ্রাম ও ছোট শহর) জন্মগ্রহণ করেছেন এবং উচ্চশিক্ষার্থে ঢাকায় এসেছেন। শিক্ষিত হিসেবে সামাজিক অবস্থান তাদের নিজেদের আকাঙ্ক্ষা এবং ব্যক্তিগত উন্নয়ন, জীবনাচরণ এবং পেশা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সব সাক্ষাৎকারেই শিক্ষার সঙ্গে অর্জিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি এবং বর্তমানের বাংলাদেশে এসব আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের বাস্তবিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ধারণার স্বল্পতা একটি আপাত বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করেছে (আরও দেখুন, আহসান, ২০০৯)।[৬]

আমাদের তথ্যদাতারা একটি বৈচিত্র্যময় তরুণ-তরুণীর সমন্বয়ে গঠিত ছিলেন। তারা সবাই নানা মাত্রায় আধুনিক গণমাধ্যমের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সংযুক্ত। তাদের প্রায় সবারই কিছু বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজন বিদেশে থাকেন। যারা বিদেশে যাওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন বা বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন, এ রকম লোকদের সঙ্গে তারা পরিচিত। ছবি, ধারণা এবং মানুষের প্রবাহের মাধ্যমে গড়ে ওঠা সমাজগুলোর আন্তসম্পর্ক জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছে এবং তা জাতিরাষ্ট্রের সীমানার বাইরেও বিস্তৃত (লেভিট এবং গ্লিক শিলার, ২০০৪ : পৃ. ১০০৭-১০০৯)। যদিও তাদের আন্তদেশীয় দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে বৈচিত্র্যময় ছিল। কারও কারও বিদেশে বন্ধুবান্ধুব এবং আত্মীয়স্বজন আছেন, যারা তাদের বাংলাদেশ ত্যাগ করতে বা দেশে থেকে যেতে উৎসাহিত করেন। অন্যদের বিদেশে কোনো বন্ধু বা আত্মীয়স্বজন নেই এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগও নেই। অনেকের কাছে ইন্টারনেট ক্যাফে ব্যবহার ব্যয়বহুল এবং সেখানে বেশিক্ষণ থাকাও যায় না। অভিবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সংযোগ গড়ে তুলতে পারায় আমাদের তথ্যদাতাদের অল্প কয়েকজন তাদের স্বপ্ন পূরণে কাজ শুরু করতে পেরেছিলেন। তবে অধিকাংশই তা করতে সক্ষম হননি। তাদের আকাঙ্ক্ষা হতাশা এবং বিষাদের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু ছিল না।

অর্থনৈতিক রূপান্তর এবং চলিষ্ণু (mobile) নাগরিক

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের অর্থনীতি অভূতপূর্বভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সাহায্যের গুরুত্বের জায়গা দখল করে নিয়েছে তৈরি পোশাক রপ্তানি শিল্প, চিংড়ি রপ্তানি এবং রেমিট্যান্সের বৃদ্ধি, বিশেষত গাল্‌ফ দেশগুলো থেকে। জিডিপিতে কৃষির গুরুত্ব অর্ধেকের জায়গায় এক-ষষ্ঠাংশে নেমে এসেছে এবং সেবা খাতের গুরুত্ব এক-তৃতীয়াংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশে পরিণত হয়েছে (লুইস, ২০১১ : পৃ. ১৩৬-১৩৭)। এসব পরিবর্তনের ফলে গ্রাম থেকে শহরে বড় ধরনের অভিবাসন ঘটেছে। শহরের জনসংখ্যা বার্ষিক ৩.৫% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে (লুইস, ২০১১ : পৃ. ১৬৩)। ১৯৭১ সালে ঢাকার অধিবাসী ছিল ১০ লাখ। ২০০৭ সালের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৪০ লাখে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে তা সম্ভবত আড়াই কোটিতে পরিণত হবে (ভ্যান স্যান্ডেল, ২০০৯ : পৃ. ২৩২)।

বহুজাতিক অভিবাসনের গুরুত্বের ফলে একটি বড় ধরনের অভিবাসন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমানের বাংলাদেশ অভিবাসনকে উৎসাহিত করছে। ২০১২ সালের গ্যালাপের এক প্রতিবেদন অনুসারে, ৮ মিলিয়ন বাংলাদেশি যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন (তুলনামূলকভাবে ভারতে এই সংখ্যা ১০ মিলিয়ন এবং মেক্সিকোতে এই সংখ্যা ৫ মিলিয়ন)[৭]। এর ফলে এটা প্রমাণিত হয় যে, যেকোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে সমাজের সব স্তর থেকে অধিক সংখ্যক বাংলাদেশি অভিবাসনে ইচ্ছুক (তুলনামূলক চিত্রের জন্য দেখুন, গার্ডেনার, ১৯৯৩; রুডনিক, ২০০৯ : পৃ. ৪৮; উল্লাহ, ২০১০)। শুধু ঢাকাতেই নয়, ছোট-বড় প্রায় সব শহরেই বিভিন্ন দপ্তরের দেয়াল, বাসস্টেশন এবং এমনকি রিকশার পেছনেও বৃত্তি কর্মসূচি, ভিসা পরামর্শকেন্দ্র এবং ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের বিজ্ঞাপনের বিলবোর্ড এবং প্রচারপত্রে সজ্জিত। বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকাগুলোও বৃত্তি, স্টুডেন্ট ভিসা, ওয়ার্ক পারমিট এবং এমনকি নিউজিল্যান্ড, বেলজিয়াম, কানাডা, হাঙ্গেরি, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, সাইপ্রাস, স্পেন, মালয়েশিয়া, জার্মানি, মাল্টা, ইতালি, চীন, স্কটল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, পোল্যান্ড, সুইডেন, ইউক্রেন, আজারবাইজান, যুক্তরাষ্ট্র, ডেনমার্ক, যুক্তরাজ্য, জর্জিয়া,

যুক্তরাজ্য এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় স্থায়ী বসবাসের বিজ্ঞাপনে ঠাসা। অন্যান্য বিজ্ঞাপনে আইইএলটিএস বা টোফেলের কোচিংয়ের বিজ্ঞাপন বা ব্যাংক জামানত সহায়তা প্রদানের তথ্য এবং 'অস্ট্রেলিয়া চল, জীবন পাল্টে ফেল' বা 'যা ইচ্ছা হয়ে যাও' জাতীয় স্লোগান প্রচার করে।

১০০টিরও বেশি দেশে বাংলাদেশিরা কাজ করছেন, যদিও অভিবাসীদের অধিকাংশই মধ্যপ্রাচ্য বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কাজ করেন। এসব অভিবাসী বাংলাদেশের প্রধান দাতায় পরিণত হয়েছেন। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই আনুষ্ঠানিকভাবে হিসাবকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল সব ধরনের বিদেশি সাহায্যের মোট অর্থমূল্যের চার গুণ (ভ্যান স্যান্ডেল, ২০০৯ : পৃ. ২২৫)। ২০০৮ সালে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫.৮ মিলিয়ন এবং জিডিপিতে রেমিট্যান্সের অবদান ছিল প্রায় ১০%; ২০০৫ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে বার্ষিক রেমিট্যান্সের প্রবাহ ৪.২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পরিণত হয় (রহমান এবং আলমগীর কবির, ২০১২ : পৃ. ২)। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ১০টি রেমিট্যান্স গ্রহীতা দেশগুলোর একটি। মোট রেমিট্যান্সের দুই-তৃতীয়াংশই মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসে এবং এরপরে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান (বিশ্বব্যাংক, ২০০৮)।

বাংলাদেশের জন্য অভিবাসনের প্রাসঙ্গিকতা থাকা সত্ত্বেও, এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ২০১১ সাল পর্যন্ত হিসাবকৃত অভিবাসীদের মোট সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩.৩%। অধিকাংশ বাংলাদেশি তাঁদের নিজেদের জায়গাতেই আছেন। অভিবাসী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ, আন্তযোগাযোগ, ইচ্ছা বা উদ্যম তাঁদের নেই। এই প্রবন্ধের ক্ষেত্রে নিচের পর্যবেক্ষণগুলো বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, বাংলাদেশে আগ্রহী অভিবাসীদের বিন্যাস বেশ বৈচিত্র্যময় এবং এর মধ্যে যারা দেশত্যাগের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যাদের অনেক আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু বিদেশে থাকেন এবং যারা কৌশলগত পরিকল্পনায় যুক্ত থাকেন, তাঁরাও অন্তর্ভুক্ত (আরও দেখুন, রুডনিক, ২০০৯; উল্লাহ, ২০১০)। অন্যরা, যদিও দেশত্যাগের জন্য মুখিয়ে থাকেন, তবে তাঁদের ইচ্ছা পূরণের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন না এবং আমাদের গবেষণার সময় অংশগ্রহণকারী তথ্যদাতারা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত; তাদের আকাঙ্ক্ষা অভিবাসন-সম্পর্কিত কাজে রূপ নেয় না। দ্বিতীয়ত, মধ্যপ্রাচ্য অধিকাংশ বাংলাদেশি অভিবাসীর কর্মস্থল, আমাদের মাত্র একজন তথ্যদাতাই মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। অন্যরা তথাকথিত পশ্চিমা উন্নত বিশ্বের নানা স্থানের নাম উল্লেখ করেন, যদিও তাদের উত্তর গোছালো ছিল না এবং এর মধ্যে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের একটি স্পষ্ট ক্রম পরিলক্ষিত হয়।

শিক্ষা, আধুনিকতা এবং দূরবর্তী গন্তব্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা

বাংলাদেশে সন্তানদের শিক্ষায় (বিদেশে) উচ্চবিত্তের যে দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে (ভ্যান স্যান্ডেল, ২০০৯ : পৃ.২২৭) তা দ্রুতগতিতে মধ্যবিত্তের (উচ্চাকাঙ্ক্ষী) মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। অধিকাংশ বাংলাদেশি ভাল বেতনের এবং উচ্চমর্যাদার চাকরি লাভের পন্থা হিসেবে শিক্ষাকে গুরুত্ব দেন (লুইস, ২০১১ : পৃ.১৮২)। আমাদের প্রায় সব তথ্যদাতাই শিক্ষা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকা থেকে ঢাকায় এসেছেন। তাদের কেউই অদূর ভবিষ্যতে তাদের পৈতৃক গ্রাম বা শহরে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেন না। প্রকৌশলী, সমাজকর্মী, ব্যবস্থাপক বা গবেষক হিসেবে প্রশিক্ষিত হওয়ার পর, তারা তাদের ডিগ্রির সঙ্গে মানানসই পেশা এবং জীবনাচরণের আশা করেন। শিক্ষিত বাংলাদেশি হিসেবে পাওয়া তাদের নতুন সামাজিক মর্যাদা, চাকরি এবং জীবনাচরণের ফলে তাদের ঢাকায় থাকতে হবে বলে তারা মনে করেন। আপাত বিরোধী মনে হলেও, আমাদের কয়েকজন তথ্যদাতার মতে, ঢাকাই তাদের মনে আন্তর্জাতিক অভিবাসনের আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছে এবং এই বিষয়টি অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসনের মধ্যে যে একটি দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে, সে ধারণাটিকেই দৃঢ় করে (বিস্তারিত দেখুন, রুডনিক, ২০০৯ : পৃ. ৪৮; কিং এবং স্কেলডন, ২০১০ : পৃ. ১৬২৩)। জেনিথ (পুরুষ, বয়স : ২৫ বছর) ব্যাখ্যা করে বলেন, 'শহরে আসার পর, মানুষের আশা এবং স্বপ্ন বৃদ্ধি পায়'। তিনি আরও দেখেছেন, কীভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সিনিয়র ভাইয়েরা—যাদের বিদেশি ডিগ্রি আছে এবং যারা বিদেশে যেতে চান—অন্যদের বিদেশে চলে যেতে উৎসাহিত করেন। সঞ্চিত (বয়স : ২৩ বছর) কলেজে ভর্তি হওয়ার পরই বিদেশে অভিবাসনের স্বপ্ন দেখা শুরু করেন। তার মতে, 'আমার সব বন্ধুই স্নাতক শেষ করার পর বিদেশ চলে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন'।

যারা শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তাদের শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশ সরকারের একটি অগ্রাধিকার ছিল (আহসান, ২০০৯)। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যুবকদের মধ্যে শিক্ষার হার ১৯৮১ সালের ২৯.২% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৯ সালে ৫৫.৯%-এ পরিণত হয় (ইনডেক্স মান্ডি ২০১১)[৮]। দুর্ভাগ্যজনকভাবে,একই সময়ে শিক্ষিত তরুণ বেকারদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈশ্বিক দক্ষিণের অন্যান্য এলাকার মতোই, শিক্ষিত তরুণ বেকারদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সফল পেশাদারি কর্মস্থল নিশ্চিত করবে বলে অধিকাংশ মানুষ যে আশাবাদ পোষণ করতেন, তা অনেকের জন্যই সত্য হিসেবে প্রতীয়মান হয়নি (দেখুন, জাফরি, ২০০৯)। প্রকৃতপক্ষে, 'বাংলাদেশে চাকরি লাভে বহুল প্রচলিত

ব্যাপক দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতির কারণে অনেক শিক্ষিত নবীনই অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূলধনের অভাবে তাদের সাংস্কৃতিক মূলধনকে নিরাপদ চাকরিতে রূপান্তরিত করতে পারে না' (আহসান, ২০০৯: পৃ. ১৩)। চাকরির অনিশ্চয়তা দেশত্যাগের আকাঙ্ক্ষার অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। আমাদের কয়েকজন তথ্যদাতা বিশ্বাস করেন যে তারা তাদের স্বপ্নের দেশে কাঙ্ক্ষিত চাকরি খুঁজে পেতে সক্ষম হবেন, যদিও তাদের নিজেদের দেশে সে রকম কোনো সম্ভাবনার আশা খুব অল্পই আছে। আকিদ, একজন ২৯ বছর বয়স্ক মুসলিম। তার জন্ম কুমিল্লার একটি প্রতিষ্ঠিত পরিবারে। তার বয়স্ক আত্মীয়রা ভালো পদে কাজ করেন এবং তিনি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়ন শেষ করেছেন, ফলে বিদেশে যাওয়ার কথা তিনি কখনো বিবেচনা করেননি। কিন্তু, ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের তিন বছর পর, তার মনেও দেশত্যাগের ধারণা জন্ম নিয়েছে, 'আমি লক্ষ করেছি আমার চেয়েও বেশি যোগ্য শিক্ষার্থীরা একটি ভালো চাকরি খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে; তারা এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কোনো ভালো চাকরি পাচ্ছে না। কোনো কোনো সময়, চাকরিদাতারা এমনকি মোটা অঙ্কের অর্থও দাবি করে। চাকরিপ্রার্থীদের অনেক টাকার প্রয়োজন। (...) আমি বিদেশে যেতে পারলে একটি ডিগ্রি এবং অর্থ উপার্জন উভয়ই করতে পারব।' সাহিরা একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, তিনি নারী প্রকৌশলী হিসেবে কাজের সুযোগের কথা বলছিলেন। তিনি এক বন্ধুর কাছে শুনেছেন যে বিদেশে নারীরা শিল্প খাতকে নিজেদের পেশা হিসেবে নিতে পারেন। তবে বাংলাদেশে 'একজন নারী ১০০ বা এর কাছাকাছি সংখ্যক পুরুষ কাজ করে এ ধরনের একটি কোম্পানিতে কাজ করতে পারেন না, এটা অসম্ভব।' শ্রমবাজারে প্রবেশ করতে পৃষ্ঠপোষকদের ভূমিকার কথাও সাহিরা তুলে ধরেন:

> আমার নিজের অভিজ্ঞতা হচ্ছে যোগ্যতা দিয়ে কোনো চাকরি পাওয়া যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষক না থাকছে। যদি কেউ আপনাকে একটি চাকরি দেয়, তিনি প্রতিদানে আপনার কাছ থেকেও কিছু আশা করবেন এবং আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন কোনো নারীর কাছ থেকে সে প্রতিদান কী হতে পারে...আমি মনে করি বিদেশই নিরাপদ।

ঢাকার অসহনীয় অবস্থা, 'আমরা কি ভোগার জন্যই এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলাম?'

দিন দিন মেগাসিটি ঢাকার জীবন বাস্তবতা, যেটি পেশাদারি কর্মস্থল এবং মধ্যবিত্তের আধুনিক জীবনাচরণেরও স্থান, বিদেশে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকেও পুষ্ট করে। কোনো ধরনের সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনার অভাবে, দ্রুত নগরায়ণ দেশের রাজধানীর জন্য মারাত্মক কায়িক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিণতি বয়ে আনছে। বর্তমানে দূষিত বায়ুমানের মেগাসিটিগুলোর মধ্যে ঢাকার অবস্থান ওপরের দিকে

এবং বায়ুদূষণ কমানো জরুরি হয়ে পড়েছে (দেখুন, গুরজার এবং অন্যান্য, ২০০৮)। এর লাখ লাখ বাসিন্দাকে প্রয়োজনীয় পানি, বিদ্যুৎ ও পরিবহন-সুবিধা দিতেও শহরটিকে বেগ পেতে হচ্ছে। জনপরিবহনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এই শহরে নেই এবং অবকাঠামোগুলো ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিগত গাড়িগুলোর স্থান সংকুলন করতে পারছে না, ফলে ভয়াবহ যানজট তৈরি হচ্ছে।

প্রায় সব সাক্ষাৎকারেই ঢাকার বসবাস অযোগ্য অবস্থা আলোচনার প্রধান বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আমাদের তথ্যদাতারা বিদ্যুৎ ও পানির কাঠামোগত স্বল্পতা, বিশ্রামের জন্য খোলা জায়গার অভাব এবং নিত্যদিনের ট্রাফিক জ্যামের অভিযোগ উত্থাপন করেন। এই যানজটের ফলে ঢাকার রাস্তাগুলো বন্ধ হয়ে যায় এবং চলাচল মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। একটা সাক্ষাৎকারের সময় মিজান বলেছিলেন, 'আপনি দেখুন এইমাত্র বিদ্যুৎ চলে গেল, যদিও আজ শুক্রবার (বন্ধের দিন); আজ তুলনামূলভাবে বিদ্যুতের চাহিদা কম, তবুও বিদ্যুতের সরবরাহ নেই'। মিজানের বয়স ২৮ বছর এবং তিনি বিবাহিত। তার বাড়ি কুষ্টিয়া এলাকায়। তার বাবা একজন ব্যবসায়ী এবং মা গৃহিণী। তিনি কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং একটি আবাসন কোম্পানিতে কাজ করছিলেন। তার স্ত্রীরও একটা চাকরি ছিল এবং কাজের পর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়াশোনা করছিলেন। মিজান এবং তার স্ত্রী দেশত্যাগের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন। তিনি অব্যবস্থাপনা, ব্যাপক দুর্নীতি, যানজট ও লোডশেডিংয়ের বিষয়গুলো তুলে ধরলেন। একপর্যায়ে তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'এই দেশটা দিয়ে কী হবে, বেঁচে থাকার কি আর কোনো জায়গা নেই? আমরা কি শুধু ভোগার জন্যই এ দেশে জন্মগ্রহণ করেছি?'

গত এক দশকে প্রায় ৫% হারে ক্রমাগত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং এর ফলে বৃদ্ধি পাওয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির, যা বর্তমানে মোট জনসংখ্যার ৯-১০%, সঙ্গে সঙ্গে শহরের জীবন ধারণের অবস্থার ক্রমান্বয়ে অবনতি হয়েছে। আবাসন বাজার দিন দিন বড় হচ্ছে, পুরোনো ভবন এবং বাংলোগুলো ভেঙে ফেলা হচ্ছে। এর স্থানে আধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স গড়ে উঠছে। প্রতিদিন নতুন শপিংমল, রেস্টুরেন্ট, বিউটি পারলার এবং কফিশপ গড়ে উঠছে। এসব নতুন এবং আধুনিক ভবন আপাতত ভেতরে শীতল এবং বিলাসী স্থান তৈরি করছে, কিন্তু এগুলো তৈরি হচ্ছে বিশ্রাম নেওয়ার স্থানে। চলমান ভবন নির্মাণকাজের ফলে তৈরি হচ্ছে গোলমেলে শব্দ এবং অসহনীয় ধুলাবালি। ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা মানুষের চলাচলের গতি বৃদ্ধি করছে না, তার পরিবর্তে তৈরি হচ্ছে ক্রমবর্ধমান যানজট। যার ফলে শহরের যানবাহন বস্তুতপক্ষে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা রাস্তায় আটকে থাকে।

শহুরে পরিবেশের এক আমূল পরিবর্তনের কারণে বা এই পরিবর্তন সত্ত্বেও অনেকে তাদের কাঙ্ক্ষিত আধুনিক জীবনাচরণ পালন করতে পারেন না। ২০১০ সালের *ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস*-এর এক প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে নৈরাশ্য উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'অর্থনৈতিক শাসনপদ্ধতিতে দুর্বলতা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে, যা মধ্যবিত্ত শ্রেণির আকাঙ্ক্ষা এবং জীবনাচরণের মধ্যে সম্ভবত একটি দূরত্ব তৈরি করতে পারে' (শহিদুজ্জামান, *ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, ২১ মার্চ, ২০১০)। এ ধরনের পর্যবেক্ষণ এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী নবীনরাও প্রকাশ করেছেন। হৃদয় একজন ৩০ বছর বয়স্ক বাঙালি তরুণ এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। কুষ্টিয়া জেলায় স্নাতক পর্যায়ে অধ্যয়নের পর, পড়াশোনা করার জন্য ২০০০ সালে তিনি ঢাকায় আসেন। হৃদয়ও ঢাকায় তার জীবন নিয়ে খুবই হতাশ এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন বাংলাদেশে তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ডেভেলপার এবং নির্মাতারা কী ধরনের ঝুঁকি নেন, সে সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল আছেন। ভবন নির্মাতারা নিম্নমানের ভবন-নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভবন নির্মাণ নীতিমালা এবং নিরাপত্তা নির্দেশনাগুলো মেনে চলেন না।[৯] রাজধানীকে আরও বসবাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে কী করতে হবে, তা হৃদয়ের জানা আছে, কিন্তু তিনি মনে করেন এ ক্ষেত্রে সরকারের দক্ষতা ও ইচ্ছাশক্তির যথেষ্ট ঘাটতি আছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, ঢাকা শহর মারাত্মক ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত। এই শহর যদি ভূমিকম্পে আক্রান্ত হয়, তবে এর বাসিন্দাদের রক্ষা পাওয়ার সুযোগ নেই বললেই চলে। '৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে ৯০% ভবন ধসে পড়বে, তৎক্ষণাৎ ৪০ লাখ লোক মারা যাবে, ৪০ লাখ লোক আহত হবে বা মারা যাবে, এর থেকে ছাড়া পাওয়া সম্ভব না। শুধু ২০ লাখ মানুষ এই দুর্যোগে বেঁচে থাকবে। এটা একটা বৃহৎ বেদনাময় ঘটনা হবে।' যদিও হৃদয় বিবাহিত, তবে এই দম্পতির কোনো সন্তান নেই। ঢাকায় তারা কীভাবে একটি শিশুকে যথাযথভাবে লালন-পালন করতে পারবে? 'আমার সব বন্ধুই বিদেশ যাওয়ার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করছে, আমাদের এখানে থাকা উচিত নয়। আমাদের এখন কী করা উচিত? ... মানুষ অর্থ উপার্জন করছে এবং খরচ করছে, কিন্তু তাদের মানসিকতা সমস্যায় ভর্তি।'

পরিচয় নির্মাণ এবং একাত্মতার ধারণাসমূহ

গ্যালাপ জরিপ (আইসিপোভা এবং অন্যান্য, ২০১০) এটা নিশ্চিত করেছে যে কোনো স্থানে জন্মগ্রহণ করলেই ওই স্থানের সঙ্গে ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতা থাকবে, এমন দাবি করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে দেশপ্রেমের বোধ, যেমনটা সাঙমার নাম দিয়েছেন, জাগ্রত করা এবং লালন করা প্রয়োজন। জাতিসমূহ 'ক্রমাগত নির্মাণের মধ্যে থাকে' (অ্যান্ডারসন, ১৯৯১)। রাষ্ট্রগুলো এবং তাদের রাজনৈতিক এলিটরা আদর্শায়িত ভাষা, জাতীয় (এবং জাতীয়তাবাদী) শিক্ষাক্রম, কর আরোপ, (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) সংঘর্ষ এবং জোরপূর্বক একীভূতকরণ বা নির্মূলের মাধ্যমে একটি স্থায়ী প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, যার লক্ষ্য হচ্ছে 'জনগণকে নাগরিকে পরিণত করা' (ফক্স এবং মিলার-ইদরিস, ২০০৮ : পৃ. ৫৩৬-৫৩৭)। অন্যান্য আরও অনেক রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশেও জাতি-গঠন(বিস্তারিত দেখুন, অ্যান্ডারসন, ১৯৯১) বা বাংলাদেশীকরণ একটি জটিল এবং আলোচিত প্রক্রিয়া। স্বাধীনতা লাভের পর, বাংলাদেশের জনগণকে একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নিজেদের কল্পনা করার আহ্বান জানানো হয়েছিল (ভ্যান স্যান্ডেল, ২০০৯ : পৃ. ১৮৫)। কিন্তু আজ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদের প্রভাবশালী দুটি মডেলের কোনোটিই অপরটির ওপরে সর্বতোভাবে জয়ী হতে পারেনি। বাঙালি মডেল ধরে নেয় যে বাংলাদেশি জাতিসত্তার শিকড় নিহিত আছে পারস্পরিক অনুভূত বাঙালি জাতিসত্তা, সংস্কৃতি এবং ভাষার মধ্যে, কিন্তু সব বাংলাদেশিই জাতিগতভাবে বাঙালি নয়। তথাকথিত বাংলাদেশি মডেলের ভিত্তি এ ধারণার ওপর গড়ে উঠেছে যে, লাখ লাখ হিন্দু, খ্রিষ্টান বা বৌদ্ধ অধিবাসী থাকা সত্ত্বেও, বাংলাদেশিরা মূলত মুসলমান (করিম, ১৯৯৮; ব্যাল, ২০০৭; ভ্যান স্যান্ডেল, ২০০৯)। অধিকন্তু, উভয় মডেলই নাগরিকদের শুধু একটি অংশকে নিজের আওতাভুক্ত করছে। এর ফলে যারা এই আওতাভুক্তি থেকে বাদ পড়ছেন, তারা নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করেন। পার্থক্যের অন্য সূচকগুলো, যেমন: শ্রেণি, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এবং আঞ্চলিকতাবাদ ইত্যাদি জাতি-গঠনের প্রক্রিয়াটিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

সাক্ষাৎকারগুলো থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে নিরাপত্তা, নিরাপত্তাহীনতা এবং একাত্মতার মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। রাষ্ট্র, সরকার এবং সহনাগরিকদের সম্পর্কে হতাশা অধিকাংশ কথোপকথন এবং সাক্ষাৎকারের বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। আমাদের তথ্যদাতারা তাদের নিজেদের রাষ্ট্র সম্পর্কে নানা ধরনের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ জোর দিয়ে বলেছেন, তারা বিদেশে গিয়ে নতুন দক্ষতা অর্জন এবং অর্থ উপার্জন করে বাংলাদেশের জন্য ভালো কিছু করতে চান। অন্যরা বাংলাদেশের একটি অধিকতর ভালো ভবিষ্যতের বিষয়ে গভীরভাবে হতাশ এবং এ রকমটি ঘটার কোনো আশা পোষণ করেন না। রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পৃক্ততার বিষয়ে আমাদের বাঙালি মুসলিম এবং সংখ্যালঘু তথ্যদাতাদের কেউই অপরের চেয়ে এগিয়ে ছিল না। আকিদ একজন ১৯ বছর বয়সী মুসলিম ছাত্র এবং ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা

করেন। তিনি দেশত্যাগের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন ('আমি কোনোভাবেই বাংলাদেশে বাস করতে চাই না')। তিনি তার সহনাগরিকদের আচরণ এবং কার্যক্রমের প্রতি নিজের লজ্জাবোধের কথা বলছিলেন, 'তাদের মানসিকতা খুবই খারাপ, এটা আমি বলে বোঝাতে পারব না। আপনি দেশের রাজনীতি বা অন্য বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন। পরিস্থিতি নৈরাজ্যকর।'

রাষ্ট্র পরিচালনা এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিষয়ে সব তথ্যদাতাই একধরনের গভীর অতৃপ্তি প্রকাশ করেছেন। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে রাজনীতিবিদদের মনোযোগের বিষয়ে হৃদয় উপহাস প্রকাশ করেন। সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার পরিবর্তে তারা বাংলাদেশের 'সত্যি' জাতীয় ইতিহাসের মতো আদর্শিক বিষয় নিয়ে সংঘাতে সময় এবং অর্থের অপচয় করে। 'ঢাকা শহরে বিশ লক্ষ গাড়ি আছে, কিন্তু রাজনীতিবিদেরা বায়ুদূষণ নিয়ে কথা বলেন না; তারা জিয়া বা মুজিবের নাম পরিবর্তন নিয়ে ব্যস্ত।'[১০] রাজনীতিবিদেরা যে পরিমাণ টাকা নষ্ট করেন তা মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের কাজে বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করা যেত। হৃদয় মনে করেন, সরকারের পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পূরণ করা উচিত: খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা। কিন্তু তার মতে, সরকার এমনকি প্রথম চাহিদাটিই পূরণ করতে পারছে না: 'আমরা এই অবস্থায় বাস করছি, দেশ কোথায় যাচ্ছে? এ জন্যই আমি বিদেশে চলে যেতে চাই!... পেছনে ফিরে তাকাবার মতো সময় আমার নেই। আমার বাবা মারা গিয়েছেন, কিন্তু আমি এই বিষয়ে ভাবি না। আমি পরবর্তী প্রজন্ম নিয়ে শঙ্কিত।'

বহুল প্রচলিত দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, আমাদের তরুণ তথ্যদাতাদের মনে নিরাপত্তাহীনতার দৃঢ় বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। সঞ্জীব, ২৪ বছর বয়সী একজন হিন্দু তরুণ। তার বাড়ি মাগুরা জেলায় এবং তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। তিনি ২০০৪ সালে ঢাকা আসেন এবং অল্প কয়েক বছরেই ঢাকায় তার জীবন অসহনীয় হয়ে ওঠে। তিনি বিশ্বাস করেন, তার পড়াশোনার বিষয়— বায়োকেমিস্ট্রি— তাকে বিদেশে যেতে সাহায্য করতে পারে। তবে তিনি বিদেশে চলে যান, এটা তার বাবা-মা চান না। তিনি তার দেশের প্রতি কৃতজ্ঞতাও অনুভব করেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বিদেশে চলে যেতে ইচ্ছুক। তার এই সিদ্ধান্তের পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে, যার মধ্যে আছে ব্যাপক এবং ক্রমবৃদ্ধিমান দুর্নীতি, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার অভাব এবং নৈতিকতার পুরোদস্তর অনুপস্থিতি। রুবি, ২৪ বছর বয়সের একজন তরুণী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তিনিও হতাশা ও নিরাশার কারণ হিসেবে ব্যাপক দুর্নীতিকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন, 'যখন আমরা, বন্ধুরা একসঙ্গে আড্ডা দিই, তখন আমরা কীভাবে বা কী কাজ করে দেশের জন্য কাজ করতে পারি তা নিয়ে

আলোচনা করি। কিন্তু, দুর্নীতির মতো ব্যাপক সমস্যাটির কোনো সমাধান আমরা খুঁজে পাই না।'

রুবির গল্প আমাদের অন্য মুসলিম তথ্যদাতাদের গল্প থেকে কয়েকটা দিক থেকে ভিন্ন। একজন নারী এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী একটি আদিবাসী গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে তাকে এমন কিছু নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হতে হয়, যা অন্যান্য মুসলিম পুরুষ তথ্যদাতা সম্মুখীন হয় না। রুবির আত্মীয়রা ধনী। তার দাদা একজন বিখ্যাত ভূস্বামী ছিলেন। তার বাবা একজন সরকারি চাকরিজীবী এবং মা একটি ব্যাংকে কাজ করেন। তবুও তিনি বিদেশে গিয়ে একজন ব্যারিস্টার হতে চান, বিশেষত যুক্তরাজ্য গিয়ে। তার গন্তব্যের তালিকায় অস্ট্রেলিয়া ও নরওয়েও আছে। তার স্বপ্ন নির্মাণে একজন নারী এবং আদিবাসী ত্রিপুরা গোষ্ঠীর একজন সদস্য হওয়ার অভিজ্ঞতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তার বাবা-মা সচ্ছল, তবে একজন ত্রিপুরা, হিন্দু এবং নারী হিসেবে তিনি 'সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণিতে' অবস্থান করেন। তিনি বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিকায়ন এবং 'তার নিজের লোকদের' প্রতি সামরিক বাহিনীর আচরণের বিষয়ে তিনি শঙ্কিত। এই সাক্ষাৎকারের মাত্র কয়েক দিন আগেই তাদের ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং ভয়ে তার বাবা-মাকে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল। একজন নারী হিসেবে তাকে প্রায়ই সামরিক বাহিনীর ইভ টিজিংয়ের শিকার হতে হয় এবং তার মতে, এমনকি মাঝে মাঝে তারা মেয়েদের ধর্ষণ ও হত্যাও করে। সর্বদা বিরাজমান এই হুমকি তার মধ্যে ক্রমাগত উৎকণ্ঠার জন্ম দিয়েছে।

কিছু তরুণ-তরুণী, বিশেষত যাঁরা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্য, একটি আপাতবিরোধী ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন: দেশ ত্যাগ করা এবং তাঁদের নিজেদের সম্প্রদায়ের জন্য ভালো কিছু করা। উদাহরণস্বরূপ, অভিজিত ও নলীন দুজন ২২ বছর বয়সী দরিদ্র, নিম্নবর্ণের হিন্দু ছাত্র এবং তাঁরা দুজনই তাঁদের কর্তব্যের ওপর জোরারোপ করেছিলেন, '২২ থেকে ২৩টি হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামের আমিই একমাত্র ব্যক্তি, যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি ...। আমার বিদেশ যাওয়ার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে এই সম্প্রদায়ের জন্য কিছু একটা করা' (অভিজিৎ)। হিন্দু বা মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মেধাবী তরুণ-তরুণী, যাঁরা যথাযথভাবে শিক্ষা পান না, তাঁদের বিষয়ে নলীন চিন্তিত, 'আমার একান্ত ইচ্ছা, যদি আমি তাদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দিতে পারতাম, কিন্তু আমি তা পারি না। তাই আমি দ্রুত একটি চাকরি খুঁজে পাওয়ার আশা করছি এবং চাকরি পেলে আমি তাদের জন্য কিছু একটা করতে পারব।' কয়েকজন তথ্যদাতা উল্লেখ করেছেন যে যাঁরা অভিবাসনের ইচ্ছা পোষণ করেন, তাঁরা দেশে ফিরে এসে দেশের জন্য কিছু করারও ইচ্ছা রাখেন। তবে বাস্তবে, যেমনটা তাঁরা বিশ্বাস

করেন, অল্প কয়েকজনই ফিরে আসবেন। এই বিষয়ে অভিজিৎ তাঁর হতাশা প্রকাশ করেছেন এভাবে, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক বিদেশে যান, কিন্তু তাঁরা দেশে ফিরে আসেন না। অন্যদিকে কিছু কিছু শিক্ষক বিদেশ থেকে ভালো শিক্ষা গ্রহণ করে দেশে ফিরে আসার পর বিভিন্ন এনজিওর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। অর্জিত জ্ঞান আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই তাঁদের কর্তব্য ছিল, কিন্তু তাঁরা তা করেন না। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান হ্রাস পাচ্ছে।'

এই প্রবন্ধের শুরুতে এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে মুক্তিযুদ্ধকালীন এবং মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর প্রজন্মের মধ্যে একটি প্রজন্মগত পার্থক্য রয়েছে, যাঁরা মনে করেন মুক্তিযুদ্ধের প্রতিশ্রুতিগুলো এখনো পূরণ করা হয়নি। যদিও আমাদের কয়েকজন তথ্যদাতা জনের মতোই জাতীয় স্বার্থের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করেন না, তবে শাহবাগের সাম্প্রতিক গণবিক্ষোভ দেখে ধরে নেওয়া যায়, তরুণ-তরুণীরা বাঙালি জাতীয়তাবাদেরই অনুসারী। তবে এটা পরিষ্কার নয় যে আমাদের তথ্যদাতারা এবং তাদের মতো অন্য তরুণ-তরুণীরা এই গণবিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন কি না এবং এই গণবিক্ষোভ তাঁদের কাছে কী ধরনের গুরুত্ববহ।

স্বপ্ন অস্পষ্ট হওয়া উচিত!

বাংলাদেশি স্থানীয় এক গবেষক অনেকের স্বপ্নের দেশের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'বাংলাদেশিদের স্বপ্ন অস্পষ্ট হওয়া উচিত।' তার মতে, ভবিষ্যতে কী হতে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে অধিকাংশ বাংলাদেশিরই কোনো ধারণা থাকে না। 'অনেকের পরিকল্পনা বিভিন্ন কারণেই কখনো বাস্তবে রূপান্তরিত নাও হতে পারে।' ফলে, বিকল্প কোনো কিছু আছে কি না সে সম্পর্কে সব সময়ই মানুষকে সজাগ থাকতে হয়। স্বপ্নের দেশের বিষয়ে অস্পষ্ট ধারণা থাকলেও, অধিকাংশ তথ্যদাতাই তাঁদের ইচ্ছাগুলো সম্পর্কে স্পষ্টত ওয়াকিবহাল। তাঁদের স্বপ্নের দেশ তাঁদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সততা, কর্মসংস্থান, ভালো বেতন, মনের শান্তি, ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং সম্মানের পরিসর দিতে পারবে। এ রকম অবস্থা নিশ্চিত করতে পারে, এমন অনেকগুলো দেশের নাম তাঁরা উল্লেখ করেন : সুইজারল্যান্ড, জাপান, স্পেন ও কানাডা; এসব রাষ্ট্রকেই 'উন্নত' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যদিও ইংরেজিভাষী দেশগুলো তুলনামূলক জনপ্রিয়, তবে অনেক তথ্যদাতাই তাঁদের ইংরেজির দক্ষতা এবং তারা কোনো ইংরেজি ভাষার পরীক্ষা পাস করতে পারবেন কি না সে বিষয়ে সন্দিহান। ফিনল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, স্পেন, নেদারল্যান্ডস ইত্যাদি দেশের নামও কথোপকথনের সময় তথ্যদাতারা হরহামেশাই উল্লেখ করেছেন।

আমার বন্ধুর মেয়ে উইনা, তাঁর ভবিষ্যৎ পড়াশোনার জন্য তাঁর বাবা-মা যে রাষ্ট্র ঠিক করেছেন—ভারত—সে বিষয়ে স্পষ্টত ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি

আমার কাছে অভিযোগ করেছেন যে যদি পড়াশোনার জন্য তিনি ইউরোপকে বেছে না নেন তবে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে নিয়ে উপহাস করবেন এবং কানাডা বা যুক্তরাষ্ট্র হলে তা আরও ভালো হয়। একই সঙ্গে তিনি এটাও বুঝতে পারছেন যে ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হলে তাঁর একটি বৃত্তির প্রয়োজন। তিনি বর্তমানে একটি বৃত্তির আবেদনের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছেন এবং জার্মান এবং ফ্রেঞ্চ ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করছেন। উইনা বিদেশ যেতে অনড় এবং এর ব্যবস্থা করতে বাস্তবিক অর্থেই প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তাঁর গল্প স্বপ্নের গন্তব্যের একটি স্পষ্ট ক্রম আমাদের সামনে তুলে ধরে।

তারপরও বাস্তববাদী আকাঙ্ক্ষা এবং দুষ্প্রাপ্য কল্পনার মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য থেকেই যায়। এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ তরুণ-তরুণীরই কোনো সুপরিকল্পিত কর্মপরিকল্পনা এবং প্রয়োজনীয় সংগতি নেই। কারও কারও একটি স্বপ্নের দেশ থাকে, কিন্তু কারণটা বেশ পরিষ্কার নয়। ২৪ বছর বয়সী লিসা আয়ারল্যান্ড যেতে ইচ্ছুক। কেন সে আয়ারল্যান্ড যেতে চায়, এমন প্রশ্ন করলে সে হাসিসমেত উত্তর দেয়, 'আমি জানি না; একটি কারণ হতে পারে এটি একটি দ্বীপরাষ্ট্র। আমি এটা পছন্দ করি কিন্তু কেন তা জানি না; এটি একটি নির্জন জায়গা এবং খুবই নিরুপদ্রব।' ১৯ বছর বয়সী আকিদ স্পেন যাওয়ার স্বপ্ন দেখে, কিন্তু কবিরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় নেদারল্যান্ডসের কথা শুনে সে তাঁর মত পাল্টায়, 'আগে আমি স্পেন যেতে চাইতাম; কিন্তু আপনার কাছ থেকে শোনার পর, এখন নেদারল্যান্ডস যাওয়ার ইচ্ছাও আমার হচ্ছে, আমার নেদারল্যান্ডস যেতে খুব ইচ্ছা করছে।' মিজানের স্বপ্ন ফিনল্যান্ড যাওয়ার। তিনি পত্রিকায় ফিনল্যান্ড সম্পর্কে পড়েছেন এবং অন্য শিক্ষার্থীদের এ সম্পর্কে বলতে শুনেছেন। তাঁর কাছে ফিনল্যান্ড অর্থ একটি শান্ত এবং জনশূন্য রাষ্ট্র, যেখানে তিনি বাংলাদেশের চেয়ে বেশি টাকা উপার্জন করতে পারবেন। তিনি ঠান্ডা আবহাওয়াও পছন্দ করেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেন, 'সেখানে বড় মাঠ এবং খোলা জায়গাসহ নদী থাকবে, যেখানে আমি আমার অবসর কাটাতে পারব। ...এখানে আমার সময়ও নাই, আবার সুযোগও নাই; কিন্তু আমি মনে করি সেখানে আমার হাতে অবসর সময় থাকবে।'

হৃদয়ের (৩০ বছর বয়স এবং বিবাহিত) বিষয়টি কিছুটা ভিন্ন। তাঁর একটি স্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা ছিল, 'আমি মধ্যপ্রাচ্য বা মালয়েশিয়ার মতো কাছাকাছি কোনো স্থানে যেতে চাই, যেখানে আমার মতো লোকের জন্য চাকরি আছে। আমি কাতার বা এ রকম কোনো একটি দেশে চাকরি পেতে পারি ... প্রথমে মালয়েশিয়া যাওয়াই ভালো, যেখানে কোনো ঝক্কিঝামেলা ছাড়া আমি প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারি, সেখান থেকে আমি সুইজারল্যান্ড যেতে পারি।'

উপসংহার

গ্যালাপের (আইসিপোভা এবং অন্যান্য, ২০১০-২০১১) মতো বিস্তৃত জরিপ থেকে এটা নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে যে বর্তমানে আন্তদেশীয় অভিবাসনের, বিশেষত 'বৈশ্বিক দক্ষিণে', একটি ক্রমবর্ধমান এবং ব্যাপকভাবে বিস্তৃত আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান। এই প্রবন্ধে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে এই ধারা বাস্তবিক অর্থে বড় ধরনের অভিবাসনকে নির্দেশ করে না। ঢাকার শিক্ষিত (নিম্ন) মধ্যবিত্ত তরুণ-তরুণীদের মতামতের ভিত্তিতে এই প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে এসব তরুণ-তরুণীর মধ্যে অনেকের জন্য আন্তদেশীয় অভিবাসনের আকাঙ্ক্ষার এই বহিঃপ্রকাশ হতাশা এবং অসম্পৃক্ততাবর্তমানের একটি রূপকমাত্র। অভিবাসন গতিবিধির কর্মকাঠামোর মধ্যে এসব হতাশাকে ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে, এই প্রবন্ধে একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দ্রুত নগরায়ণ এবং শিক্ষায় ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগের ফলে বিকাশমান (নিম্ন) মধ্যবিত্ত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে 'আধুনিক' জীবনাচরণের আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিচ্ছে, যা তাঁদের নিজেদের দেশে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে একধরনের অসম্পৃক্ততা তৈরি হচ্ছে।

কীভাবে স্থানীয় জীবনাচরণের (পুনঃ) মূল্যায়ন সাংস্কৃতিকভাবে অনুবিদ্ধ বিদেশের কল্পনার সঙ্গে সম্পর্কিত, তার ওপর এই প্রবন্ধে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। প্রায় সব তথ্যদাতাই উল্লেখ করেছেন যে স্থানীয় আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও অস্তিত্বের নিরাপত্তাহীনতার কারণেই তারা বিদেশে 'নিরাপদ' স্থানে যেতে চান, যেখানে তাঁদের স্বপ্নগুলো পূরণ হতে পারে। তারা সবাই বাংলাদেশের প্রতি একধরনের অনীহা পোষণ করেন, যা তাঁরা মেগাসিটি ঢাকার অসহনীয় পরিবেশ, লাগামহীন নগরায়ণ নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা, ব্যাপক দুর্নীতি এবং সর্বোপরি নৈতিকতার অনুপস্থিতির কাহিনিগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ করেন।

আমাদের তথ্যদাতা তরুণ-তরুণীরা বাংলাদেশে যা অর্জন করতে পারেন না, তা অর্জন করার জন্য (উন্নত) বিদেশে যেতে চান (দেখুন, গার্ডেনার, ১৯৯৩, ২০০৮)। 'উন্নত উত্তরে' তাঁদের স্বপ্নের দেশগুলোকে তাঁরা বৈষম্য, সংঘর্ষ ও দুর্নীতিহীন পরিষ্কার এবং উন্মুক্ত স্থান হিসেবে কল্পনা করেন; যেখানে মানুষ একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যেখানে প্রচুর এবং উপযুক্ত চাকরি, যথাযথ ও উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত উন্নয়নের প্রয়োজনীয় সুযোগ রয়েছে। আমাদের এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী কতজন শেষ পর্যন্ত বিদেশে যেতে পেরেছেন, তা আমাদের জানা নেই; তবে এটা বলে শেষ করা নিরাপদ যে তাঁদের অধিকাংশকেই, বৈশ্বিক দক্ষিণে অন্যান্য কয়েক লাখ লোকের মতোই প্রতিশ্রুতিপূর্ণ বিশ্ব, প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ স্বদেশ এবং কখনো পূরণ না হওয়া ব্যক্তিগত স্বপ্ন নিয়েই বাঁচতে হবে (আরও দেখুন, অচিলা এবং অচিলা, ২০০৬)।

তথ্যসূত্র :

১. এই গবেষণা প্রকল্পের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং সহযোগিতার জন্য আমি এস হাজং এবং এইচ কবিরের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই প্রবন্ধের অধিকাংশ সাক্ষাৎকার কবির গ্রহণ করেছেন। তবে এর বিষয়সূচি আমারই তৈরি করা। ইডেন বার্টেলস, ইরিলা গ্রাসিয়ানি, ডাইয়েনকি হন্ডিয়াস, হুমায়ুন কবির, পেগি লেভিট, লোরেন নেন্সেল, ক্যাথিনকা সিনহা ক্যার্কহফ, রুস উইলিয়ামস এবং অজ্ঞাতনামা পিয়ার রেফারারদের মূল্যবান মতামতের জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রকল্পটির অর্থায়ন করেছে ভিইউ ইউনিভার্সিটি আমস্টার্ডামের সেন্টার ফর কম্পারেটিভ সোশ্যাল স্টাডিজ (সিসিএসএস)।

২. সাব-সাহারান আফ্রিকার ৩৬ শতাংশ মানুষ বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এশীয় দেশগুলোতে অভিবাসনে আগ্রহী মানুষ মাত্র ১০ শতাংশ, কিন্তু তার অর্থ প্রায় ২৫০ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক।

৩. অধিকাংশ সাক্ষাৎকার বাংলায় গ্রহণ করা হয়েছে এবং তারপর ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে। তথ্যদাতাদের প্রকৃত পরিচয় গোপন করার জন্য আমি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছি।

৪. ডাচ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থায়, প্রাতিষ্ঠানিক নৈতিকতা কমিটি সেভাবে চোখে পড়ে না। এ কারণেই গবেষককে গবেষণার নৈতিক দিকটির দিকে ক্রমাগত দৃষ্টি রাখতে হয়। সব তথ্যদাতাই এই গবেষণার লক্ষ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং জানতেন যে তাঁদের প্রকৃত পরিচয় গোপন করা হবে।

৫. ১৯৯০-এর দশকের প্রথম থেকে বাংলাদেশে আমার অধিকাংশ গবেষণা বাংলাদেশের অ-মুসলিম, অ-বাঙালি ক্ষুদ্র আদিবাসী গোষ্ঠী গারোদের কেন্দ্র করে ছিল (উদাহরণস্বরূপ দেখুন, ব্যাল, ২০০৭)।

৬. বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি শহরে পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে আবু আহসান দক্ষতার সঙ্গে দেখিয়েছেন, কীভাবে কলেজে শিক্ষা গ্রহণকে বৃহৎ অর্থে আধুনিকায়ন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চলিষ্ণুতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষিত হওয়ার ফলে ব্যক্তি সমাজে সভ্য অবস্থান লাভ করেন এবং একই সঙ্গে একটি শিক্ষিত 'আধুনিক' জীবনাচরণ এবং ভোগ ধারার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন (আহসান, ২০০৯)।

৭. দেখুন, http://www.gallup.com/poll/153992/150-Million-Adults-Worldwide-Migrate

৮. দেখুন, http://www.indexmundi.com/facts/indicators/ SE.ADT.LITR.ZS/compare#country = bd

৯. নিম্নমানের নির্মাণকাজের একটি বীভৎস উদাহরণ হচ্ছে রানা প্লাজা ধস। এটি ঢাকার সাভারে অবস্থিত ৮ তলা একটি ভবন, যা ২৪ এপ্রিল, ২০১৩ সালে ধসে পড়ে। এই ভবনে ব্যাংক, দোকান এবং একটি তৈরি পোশাক কারখানা ছিল। এই ভবন ধসে ১১০০ মানুষ মারা যায় এবং প্রায় ২৫০০ মানুষ আহত হয়। হতাহতের অধিকাংশই ছিলেন নারী তৈরি পোশাকশ্রমিক।

১০. শেখ মুজিবুর রহমান (মুজিব) ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের (১৯৭১) প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতা। ১৯৭৫ সালে তাঁর হত্যার তিন মাস পর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করেন। ১৯৮১ সালে জিয়াকে হত্যা করা হয়। মুজিবের মেয়ে শেখ হাসিনা (আওয়ামী লীগের বর্তমান নেতা), জিয়ার বিধবা স্ত্রী খালেদা জিয়া (বিএনপির নেতা) এবং তাঁদের

দলের সদস্যরা একে অপরের সঙ্গে ক্রমাগত সহিংসতায় লিপ্ত রয়েছেন। তাদের বিবাদের বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে জাতীয় বিমানবন্দরের নামকরণ, স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ ইত্যাদি।

অনুবাদক : গোলাম মুস্তাফা।

তথ্যপঞ্জি

Ahasan, A., 2009. "My family didn't send me to school to run a 'betel leaf shop'!": the cultural production of education and educated work in Domar, Bangladesh. Unpublished master thesis (M.A.) Sussex theses M 2597. Anthropology of Development and Social Transformation. University of Sussex.

Ali, S., 2007. "Go west young man": the culture of migration among Muslims in Hyderabad, India. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 33 (1), 37–58.

Anderson, B., 1991. *Imagined communities*. London: Verso.

Appadurai, A., 1996. *Modernity at large: cultural dimensions of globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Baas, M., 2009. Imagined mobility: migration and transnationalism among Indian students in Australia. Dissertation (PhD). University of Amsterdam.

Bal, E., 2007. *They ask if we eat frogs: Garo ethnicity in Bangladesh*. Singapore: ISEAS.

Carling, J., 2002. Migration in the age of involuntary immobility: theoretical reflections and Cape Verdean experiences. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 28 (1), 5–42.

Castles, S., 2000. International migration at the beginning of the twenty-first century: global trends and issues. *International Social Science Journal*, 52 (165), 269–281.

Esipova, N., Ray, J., and Srinivasan, R., 2010/2011. The world's potential migrants: who they are, where they want to go, and why it matters. 2010–2011, Gallop. Available from: http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/the-worlds-potential-migrants [Accessed 19 July 2011].

Fox, J. E. and Miller-Idriss, C., 2008. Everyday nationhood. *Ethnicities*, 8, 536–563. Gardner, K., 1993. Desh-bidesh: Sylheti images of home and away. *Man: A Monthly Record of Anthropological Science*, 28 (1), 1–16.

Gardner, K., 2008. Keeping connected: security, place and social capital in a "Londoni" village in Sylhet. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 14, 477–495.

Gurjar, B.R., *et al.*, 2008. Evaluation of emissions and air quality in megacities. *Atmospheric Environment*, 42, 1593–1606.

Horváth, I., 2008. The culture of migration of rural Romanian youth. *Ethnic and Migration Studies*, 34 (5), 771–786.

Jeffrey, G., 2009. Fixing futures: educated unemployment through a North Indian lens. *Comparative Studies in Society and History*, 51, 182–211.

Jónsson, G., 2008. *Migration aspirations and immobility in a Malian Soninke village*. Working Paper No. 10. International Migration Institute, University of Oxford.

Kandel, W. and Massey, D. S., 2002. The culture of Mexican migration: a theoretical and empirical analysis. *Social Forces*, 80 (3), 981–1004.

Karim, L., 1998. Pushed to the margins: adivasi peoples in Bangladesh and the case of Kalpana Chakma. *Contemporary South Asia*, 7 (3), 301–316.

King, R. and Skeldon, R., 2010. Mind the gap' integrating approaches to internal and international migration. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 36 (10), 1619–1646.

Levitt, P. and Glick Schiller, N., 2004. Conceptualizing simultaneity: a transnational social field perspective on society. *International Migration Review*, 38 (3), 1002–1039.

Lewis, D., 2011. *Bangladesh: politics, economy and civil society*. Cambridge: Cambridge University Press.

Massey, M., *et al.*, 1993. Theories of international migration: a review and appraisal. *Population and Development Review*, 19 (3), 431–466.

O'Reilly, K., 2012. *Ethnographic methods*. 2nd ed. London: Routledge.

Osella, C. and Osella, F., 2006. Once upon a time in the West? Stories of migration and modernity from Kerala, South India. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 12, 569–588.

Rahman, M. M. and Alamgir Kabir, M., 2012. *Moving to Europe: Bangladeshi migration to Italy*. Series: ISAS Working Papers 142.

Institute of South Asian Studies (ISAS), Singapore.

Rudnick, A., 2009. *Working gendered boundaries: temporary migration experiences of Bangladeshi women in the Malaysian export industry from a multi-sited perspective*. Amsterdam University Press.

Sabur, S., 2013. It is the state who needs the holy trinity of nation-nationality-nationalism and a common enemy. *Alal O Dulal*, 6 May. Available from: http://alalodulal.org/2013/05/06/seuty-sabur/ [Accessed 28 Aug 2013].

Ullah, A. A., 2010. *Rationalizing migration decisions: labour migrants in east and southeast Asia*. Farnham: Ashgate.

Van Schendel, W., 2009. *A history of Bangladesh*. Cambridge University Press.

Zeitlyn, B., 2012. Maintaining transnational social fields: the role of visits to Bangladesh for British Bangladeshi children. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 38 (6), 953–968.

সমাজচিন্তা

কালান্তরের ঘূর্ণিপাকে

আবুল মোমেন

১.

ইংরেজের সংস্পর্শে এসে বাঙালির জীবনে ভেতরে-বাইরে পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বিখ্যাত 'কালান্তর' প্রবন্ধে তিনি ইংরেজকে 'নব্য য়ুরোপের চিত্তপ্রতীক' এবং 'চিত্তদূতরূপে' আখ্যায়িত করেছেন। তিনি লিখেছেন ইংরেজের আগমনের ফলে 'য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল।' একে তিনি তুলনা করেছেন আকাশ থেকে নামা বৃষ্টিধারার সাথে যা 'ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিভিন্নরূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে।'

পশ্চিমের এই শক্তি এল কিসের জোরে? কবি মনে করেন তাদের 'সত্যসন্ধানের সততায়'। তারা প্রতিদিন জয় করেছে 'জ্ঞানের জগৎকে, কেননা তার বুদ্ধির সাধনা বিশুদ্ধ, ব্যক্তিগত মোহ থেকে নির্মুক্ত।' আমাদের চিত্ত প্রাচীন বিশ্বাসের প্রাচীরে আবদ্ধ এবং নতুনের প্রতি সন্দিগ্ধ থাকলেও 'জ্ঞানের বিশ্বরূপ' এবং বুদ্ধির 'সর্বব্যাপী ঔৎসুক্য' সম্পূর্ণ ঠেকানো যায়নি। মানুষের জন্মগত আর 'পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলে' যে অধিকার এবং তার সৃষ্ট অচলায়তনে বাঁধা যে সমাজ বহুকাল স্থবির হয়ে থেকে স্থাবর হয়ে পড়েছিল তাতে ঘা লাগল, ফাঁকফোকর তৈরি হলো। এই কালান্তরের আগে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাঙালি অষ্টাদশ শতাব্দী নাগাদ 'তাহার গ্রাম্য জীবনের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে খুশি হইয়াই থাকিত।'

এবারে ইংরেজের প্রভাব পড়ল বাঙালি জীবনাচরণে এবং বুদ্ধির জগতে, অর্থাৎ বাইরে ও ভেতরে। ইংরেজি ভাষায় দক্ষ, ইংরেজের পোশাকে অভ্যস্ত, ইংরেজের চালচলনের অনুরক্ত একটি শ্রেণি তৈরি হয়। তাদের, এবং তাদের

বাইরেও অনেকের, মন থেকে সনাতন বিশ্বাস ও সংস্কারের ঘোর কাটতে শুরু করে—ক্ষুদ্র একটি অংশের মধ্যে সন্দেহ-সংশয়, জিজ্ঞাসা-কৌতূহল, এমনকি জন্মায় সাহস, যা প্রশ্ন ও প্রত্যাখ্যান করে সনাতন প্রথাকে এবং নতুন ও বিকল্পকে গ্রহণ ও সৃজন করার জন্য তৎপর হয়। রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ধর্ম ও শাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে ধর্মের নামে সমাজের অমানবিক নিষ্ঠুর কিছু প্রথা রদ করতে চেয়েছিলেন। সতীদাহ প্রথা বন্ধের উদ্যোগ দ্রুত সাফল্য পেয়েছিল মূলত ইংরেজ শাসকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়; বিধবাবিবাহ চালু করা শাসক নয় হিন্দুসমাজের দায় হওয়ায় তা ঘটেছে ধীরে, বৃহত্তর সমাজের প্রায় অগোচরে, এবং বিপরীতে, বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে—সমাজ বা শাসক কখনো অনুমোদনের স্পষ্ট কোনো বিধান দেয়নি।

তবে সনাতন সমাজের সঙ্গে এ দুজনের বিতর্ক ও বিরোধ পুরোনোকে চ্যালেঞ্জ করার সাহসিকতার দৃষ্টান্তই কেবল নয়, এ সূত্রে তাঁদের কর্মজীবন বাঙালির মানসে প্রতিবাদ-প্রত্যাখ্যানের সাহস সঞ্চার করেছে। এ সূত্রে ডিরোজিও ও তাঁর ইয়ং বেঙ্গলদের মুক্তচিন্তা ও আচার বিরোধিতার ঐতিহাসিক গুরুত্বও মনে রাখা দরকার। এর বাইরে বাঙালির পরিণত মননসাধনায় বঙ্কিম-ভূদেব-অক্ষয় দত্তের মতো চিন্তাবিদদের ধর্ম থেকে বিজ্ঞানের যুক্তিনির্ভর রচনাসমূহ, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি প্রমুখের মতো প্রথা ভাঙা কর্মীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ পাথেয় হয়ে থাকল।

মুসলমান সমাজ ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজের প্রভাবে এসেছে আরও প্রায় এক শ বছর পরে। তবে মূলত চাষি, জোলা ও অন্যান্য বৃত্তিজীবী নিয়ে গঠিত খাস স্থানীয় মুসলিম সমাজে কখনো আরবি ভাষা এবং কোরআন ও সুন্নাহভিত্তিক শাস্ত্রচর্চা গভীরতা পায়নি। আর আশরাফ মুসলমানের উদ্ভব মূলত এ দেশে আগত ফারসি ও তুর্কিভাষী শাসক-প্রশাসক, প্রচারক-সাধক, সৈনিক-বণিক এবং তাদের বংশধর হিসেবে বা সান্নিধ্য লাভের সূত্রে। এটিও অনারব সংস্কৃতি যারা অভিবাসী জীবনে মূলত ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারই বহন করেছে। আর স্থানীয় মানসে এর স্বাঙ্গীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে পরবর্তীকালে আরবি-ফারসির দোসর উর্দুভাষার বিকাশ, বিশেষত এ ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হলে এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাবহির্ভূত মুসলমানদের জন্য উর্দু চালু হলে সর্বভারতে ক্রমে মুসলিম সমাজ এ ভাষাকে গ্রহণ করে নেয়। তবে এই কৃষিপ্রধান দেশের প্রকৃতির প্রাচুর্যে ও খামখেয়ালিতে অভ্যস্ত গ্রামীণ সমাজের পক্ষে তার চিরায়ত লোকবিশ্বাস ও লোকাচারের সংস্কৃতি ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না—সে হিন্দু কি মুসলমান হোক।

২.

উচ্চতর বিদ্যাচর্চা, যার অংশ হিসেবে বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র গভীরভাবে পঠন ও অনুশীলন চলে তা গ্রামসমাজের পক্ষে ধারণ লালন সম্ভব নয়, এটি সারা বিশ্বে নগরেই ঘটেছে এবং উচ্চতর বিদ্যাপীঠে। ইতালীয়, ইউরোপীয় এবং ইংলিশ রেনেসাঁসের ইতিহাসও এ সাক্ষ্যই দেয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় উৎপাদন ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোর পরোক্ষ ভূমিকা বা পৃষ্ঠপোষকতার। মুসলিম ইতিহাসেও বাগদাদ বা কর্ডোভার মতো নগরীতেও ইতিহাস একই ধারাতেই চলেছে।

কলকাতা ইংরেজদের পত্তন করা নগরী এবং এখানেই গড়ে ওঠে যুগপৎ উচ্চতর বিদ্যাপীঠ এবং অর্থনৈতিক নবজোয়ারের কেন্দ্র। তা ছাড়া রাজধানী হিসেবে এ নগরই ক্ষমতার কেন্দ্র। এই ত্র্যহস্পর্শে তাই এখানেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে একটি রেনেসাঁসের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু তা সমগ্র বাংলায় ছড়াতে না পারার পেছনে দুটি প্রধান কারণ বলা যায়—কলকাতার মতো তখন জঙ্গম নগর আর ছিল না বাংলায়, যাওবা ছিল সেগুলো তো বিশাল গ্রামবাংলার তুলনায় নগণ্য, তদুপরি গ্রাম্যতার দ্বারা আবিষ্ট। দ্বিতীয়ত, বাংলার জনসংখ্যার প্রায় সমান অন্য অংশ মুসলমানের মধ্যে ঐতিহাসিক কারণেই ইংরেজের প্রভাব ঘটেছে পরে এবং একটু ভিন্নভাবে। আমরা দেখব প্রথম প্রজন্মের ইংরেজি শিক্ষিত ও ইংরেজি-প্রভাবিত এদেশি মুসলমান, যেমন নবাব আবদুল লতিফ বা সৈয়দ আমির আলী বাঙালি মুসলমানের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে বিভ্রান্ত ছিলেন। আর যখন খাঁটি বাঙালি মুসলিম পরিবারের উচ্চশিক্ষিত চিন্তাবিদেরা নিজ সমাজের মধ্যে যুক্তি ও জিজ্ঞাসার আলোড়ন তুলতে চাইলেন—তাও কলকাতার জাগরণের প্রায় শত বছর পরে—তারা টিকে থাকার ও লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মতো সামাজিক সমর্থন পায়নি। মুসলিম সাহিত্যসমাজের উদ্যোগে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন হয় ১৯২৬ সালে, তখন থেকে ২০১৬ প্রায় ৯০ বছরের ব্যবধান। এ বিস্মৃত সময়ের মধ্যে দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু বলা যাবে না যে সমানতালে সমাজমানসেরও গুণগত পরিবর্তন হয়েছে।

যেকোনো পরিবর্তনের ভেতর-বাহির থাকে এবং ভেতরেরও ভেতর আরও ভেতর থাকতে পারে। বাইরের পরিবর্তনগুলো আমরা দেখতে পাই, প্রথমে এ পরিবর্তনেও বাধা আসে, কিছু সমাজ থেকে কিছু সংস্কারবংশ। কিন্তু প্রয়োজনে স্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থনৈতিক বিবেচনায় মানুষ রুচি ও অভ্যাস পরিবর্তন করে। ধুতি-লুঙ্গি ছেড়ে প্যান্ট-শার্ট স্যুট পরা, নাপিতের ক্ষুরের পরিবর্তে ব্যক্তিগত রেজর ব্লেডের ব্যবহার, বাড়িতে টেবিলে বসে খাওয়ার প্রচলন, কঙ্কাল ঘেঁটে ডাক্তারিবিদ্যা পড়া, মেয়েদের বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন এমনি অজস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

এমন কিছু পরিবর্তনও এসেছে, যার সাথে মনকে অর্থাৎ ভেতরকে মানিয়ে নিতে হয়েছে। আগে মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের গলিতে বদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত ছিল—সুনীতিকুমারের ভাষায় গ্রাম্যতায় আবদ্ধ জীবন। কিন্তু এবার একদল পড়তে গেল গ্রাম ছেড়ে কাছের সদরে, কেউ আরও দূরে বড় শহরে, অনেকেই মহানগরী কলকাতায়। একই ঘটনা চাকরির ক্ষেত্রেও ঘটল। দিনে দিনে এ সংখ্যা বেড়েছে এবং এদের ব্যাপ্তি উপমহাদেশব্যাপী ছড়াতে থাকল। পাটনা, রাঁচি, লক্ষ্ণৌ, কাশী, ক্রমে কাছাড়, শিলচর, রেঙ্গুনে বাঙালি বসতি গড়ে উঠেছিল উল্লেখযোগ্য হারে। রামমোহন-দ্বারকানাথ ঠাকুর সমুদ্রযাত্রা করে ইউরোপে এবং পশ্চিমযাত্রীর পথও খুললেন। এভাবে বাঙালি জীবনের স্থবিরতা কেটে পরিসর ও গতি বাড়ল। তারও চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো স্বধর্মের ভিন্নভাষী, ভিন্ন আচার-রুচির মানুষের সঙ্গে যেমন তেমনি বিধর্মী, ভিন্নভাষী, ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলো, মেলামেশার অভ্যাস হলো। বৈপরীত্য বৈচিত্র্যের মধ্যেও রুচিগত মিল, হার্দিক অন্তরঙ্গতার ঘটনাও বিরল থাকল না। তার মনোজগৎ পরিবর্তন গ্রহণে কিছুটা তৈরি হলো।

পশ্চিমে রেনেসাঁস-উত্তর দর্শনচর্চা বিশুদ্ধ ভাবনার স্বতঃস্ফূর্ততাকে বিজ্ঞান ও গাণিতিক সামঞ্জস্যের প্রতি দায়বদ্ধ করে তুলেছিল। নীতিদর্শন ও শ্রেয়োনীতিক ভাবনার নবায়ন ঘটল বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ অবদানের আলোকে। তাদের রেনেসাঁসের মূল অনুঘটক যে বিজ্ঞান তার জ্ঞান কার্যকারণের যুক্তি ও প্রমাণসাপেক্ষতার শর্তে এগিয়ে গেলেও তাকে প্রাণবন্ত রেখেছে বিজ্ঞানের দর্শন, এমনকি বিজ্ঞানের শিল্পরূপ ও নন্দনসহ মানবিক সংস্কৃতির প্রাসঙ্গিকতা।

ফলে বিজ্ঞানের প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক যেসব উদ্ভাবনা ও প্রযুক্তি, কৃৎকৌশল তা পশ্চিমের জন্য কোনো বিচ্ছিন্ন ভোগ্যপণ্যমাত্র নয়, জ্ঞানতাত্ত্বিক পরম্পরার উপজাত সম্পদ এবং তা একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতাই বহন করছে। বড় কথা, যুক্তি ও বিশ্লেষণের দ্বারা তাদের মননক্রিয়া নির্দেশিত হবে, এটাই শিক্ষিত মানসের সংস্কৃতি হয়ে উঠল। ফলে সহজেই তাদের পক্ষে সমাজ ও রাষ্ট্রকে ন্যায়, সমতা, নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় সময়োচিত পদক্ষেপ নিতে এবং আইনের শাসন ও মানবাধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে সামাজিক রূপান্তর ও নবায়নে উদ্বুদ্ধ করল। তবে বহির্বিশ্বে, প্রধানত এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকায় তাদের বাণিজ্যিক আগ্রাসন ও ভূরাজনৈতিক স্বার্থ মিলিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকার কথাও আমরা ভুলব না। শেষোক্তরা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'ছোট ইংরেজ'।

৩.

রবীন্দ্রবর্ণিত কালান্তরের বাহ্য পরিবর্তনগুলোর সঙ্গে মনোজগতের রূপান্তর সব সময় সমানতালে চলেনি, হয়তো সেটা স্বাভাবিক নয় বলেই চলেনি।

রামমোহন বাঙালি হিন্দুর অসংখ্য দেবদেবীর বিগ্রহসংবলিত পূজা-অর্চনার পল্লবগ্রাহী ধর্মসংস্কৃতির নবায়ন করতে চাইলেন বৈদিক হিন্দুশাস্ত্রেরই আশ্রয় নিয়ে। কিন্তু আমবাঙালি হিন্দু তার ধর্মীয় সংস্কৃতি ছাড়তে পারেনি। বিদ্যাসাগর এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম, শাস্ত্রজ্ঞানে এবং পরিচ্ছদ, চলনে সনাতন হিন্দু পণ্ডিত, কিন্তু কর্মে, ভাবনায়, লেখায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেছেন মানব—বিশেষত নারীর—এবং সমাজের কল্যাণ সাধনায়; পরকাল ও পূজা-অর্চনা সম্পর্কে ছিলেন বরাবর নীরব নিষ্ক্রিয়, যে কারণে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে একবার নাস্তিক আখ্যায়িত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজভাবনায় পাশ্চাত্যের সেক্যুলার দর্শন ও শিক্ষার প্রভাব অস্পষ্ট নয়। কিন্তু বাংলা ভাষার অমর এই কথাশিল্পী জীবনদর্শনের দিক থেকে গোঁড়া হিন্দুই ছিলেন। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ঔপনিবেশিক ভারত এবং দর্শনের অনুরক্ত ছিলেন, কিন্তু সেই সাথে তারুণ্যে একদিকে ছিল সর্বপ্রাণবাদের (pantheism) আর অন্যদিকে রোম্যান্টিক শিল্পবোধ ও উদার মানবতাবাদী চেতনার প্রভাব এবং সব মিলিয়ে তাঁর মতো অলোকসামান্য সৃজনপ্রতিভা তৈরি করেছিলেন নতুন মানবধর্মের বারতা। স্বামী বিবেকানন্দও ধর্মীয় সংকীর্ণতার গণ্ডি ভাঙতে চেয়েছিলেন উদার মানবতাবাদকে সামনে এনে। এ ছাড়া বাংলার লোকসমাজে হিন্দু-মুসলিম, বাউল-সহজিয়া, সুফিসাধনার সব ধারা থেকেই লালনের মতো সর্বকালে এমন সাধকেরা এসেছেন, যাঁরা ধর্মীয় গণ্ডি ও বিভেদের উর্ধ্বে মানবতার জয়গান গেয়েছেন—তাঁদের কোনো কোনো গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র সম্প্রদায়, সমাজও আমাদের অজানা নয়। ইয়ং বেঙ্গলদের শাস্ত্রবিরোধী আচারপ্রথা ভাঙার বিদ্রোহ কিন্তু এ সমাজে ক্ষণিকের স্ফুলিঙ্গের মতোই জ্বলে উঠে নিভে গেছে, হয়তো কিছু বিচ্ছিন্ন গুণগ্রাহী সমঝদার রেখে গেছে। এক কালান্তর থেকে অন্য কালান্তরের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাতে পৌঁছাতে তার জের ও রেশ ক্রমেই কমে এসেছে।

এর পেছনেও কারণ আছে। মুসলিম সমাজে যখন মনোজগতের জাগরণ ঘটছে তত দিনে এ দেশবাসীর মানসে দুটি বড় আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়েছে—প্রথমটি হলো আত্মপরিচয়ের সন্ধান ও প্রাচীন গৌরবের পুনরুজ্জীবন আর দ্বিতীয়টি হলো পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে স্বরাজ ও স্বাধীনতা অর্জন। প্রথমটি ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদী চেতনা থেকে রক্ষণশীলতার বাতায়ন খুলে দিল আর দ্বিতীয়টি আধুনিক রাষ্ট্রগঠনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করল। স্বরাজ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় দুই সম্প্রদায়ের লক্ষ্য পৃথক হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু প্রথম প্রণোদনাই দুই সমাজের প্রধান প্রণোদনা হয়ে ওঠায় ক্রমেই তা হিন্দু ও মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবাদী করে তুলেছিল। ফলে কালান্তরের যাত্রাপথ মসৃণ থাকল না এবং এ কারণেও কলকাতায় সূচিত রেনেসাঁস সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারল না।

তবে এই রেনেসাঁসের প্রভাবে একটি তৃতীয় ধারা যে তৈরি হয়নি তা নয়। এটি এল ইংরেজি শিক্ষিত রাজনীতিসচেতন নাগরিক গোষ্ঠী থেকে। এদের মধ্যে চিন্তাভাবনা-মানসিকতার দিক থেকে এক প্রান্তে বিপ্লবী চেতনা অন্য প্রান্তে রক্ষণশীল ধর্মীয় চেতনার প্রভাবসহ মধ্যবর্তী নানা প্রবণতা দেখা যায়। মোটাদাগে একে কি আমরা বলতে পারি ভিক্টোরীয় মানসিকতা? এ রকম মানুষ সাধারণত প্রথানুসারী নির্বিবাদী আর এই মানসিকতার জেরে এরা মতপার্থক্য, এমনকি জীবনাচরণে কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও পাশাপাশি জীবনযাপন করতে পারে। এরা পরমতসহিষ্ণু গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের উপযোগী ছিল এবং পরবর্তী বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ও নাগরিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকাও রেখেছে।

ভেতর থেকে সামাজিক ঐক্য, মতামতের ঐক্য গড়ে উঠল কি না তা নিয়ে সংশয় থাকল, এবং অনেক প্রশ্ন, ইস্যু, সংকটের নিষ্পত্তি ছাড়াই ইতিহাস তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলেছে। দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ এসবের জবাব দিতে পারেনি। ভেতরের প্রস্তুতিতে, তথা কালান্তরের দর্শন উপলব্ধিতে যে দুর্বলতা ছিল তা স্পষ্ট হয় পরবর্তী ঘটনাবলিতে।

ভাষা আন্দোলন ও এরপরের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এবং সাংস্কৃতিক ও নাগরিক কার্যক্রমের ফলেই ঘটল অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ, বঙ্গবন্ধুর উত্থান, মুক্তিযুদ্ধ এবং এসবের ফসল হিসেবে এল স্বাধীন বাংলাদেশ। তার যাত্রাপথ মসৃণ হয়নি, প্রত্যাঘাত এসেছে দ্রুত, দেখা গেল সেই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের রাষ্ট্রের মূলনীতি, সমাজ ও রাজনীতির মূলধারা—অন্তত সে হিসেবে যা গণ্য হয়ে এসেছে—কার্যকর প্রতিরোধ দাঁড় করাতে পারেনি। এমনকি একপর্যায়ে ভাষা ও সাংস্কৃতিক অর্জন নিয়ে আমাদের গৌরববোধও আবেগ ও উচ্ছ্বাসের নানা বহিঃপ্রকাশেই সীমিত হয়ে পড়ছে। কার্যত জাতি যেন চলেছে ভিন্ন ধারায়।

৪.

গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকেই পশ্চিমা বিশ্ব উপলব্ধি করছিল সমাজজীবনে গুণগত পরিবর্তনের আলামত। ওই দশকেই মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল বেল লিখলেন বিখ্যাত গবেষণাগ্রন্থ *দ্য এ-অব আইডিওলজি*। পুঁজিবাদ, পণ্যবিপ্লব ও ভোগবাদের বিস্তার ঘটতে শুরু করেছে তখন এবং এর প্রভাব মানুষ অনুভব করতে শুরু করেছে। ব্রিটিশ গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড এরও আগে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বললেন, মানুষ বস্তুনিষ্ঠ ও নৈর্ব্যক্তিক হতে গিয়ে তার আত্মগত (subjective) হওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। একে এক অর্থে, বা নতুন ব্যঞ্জনায় বলতে পারি, মানুষের আত্মহারা হয়ে পড়া! টি এস এলিয়ট কবিতার শিরোনাম দেন ফাঁপা মানুষ Hollowman কিংবা পতিত জমি বা Waste Land.

যেখানে তিনি বলেন—

What are the roots that clutch, what branches grow
Out of this stony rubbish? Son of man,
You cannot say or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief,
And the dry stone no sound of water.

The Waste Land part-1

বাংলাদেশ বা তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে তখনো এ ধরনের বস্তুতান্ত্রিকতার সংকট দেখা দেয়নি, বরং তখনো প্রধানত কৃষি ও প্রকৃতিনির্ভর এই সমাজগুলোয় আদর্শবাদ, ভাববাদের রমরমা চলছে। বরং তখন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদও চর্চা হয়েছে রোমান্টিক আদর্শবাদের মতোই। সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন তখনো এসব দেশের ছাত্রতরুণ ও সাধারণজনের বড় একটি অংশকে আত্মত্যাগের ভাবাদর্শিক রাজনীতিতে দেশ গঠনে অনুপ্রাণিত করেছে।

কিন্তু আশির দশকের পর থেকে এ রকম অধিকাংশ দেশেও প্রচলিত মূলধারার রাজনীতি ক্ষমতার একচ্ছত্র প্রতাপের সঙ্গে আর এঁটে উঠতে পারছিল না। ক্ষমতা ও অর্থ গাঁটছাড়া বেঁধেছে তত দিনে, আর রাজনীতিতে আদর্শ ও দর্শনকে সাইনবোর্ড-মাত্র বানিয়ে অপরাধ ও দুর্নীতিকে ঠাঁই করে দেওয়া হলো। রাজনীতিতে আগেও আদর্শ হিসেবে ধর্মের বুলি কপচানোর প্রচলন ছিল, এখন আরও তুখোড়, ব্যাপক, বহুমাত্রিক হলো তার ব্যবহার।

সোভিয়েত এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতনের সূত্র ধরে দ্রুতই উন্নয়নশীল বিশ্বের আদর্শিক রাজনীতি, বিশেষত সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিরোধ, ভেঙে পড়ল। এই পরিবর্তন এবং আরও কয়েকটি কারণে আমরা এবার যে কালান্তরের মুখোমুখি হয়েছি তা মূলত বৈশ্বিক, যদিও একটি দেশজ রূপও তার রয়েছে।

৫.

ইতিমধ্যে পশ্চিমের প্রতিস্পর্ধী জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন ভেঙে গেল, ন্যাটো বহাল থাকলেও ওয়ারশ চুক্তি বাতিল হয়ে গেল, আরব লিগ, আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা কার্যকারিতা হারাল, এমনকি জাতিসংঘও ভারসাম্য হারাল। পশ্চিম বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি এবং ডব্লিউটিও বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতি ও বিশ্ববাজারের আধিপত্য ধরে রাখল। দেশে দেশে উন্নয়নের অসমতার মধ্যে বাজারের উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় শক্তিমান অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ও কৌশল কার্যকর হবে সেটা জানা কথা। কিন্তু বাজার অর্থনীতিই বিশ্বায়নের মূল চাবিকাঠি

হলো, জ্ঞানের ও আলোকনের সুবিধাগুলো প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নয়। বরং সেসব ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারের শর্তগুলো কঠোর করার ফলে বৈষম্য বেড়ে গেল।

বিজ্ঞানের অবদান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে কৃষি উৎপাদনে এ সময় বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটেছে—যেমন পরিমাণে তেমনি বৈচিত্র্যে। তার প্রসাদ আমাদের মতো কৃষিপ্রধান দেশে ভালোভাবেই আমরা পাচ্ছি। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও উন্নতির প্রভাব পড়েছে—স্বাস্থ্য, খাদ্য, শিক্ষা, পরিচ্ছদ, দারিদ্র্যবিমোচন ইত্যাদির বিভিন্ন সূচকে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিও অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে, এর অপপ্রয়োগ বা ব্যবহারের বিপদ মাথায় রেখেও ইতিবাচক দিকটিতেই জোর দেওয়া যায়। এ কেবল ব্যক্তির দক্ষতা ও সচ্ছলতার সম্ভাবনাই বাড়াল না, বিশ্বের এবং বিশ্বজ্ঞানের সঙ্গে তার সংযুক্তি ও অন্তর্ভুক্তির সুযোগ তৈরি করল।

বিশ্বায়নের এই পথ ধরেই আমরা দেখছি ইংরেজি ভাষার বিশ্বযাত্রা চলছে অবাধে, অপ্রতিহত গতিতে। ইংরেজি বলয়বহির্ভূত উন্নত বিশ্ব, বিশেষত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, যারা এতকাল ধরে স্ব স্ব সাংস্কৃতিক জাতীয়তার গৌরববোধ থেকে ইংরেজি ভাষা প্রতিরোধ করে এসেছিল তারাও এখন ইংরেজি শিখছে। এশিয়ার শক্তিশালী অর্থনীতি এবং স্বকীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে স্বাতন্ত্র্যবাদী গর্বিত চীন-জাপানও ক্রমে ইংরেজির দরজা খুলে দিচ্ছে। বহুভাষার দেশ, সমৃদ্ধ সভ্যতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এক বিরল সংস্কৃতিসমৃদ্ধ দেশ ভারতের উচ্চশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর প্রধান ভাষাই আজ ইংরেজি—রাষ্ট্রভাষা হিন্দি বা স্ব স্ব রাজ্যভাষা নয়। আমাদের দেশে প্রায় হুজুগের মতো এসেছে এই প্রভাব, ঢাকা-চট্টগ্রাম শহরে নতুন প্রজন্মের বড় অংশ মাতৃভাষায় দুর্বল, অনেকে তাতে ভাব প্রকাশে অক্ষম থেকেই বেড়ে উঠছে।

পৃথিবীতে এখনো হতদরিদ্র মানুষ প্রচুর, খাদ্যাভাব ও অপুষ্টিতে ভুগছে অনেক মানুষ, নানা স্থানে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবও প্রকট, নানা রোগ-বিপর্যয় চলছেই, বেকারত্ব বাড়ছে এবং সারা বিশ্বে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বেড়েই চলেছে। পশ্চিমের অর্থনীতিতে অস্ত্র ব্যবসায়ের বড় ভূমিকা থাকায় বিশ্বশান্তি তো হুমকিতে থাকছেই, আঞ্চলিক যুদ্ধবিগ্রহও বন্ধ হবে না। বিশ্ব ও বিশ্ববাসীর জন্য আরও সমস্যার আলামতও আমরা দেখছি। সে আলোচনার মাধ্যমে এ নিবন্ধের উপসংহার টানার আগে তার মুখবন্ধটুকু বলে নিই।

৬.

এ বছর রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হচ্ছে। জীবনের শেষ জন্মদিনে শেষ ভাষণের শিরোনাম দিয়েছিলেন কবি 'সভ্যতার সংকট'। তাতে

তিনি পশ্চিমের সভ্যতার ওপর আস্থা হারানোর কথা বলেছিলেন। কবি লিখেছেন, 'মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।'

আজ কি আমরা তার চূড়ান্ত রূপ দেখছি? কবির প্রত্যাশা অনুযায়ী সত্যিই কি পুব থেকে এ সংকট থেকে উত্তরণের নতুন সূর্য উদিত হতে যাচ্ছে? তার কোনো আলামত কি দেখা যায়?

বাস্তবতা বলছে এখনো সারা বিশ্বে পশ্চিমের প্রভাব—কি মানুষের বাস্তব জীবনে কি চিন্তার জগতে—যথেষ্ট বেগবান এবং প্রায় অপ্রতিহত। রোমান্টিক সাহিত্য বা দর্শন যেভাবে আদর্শ ও আদর্শবাদকে প্রণোদিত করেছিল তা রোমান্টিক উত্তর আধুনিক ও উত্তরাধুনিক সাহিত্য ও দর্শন করতে পারে না। কারণ সব ধরনের আদর্শবাদেরই একটি সামূহিক আবরণসদৃশ ভূমিকা আছে, যার নিচে ঢাকা পড়ে যায় অনেক মানবিক জাগতিক দুর্বলতা, অন্যায় ব্যর্থতা দ্বন্দ্ব, অনেক প্রশ্ন থেকে যায় উপেক্ষিত, অমীমাংসিত। আধুনিক কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিক এই দুর্বলতা উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন জীবনের সব সত্যকে বাস্তবের আলোয় টেনে এনে, মুখোশ খুলে দিয়ে নগ্ন করে, সব বাস্তবতা ও সব রকম সম্ভাবনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, খুঁটিয়ে যাচাই করে। তার হাতে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের নানা আয়ুধের ব্যবহার হয়েছে। মানুষের ঘাটতি, সংকটগুলো তারা জানে এবং এ নিয়ে কোনো অনুযোগ করে না, কোনো কৈফিয়তও খাড়া করে না। আমাদের পরিচিত সনাতন আদর্শবাদের কোনো সযোগ এখানে নেই।

এই বাস্তবতায় পৌঁছানোর কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক পুঁজি আমাদের তেমনভাবে ছিল না। আমাদের শিক্ষা বিজ্ঞানের দর্শন এবং নন্দনকে আত্মস্থ করার কোনো পথ তৈরি করেনি, যুক্তি ও বিশ্লেষণের দক্ষতা সৃষ্টি করেনি, এমনকি বিশুদ্ধ জ্ঞান ও জ্ঞানচর্চার কোনো চাহিদাও তৈরি করতে পারেনি। সমাজ, শিক্ষিত সমাজও, জ্ঞানের মুক্ত অসীমতা সম্পর্কে অচেতন। রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের ক্ষেত্রে যাকে ব্যক্তিগত মোহ থেকে নির্মুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানের সাধনায় অর্জিত জ্ঞানের জগৎ আখ্যা দিয়ে প্রশংসিত করেছিলেন আমরা তা সৃষ্টি করতে পারিনি, তার মূল্য উপলব্ধি করিনি। আর তাতে জ্ঞান ও ডিগ্রি, জ্ঞানী ও শিক্ষক, সাহিত্য ও দর্শন, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছি।

আর তাই আমরা যেন রবীন্দ্রকথিত 'সত্যসন্ধানের সততা' প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। পশ্চিম তার আগ্রাসী অর্থনীতি ও ভূরাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে, পাশাপাশি জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানসৃষ্টির অসীম মুক্ত বাতাবরণ অন্তত একাডেমিয়াতে চালু রেখেছে

জোরালোভাবে এবং সেই সূত্রে আলোকিত সমাজের নাগালের মধ্যে তার সুফলপ্রাপ্তি নিশ্চিত রেখেছে।

এই বাস্তবতায় সাধারণ মানুষের ভাবাদর্শের ঝোঁক প্রকটভাবে প্রকাশ পাচ্ছে ধর্মীয় রক্ষণশীলতার মধ্যে। এ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে উন্নত-উন্নয়নশীল নির্বিশেষে সারা বিশ্বে, সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে। বলা যায়, আজ ধর্মীয় রক্ষণশীল আদর্শবাদের বিশ্বায়ন হয়েছে। আর খুব চাপে পড়েছে যে মুসলিম সমাজ তারা তৈরি করছে ইসলামের এক জঙ্গি আত্মঘাতী রূপ। তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের দুর্বল গণতন্ত্র পুনরায় কর্তৃত্ববাদী শাসনের দিকে ফিরে যাচ্ছে। আমাদের বহুকালের উদার মানবতাবাদী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য শক্ত প্রতিপক্ষের সর্বাত্মক প্রতিরোধের মুখে পড়েছে।

৭.

এখন বুঝতে হবে ইংরেজি ভাষার আধিপত্য, ভোগবিলাসের অবারিত সুযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিক গণমাধ্যমের ব্যাপক বিস্তার চললেও বিশ্বায়নের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব মিলে আমরা যে কালান্তরের নতুন বাস্তবতায় পৌঁছেছি তা অস্বীকার করা যাবে না। প্রশ্নটা হলো, এর সাথে আমাদের বাঙালিত্ব, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সমন্বয় হবে কীভাবে?

এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া জরুরি, কিন্তু উত্তর নিশ্চয় সহজ নয়, আর উত্তর পেলেও, গন্তব্যে তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর সংক্ষিপ্ত কোনো পথ থাকবে না। খসড়াভাবে, উচ্চকিত চিন্তার আকারে, হয়তো কিছু কথা বলা যায়।

আগামী প্রজন্মকে হতে হবে দ্বিভাষী, মাতৃভাষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে ইংরেজি নয়, বাংলা-ইংরেজি দুভাষাতেই দক্ষ হতে হবে। কারণ মাতৃভাষা হলো নিজ সংস্কৃতির অন্দরের বাসিন্দা হওয়ার প্রবেশপথ, আর সংস্কৃতিচর্চা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মূল হাতিয়ার। এর অভাব ঘটলে আমরা এক ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হব—আগামী প্রজন্ম হয়ে পড়বে সাংস্কৃতিক উদ্বাস্তু, cultural refugee। তাদের মোহমুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার মতো যুক্তি ও ব্যাখ্যার সামর্থ্য অর্জন করতে হবে, যাতে সহায়ক হবে গণিত ও বিজ্ঞানচর্চা। সেই সঙ্গে প্রযুক্তি ও কৃৎকৌশলের সঙে এবং এসবের দর্শন ও নন্দনের সঙ্গেও সম্যক পরিচয় থাকতে হবে। নতুন প্রজন্মের সামনে খোলা থাকবে বিশ্বনাগরিক হওয়ার সুযোগ—বিদেশে পাড়ি না দিয়েও দেশে বসে তা হওয়া ও থাকা যাবে।

আর বিশ্বকে একযোগে কাজ করার উপলক্ষ তৈরি করে দেবে জলবায়ু পরিবর্তনের অনিবার্যতা, যার প্রবল কড়া নাড়ার প্রতি কারও পক্ষেই আর বধির থাকা সম্ভব নয়। ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও জঙ্গিবাদ যে সংঘাত সৃষ্টি করছে তা হয়তো

সত্যিই সভ্যতার সংঘাত নয়—তা থেকে মুক্ত হওয়ার দিকে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতের বৈশ্বিকতা কি বিশ্ববাসীর জন্য কোনো অমোঘ সমাধানের পথ সৃষ্টি করে দেবে?

এ নিয়ে আগাম পূর্বাভাস দেওয়া আমার কাজ নয়। বিজ্ঞানী মার্টিন রিজ একবিংশ শতাব্দীকে আখ্যায়িত করেছেন আমাদের চূড়ান্ত শতক হিসেবে। তাঁর বইটির নামই *Our Final Century*। তাঁর মতে, পৃথিবীতে যেসব প্রজাতি নিজেদের মধ্যে হানাহানি করেছে তারা শেষ পর্যন্ত নির্বংশ হয়েছে। মানুষ সেই দিকেই ধাবিত হচ্ছে—রিজ এমনটাই মনে করেন। তাহলে চূড়ান্ত প্রশ্নটা হলো, মানুষ কি সংঘাতকে জবাব দিয়ে বিশ্বে সম্প্রীতির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারবে যাতে বৈষম্য, আগ্রাসন বন্ধ হবে? সেই ক্ষেত্রে দুটি কথা মনে হয়। জবাব কে দেবে? মানুষই তো। কোন মানুষ? নিশ্চয় নতুন যুগের নতুন মানুষ। আর সেখানেই আমি দেখতে পাই পুবের, আমাদের, সম্ভাবনা বা সম্ভাবনার সম্ভাবনা। আমাদের দেশের জনসংখ্যার ৪০ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৬ কোটির বেশি নবীন প্রজন্মের ছেলেমেয়ে। উপমহাদেশে এ সংখ্যা ৫০ কোটির মতো হবে। আর এশিয়ায়? নিশ্চয় শতকোটির ওপরে হবে। বর্তমান সমাজে তরুণেরা সক্রিয় সরব হয়ে উঠেছে, তরুণ প্রাণ নিশ্চয় নিশ্চেষ্ট নয়, তারা বিশ্বের নানা সূত্র থেকে রসদ আহরণ করছে, এবং আমরা তাদের মধ্যে এই সঞ্চিত সম্পদের বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকতে পারি।

আমরা জানি, আহরণ ও সঞ্চয়ন যতটা সহজ তা কাজে লাগিয়ে অঙ্কুরিত বিকশিত করা ততটাই কঠিন। পথ রোধ করে দাঁড়ায় অন্তরে স্থাবর হয়ে ওঠা নানা সংস্কারের আবরণ আর অচলায়তন। সে নিশ্ছিদ্র নিশ্চেষ্ট দেয়ালে জানালা কাটতে পারে নতুন দর্শনের তাজা হাওয়া—অতীতে তা কখনো এসেছে ধর্মের রথে চেপে, কখনো বিজ্ঞানের, কখনো শিল্প-সাহিত্য-ধর্ম-বিজ্ঞানের সমন্বয়ে রেনেসাঁসের প্রবল জোয়ারে ভেসে। কালে কালে ধর্ম নানা গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার ফাঁদে অধর্ম হয়ে উঠছে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির চমকপ্রদ সাফল্যের নিচে চাপা পড়ে মানুষের ভোগ ও বস্তুগত জয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে, শিল্পকলা বিচ্ছিন্নতার কবলে পড়ছে। নতুন দর্শন চাই, অন্তত নতুন দার্শনিক ব্যাখ্যা—যা হবে এই বর্তমান ও তাকে ঘিরে যে সংকটের কালো মেঘ ঘনায়মান তাকে উড়িয়ে দেওয়ার মতো জোরালো হাতিয়ার। আর তারই সহায়তায় কালান্তরের নতুন বাঙালি তৈরি হবে নতুন প্রজন্ম থেকে।

রবীন্দ্র-তিরোধানের পঁচাত্তর বছর পরে পূর্বদিগন্ত থেকে সেই দর্শনের গভীর মর্মস্পর্শী চিত্ত-আলোড়নকারী ধ্বনি কি শুনব আমরা যা সম্প্রদায়ের নয় মানুষের ধর্মকে উজ্জীবিত করবে? ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সংকীর্ণ চিন্তার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কল্যাণের বাণী ধ্বনিত করবে?

‘মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে’ রবীন্দ্রনাথ মানতে পারেননি। এমন পরিণতিতে বিশ্বাস স্থাপনকে অপরাধ জ্ঞান করেছেন। তাহলে রবীন্দ্রনাথের কথা ধরেই বলা যায় উন্নত বিশ্ব মানুষের শক্তিরূপ দেখিয়েছে, এবার আমাদের পালা, দেখাতে হবে মানুষের মুক্তিরূপ, যে মানুষ জানবে কর্মত্যাগী বৈরাগ্যে মুক্তি নয়, অসংখ্য বন্ধনের আনন্দের মধ্যেই মেলে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ, যে জানবে ‘সেই মুক্তি বৈরাগ্যের মুক্তি নয়, সেই মুক্তি প্রেমের মুক্তি। ত্যাগের মুক্তি নয়, যোগের মুক্তি। লয়ের মুক্তি নয়, প্রকাশের মুক্তি।’

খ্যাতি চিন্তা
বই আলোচনা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার উৎসমূলে প্রতিবাদ

আসজাদুল কিবরিয়া

ফ্রম প্রোটেস্ট টু ফ্রিডম : দ্য বার্থ অব বাংলাদেশ-মোকাররাম হোসেন, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০

এক

মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস নিয়ে কম বই লেখা হয়নি। ইতিহাসবিদ ও গবেষক থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের লিখিত বিভিন্ন বই ১৯৭১ সালকে ধারণ ও বিশ্লেষণ করেছে বিভিন্ন আঙ্গিকে। তবে বহির্বিশ্বের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এর যৌক্তিক পটভূমিসহযোগে তুলে ধরার জন্য ইংরেজি ভাষায় রচিত বইয়ের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। আবার যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের বেশির ভাগই বিদেশি গবেষক ও বিশ্লেষক। সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন ও পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করেছেন, এমন ধারার ইংরেজি লেখক কম। ড. মোকাররাম হোসেন তাঁর *ফ্রম প্রোটেস্ট টু ফ্রিডম : দ্য বার্থ অব বাংলাদেশ* গ্রন্থটি রচনার মধ্য দিয়ে সেই ধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ঘটিয়েছেন। কেননা, বহির্বিশ্বের কাছে মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরার দুরূহ কাজের প্রতিফলন আছে বইটিতে।

বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির সোশিওলজি, সোশ্যাল ওয়ার্ক ও ক্রিমিনাল জাস্টিস বিভাগের প্রফেসর ড. মোকাররাম হোসেন তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসেবে, এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই সমাজবিজ্ঞানে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি গ্রহণের পর। এরপর কিছুদিন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও পরে চার বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে

অধ্যাপনার পর যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান উচ্চতর ডিগ্রি লাভের জন্য। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, রিভারসাইড থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করার পর যোগ দেন অধ্যাপনায়। পাশাপাশি চলতে থাকে তাঁর গবেষণা, যা প্রধানত সমাজতত্ত্ব ও অপরাধতত্ত্ব নিয়ে। তবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তিনি নীরবে কাজ করেছেন, যার ফসল এই বইটি। আর কাজটি হয়েছে মূলত তাঁর ভেতরকার তাগিদ থেকে। যৌবনের প্রারম্ভে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপ্রেরণায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে লাখ লাখ তরুণের মতো তিনিও যুক্ত হন। ছেড়ে দেন পাকিস্তান প্রেস ইন্টারন্যাশনালের চাকরি। এরপর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে তিনি সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সোনামুড়ায় প্রবেশ করেন। সেখান থেকে কলকাতা। বইয়ের ভূমিকায় তিনি তাই লিখেছেন, '১৯৭১ সালের স্মৃতিগুলো এখনো আমার কাছে সজীব, যেন এই তো সেদিনের ঘটনাগুলো। আর শুধু ১৯৭১ সাল নয়, আমার স্মৃতিতে পাকিস্তানের ইতিহাসের সেই ২৫ বছরের ঘটনাগুলো এখনো তরতাজা। ১৯৫২ সালে যখন পাকিস্তানি প্রশাসন নিরীহ বাঙালিদের ওপর গুলি চালাতে দ্বিধা করেনি, তখন আমি দ্বিতীয় শ্রেণির স্কুলছাত্র। এর মাত্র দুবছর পর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগকে পরাজিত করে। ১৯৫৮ সালে আইউব খান যখন সমস্ত শক্তি ও ব্যাপ্তি দিয়ে তাঁর সামরিক শাসন চাপিয়ে দেন, তখন আমি অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। আমরাই ছিলাম আইউবের প্রবর্তিত নতুন ব্যবস্থায় উচ্চমাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রথম দল। ১৯৬৩ সালে আইউব খান কর্তৃক নিযুক্ত পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দ্বারা নির্বাচিত নয় এমন একজন চ্যান্সেলরের কাছ থেকে ডিগ্রি গ্রহণ না করতে দৃঢ় অবস্থান নেয়। এর ফলে ছাত্র ও আইন প্রয়োগকারীদের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়। এটি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদে রূপ নেয়। মোনেম খানের পুলিশ কয়েক শ ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে, যার মধ্যে আমার বড় ভাই রহমতুল কিবরিয়াও ছিলেন।

সামরিক শাসনের বিরোধিতা ও গণপ্রতিবাদের অন্য ঘটনাগুলো আমার চারপাশেই ঘটছিল। আমিও ওই সব ঘটনাপ্রবাহ ও সেগুলোর ঐতিহাসিক ব্যাপ্তির একজন নিবিড় পর্যবেক্ষক ছিলাম। সেই দিনগুলোতে আমাদের কাছে সংবাদপত্র ও বই পড়া ছাড়া আরও অনেক বিকল্প ছিল না। আমার বাবা *পাকিস্তান অবজারভার* ও *ইত্তেফাক* রাখতেন। তাঁর প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে এই দুটো খবরের কাগজ পড়তে হতো। আমি যদিও সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যা ঘটছে সে সম্পর্কে পড়তাম ও পর্যবেক্ষণ করতাম, রাতে নৈশভোজের সময়

বিষয়গুলো আমাদের পরিবারে নিয়মিতই আলোচনা হতো। তখন বিভিন্ন বিষয়ে আমার বাবার সঙ্গে আমার বিতর্ক হতো। মোট কথা, আমি সংযুক্ত পাকিস্তানের ২৫ বছরের ইতিহাস সম্পর্কে একটি অবস্থানগত ধারণা তৈরি করেছিলাম। আর আমার মতে, এই ধারণা পূর্ব পাকিস্তানের নীরব অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মনোভাবেরই প্রতিফলন, যা এই বইয়ের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা প্রয়োজন।' (পৃ. ৭-৮)

লেখকের এই ভূমিকা থেকেই আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে তিনি বইটিতে শুধু ১৯৭১ সালের ঘটনাপ্রবাহ ও তার বিশ্লেষণে কেন্দ্রীভূত থাকেননি, বরং ১৯৭১ তথা মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার প্রেক্ষাপট ও সংযুক্ত পাকিস্তানের সিকি শতাব্দীর ইতিহাসকে নিয়ে এসেছেন। মুখবন্ধে তাই তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশ গঠনের যেসব সামাজিক-রাজনৈতিক গতিময়তা কাজ করেছে, সেসব সম্পর্কেই এই বইটি রচিত। এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেসব ঘটনা যেগুলো ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়েছে, উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বশাসনের দাবিকে সুসংহত করে পাকিস্তানের অভ্যুদয় ঘটিয়েছে (১৯৪৭), সংযুক্ত পাকিস্তানের মৃত্যু ঘটিয়েছে এবং সেসব ঘটনার কালপঞ্জি যেগুলো ছিল জনগণের বিপুল সম্পৃক্ততায় একের পর এক সামাজিক আন্দোলন বা প্রতিবাদ যার মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ স্বশাসনের জন্য একটি গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের চেষ্টা করেছে। একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে দেখা দরকার ধারাবাহিক প্রতিবাদসমূহের একটি ফল হিসেবে। এসব প্রতিবাদকে ধারাবাহিক সামাজিক আন্দোলনও বলা যায়। বাংলাদেশ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের সামষ্টিক প্রতিবাদ বা কার্যক্রমের সৃষ্ট ফল। পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘু নেতৃত্ব বাঙালিদের ওপর যে সরকারি প্রশাসনিক পদ্ধতি চাপিয়ে দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে ছিল এসব প্রতিবাদ।' (পৃ-২৪)। অর্থাৎ লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতৃত্ব বরাবরই ক্ষমতায় থাকার জন্য নানা কৌশল ও যৌক্তিকতা প্রয়োগ করেছে আর জনসাধারণকে দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। এর বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও জনসাধারণ একের পর এক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, যা চূড়ান্ত পরিণতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটিয়েছে। লেখকের এই প্রতিপাদ্যের ধারণাটি একেবারে নতুন নয়। তবে এর উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের প্রণালিটি কিছুটা ভিন্ন। আর এই প্রতিপাদ্যের প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ এ এফ সালাহউদ্দীন আহমদের পর্যবেক্ষণের যে মিল পাওয়া যায়, সেটিও তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলছেন, 'উনিশশ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির ইতিহাসের সর্বকালের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা। এই মুক্তিযুদ্ধের ফলে আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে।

কিন্তু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ কোনো আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। এটি ছিল বাঙালির দীর্ঘকালের আত্মানুসন্ধান, দীর্ঘদিনের আন্দোলন এবং ইতিহাসের অমোঘ প্রক্রিয়ার পরিণতি।' [আহমদ, সালাহউদ্দীন, বাঙালির *সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, পৃ-১৩৩ (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯২)] তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন বাঙালির কয়েক শতাব্দীর ঐতিহাসিক ধারাক্রমের নিরিখে, নিকট ইতিহাসকে দূর অতীতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে। মোকাররাম হোসেন এই ধারাকে অনেকটাই অনুসরণ করেছেন। এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে সালাহউদ্দীন আহমদ সম্পর্কে মোকাররাম হোসেনের আপন চাচাতো ভাই। তাঁদের পিতামহ মৌলভী আহমদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বাঙালি মুসলমান গ্র্যাজুয়েটদের অন্যতম।

নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত বইটিতে মোকাররাম হোসেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস 'অরাজনৈতিক' ও 'নির্দলীয়' দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরার ও ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। লক্ষণীয় যে আরও অনেক গবেষকই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখতে গিয়ে 'নির্দলীয়' দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্লেষণের ওপর জোর দিয়েছেন এ জন্য যে এ বিষয়টি নিয়ে কিছু চরমভাবে দলীয় মনোভাবাসম্পন্ন বই রচিত হয়েছে, দলীয় সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপরের ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং সর্বোপরি দলীয় বিবেচনায় ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। এতে করে মানুষের মনে এ রকম একটি ধারণাও তৈরি হয়েছে যে ১৯৭১ বা মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক যেকোনো রচনাই বোধ হয় দলীয় রাজনীতির প্রভাবদুষ্ট। গোলাম মুরশিদ তাই বলেছেন, 'কিন্তু সবচেয়ে বিকৃত ইতিহাস লিখেছেন, যাঁরা দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তিযুদ্ধকে দেখেছেন, তাঁরা। বিশেষ করে রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং দলীয় আনুগত্যের কারণে অনেকে রীতিমতো ইতিহাস দখলের প্রয়াস চালিয়েছেন।" [মুরশিদ, গোলাম, মুক্তিযুদ্ধ *ও তারপর: একটি নির্দলীয় ইতিহাস*, পৃ-৭, (ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, ২০১০)]

মোকাররাম হোসেন প্রথম অধ্যায়ে ব্রিটিশ শাসনামলে ও পাকিস্তান গঠনের আন্দোলনে বাঙালি মুসলমানের ভূমিকা ও পূর্ব বাংলার মুসলমানদের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তনের ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি দেখিয়েছেন যে কীভাবে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের কর্মকাণ্ড দ্বারা বিচূর্ণ হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সামরিক শাসন ও মৌলিক গণতন্ত্রের প্রভাব যা কিনা বাঙালিদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। চতুর্থ অধ্যায়ে পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য কীভাবে উন্নয়নবৈষম্য তৈরি করে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে

পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাঙালিদের সংগ্রামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন লেখক। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আইউবের পতন ও ইয়াহিয়ার উত্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখলদারির নয় মাস ও বাঙালির প্রতিরোধের ওপর আলোকপাত করেছেন লেখক। অষ্টম অধ্যায়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চালানো গণহত্যা ও এ বিষয়ে বিশ্বের প্রধান দেশগুলোর নির্লিপ্ততা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। নবম অধ্যায়ে মুক্তিবাহিনী গঠন, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দুই.

ব্রিটিশ শাসনমালে অবিভক্ত ভারতের অবিভক্ত বাংলায় মুসলমানদের দুর্দশা ও সেই দুর্দশা থেকে ধীরে ধীরে উত্তরণের প্রয়াসটি ছিল সুদীর্ঘ দেড় শ বছরের বেশি সময়ের এক যাত্রা। অপ্রিয় হলেও সত্যি যে হিন্দু-মুসলমান সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিভাজনটি এই সময়কালে ক্রমাগত যেমন প্রকট হয়েছে, তেমনি পিছিয়ে পড়া বাঙালি মুসলমানদের ভেতর থেকেও একদল শিক্ষিত-সচেতন গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। এরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে পিছিয়ে পড়া স্বজাতির মুক্তির জন্য যাঁর যাঁর অবস্থান থেকে চেষ্টা চালিয়েছেন। কালক্রমে গোটা ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যে রাজনৈতিক সচেতনতার সঞ্চার হয়, তাতে বাঙালি মুসলমান শিক্ষিতদের একটা তাৎপর্যপূর্ণ অবদান ছিল। সে কারণেই ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব বাংলার ঢাকায়, যা পর্যায়ক্রমে পাকিস্তান আন্দোলনে রূপ নেয়। আসলে ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার যে 'বঙ্গভঙ্গ' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তা হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তীব্রতায় ১৯১১ সালে 'বঙ্গভঙ্গ রদ' করা হয়। এটা বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ-অবিশ্বাসের মাত্রা নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে এই ধারণা দৃঢ় হয় যে হিন্দুরা তাদের উন্নতি ও অগ্রগতি চায় না, চায় না সুযোগ-সুবিধার ভাগ দিতে। ফলে ভারতে মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমি সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। প্রথম অধ্যায়ে এসব ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করেছেন মোকাররাম হোসেন। তিনি লিখেছেন, 'এই প্রেক্ষাপটে বৃহত্তর ব্রিটিশ ভারত ভাগ হয়ে যায় এবং দুটি স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র—ভারত ও পাকিস্তান—স্থাপিত হয়। পাকিস্তান দুই অংশ নিয়ে সৃষ্টি হয়—পূর্ব ও পশ্চিম। পূর্ব পাকিস্তান পরবর্তীতে হয় বাংলাদেশ।' (পৃ-৫৯)।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন যে কেন ও কীভাবে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার অল্প পরেই বাঙালিদের মোহভঙ্গ হতে শুরু করে। অথচ বাঙালি মুসলমানরাই

পাকিস্তান গঠনে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। বাস্তবে দেখা গেল যে তারা যে প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে পাকিস্তান আন্দোলনে শরিক হয়েছিল, সেই প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা ক্রমাগত হতাশা ও ক্ষোভে রূপ নিচ্ছে। মোকাররাম হোসেন লিখেছেন, 'পাকিস্তানের শুরু থেকেই যে নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল, তারা গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা পোষণ করেনি। বরং তারা নিজেদের প্রয়োজন ও স্বার্থানুসারে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি পাল্টে ফেলতে থাকে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যক্রম থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে তারা সাধারণ জনগণের রায়কে বিশ্বাস করতে পারছিল না। অথচ জনগণের রায়ই হলো একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৌলিক নীতি। এই নেতৃত্ব তাই একটি গণতান্ত্রিক জাতি গঠনের জন্য কৌশল উন্নয়নের কোনো চেষ্টাই করেনি, বরং স্বৈরতান্ত্রিকভাবে দেশ শাসনের জন্য ক্ষমতালিপ্সু কোটারি গোষ্ঠী তৈরি করে। অথচ পাকিস্তানের প্রথম দিককার নেতৃত্বর কাছে একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রথা প্রতিষ্ঠার সব রকম সুযোগ ও জনসমর্থন ছিল। সাধারণভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লগ্নে অত্যন্ত খুশি ও উৎসাহী ছিল। শুরুর দিকে ছোট-বড় সব শহরেরই তরুণ প্রজন্ম আন্তরিকভাবে ১৪ আগস্ট উদ্‌যাপন করত। মুকুল ফৌজ ও সবুজ সেনার সদস্যরা ভোরবেলা পাকিস্তানের জয়গান গেয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করত। তবে এই উৎসাহ-উদ্দীপনা মিইয়ে যেতে থাকে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্বের নেতিবাচক আচরণের কারণে। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্ব জনগণের ভোট ও সমর্থন পাওয়ার বিষয়ে ভীত ছিল। আর তাই ১৯৭০ সালের আগ পর্যন্ত কখনোই এক ব্যক্তির এক ভোট নীতি চালু হয়নি। আর ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলের প্রতি কখনোই তারা সম্মান দেখায়নি। ক্রমাগত জনগণের রায়কে অবনমন করার সম্মিলিত ফল হিসেবে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে।' (পৃ-৬৭)

লেখক মূলত দেখাতে চেয়েছেন যে পূর্ব বাংলার বা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা বঞ্চিত হতে হতে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। আর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কোনো রকম প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। আর সে কারণে পাকিস্তান সৃষ্টির ১১ বছরের মধ্যেই সামরিক শাসন জারি হয়। অবশ্য ইস্কান্দার মির্জা ও আইউব খান দুজনই গণতন্ত্রের ব্যর্থতার জন্য রাজনীতিকদের দায়ী করেন। বাস্তবে পাকিস্তানের শুরু থেকেই গণতন্ত্রকে কার্যকর করতে দেওয়া হয়নি। বরং সামরিক শাসকেরা জনগণের ভালোর জন্য দেশের শাসনভার হাতে তুলে নেওয়ার নাম করে আসলে নিজেদের আখের গোছানোর কাজটি খুব ভালোভাবে করেছে। এর ফলে সামরিক শাসনামলে দুই পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য ক্রমাগত বেড়েছে আর বঞ্চিত হতে হতে বাঙালির প্রতিবাদ দেশের দুই অংশের মধ্যে

উত্তেজনা ও বিরূপতাও বাড়িয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে মোকাররাম হোসেন সমসাময়িক কালে সামরিক শাসনের ধরন পরিবর্তন সম্পর্কেও প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলছেন, 'সমসাময়িক কালে সামরিক শাসকেরা আর অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও আধা গণতান্ত্রিক জাতির কাছ থেকে সর্বাত্মক সমর্থন পায় না যেমনটা তারা পেত পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে। তবে সামরিক বাহিনী বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এখনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে আগ্রহী আর তা তারা করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। সে কারণেই বাংলাদেশের সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার (২০০৭-২০০৮) সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে, সামরিক সরকার হিসেবে নয়। তবে, '৬০-এর দশকে সামরিক শাসনের প্রতি বিশ্বের বিশেষত পশ্চিমা দুনিয়ার মনোভাব ছিল ভিন্ন রকম। বহু পশ্চিমা চিন্তাবিদ মনে করতেন যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য স্থিতিশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর সামরিক বাহিনী সেই বহু প্রয়োজনীয় স্থিতিশীলতা দিতে পারে। সে কারণেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর সক্রিয় উপস্থিতি ও ক্ষমতা গ্রহণ পশ্চিমা সরকারগুলোর প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ সমর্থন পেয়েছিল। পাকিস্তান হয়ে উঠেছিল তৃতীয় বিশ্বে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা বিষয়ে পশ্চিমা দর্শনের একটি পরীক্ষার বস্তু।' (পৃ-৮৫) লেখকের এই পর্যবেক্ষণটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি তাঁর এই পর্যবেক্ষণের সমর্থনে বেশ কিছু যুক্তি-তর্ক তথ্য-উপাত্তসহযোগে উপস্থাপন করেছেন। দেখিয়েছেন যে পাকিস্তানের সামরিক সরকারের নেতৃত্ব গৃহীত অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রতি ওই সময়কালে বিশ্বব্যাংক ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন আসলে যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশনীতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। ওই সময়টায় চলছিল ট্রুম্যান ডকট্রিন, যার অন্যতম নীতি ছিল কমিউনিজমের হুমকির মধ্যে থাকা দেশগুলোতে মার্কিন সেনা ও অর্থনৈতিক উপেদষ্টা প্রেরণ করা। লেখক বলছেন, 'দক্ষিণ আমেরিকা ও মধ্য আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি হস্তক্ষেপ করলেও পাকিস্তানে তা প্রয়োজন হয়নি এ জন্য যে সেখানে মার্কিন বিদেশনীতির সমর্থক লোকের অভাব ছিল না আর তারা আমেরিকা থেকে সংকেত আসার অপেক্ষাতেই ছিল।' (পৃ-৮৭)

এই অধ্যায়ে লেখক বেশ বিস্তারিতভাবে আইউব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের উদ্ভব ও প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। পাশাপাশি দেখিয়েছেন যে কীভাবে বিশ্বব্যাংক ও আমেরিকার পুঁজিবাদী দর্শন অনুসরণ করতে গিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠে। তিনি লিখেছেন, 'পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশন পরামর্শ নিত ও পরিচালিত হতো যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মডেলে বিশ্বাসী অর্থনীতিবিদদের দ্বারা যারা [পাকিস্তানের] জনগণের স্বতন্ত্রতা ও

সামাজিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যের দিকে মোটেও মনোযোগ দেয়নি। জনগণ বিশেষত যারা পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য ভোগান্তির শিকার হয়েছিল ও আত্মত্যাগ করেছিল, তারাই হওয়ার কথা ছিল সমাজের সবচেয়ে ক্ষমতাবান শক্তি। শুরু থেকেই দেশের জনগণের ভালো থাকার দিকে নজর না দেওয়া ছিল বিরাট ভুল। যাঁরা উন্নয়ন-প্রক্রিয়ার দিকনির্দেশনা দিচ্ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে দেশের সিংহভাগ জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থার বিরাট পার্থক্য ছিল।' (পৃ-১০৮)। তিনি এ প্রসঙ্গে কথিত 'হার্ভার্ড অ্যাডভাইজরি গ্রুপে'র অন্যতম সদস্য প্রফেসর গুস্তাভ এফ পাপানেকের ভূমিকা বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। পাপানেক পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশনের উপদেষ্টা ছিলেন কয়েক বছর। তিনি উদ্যোক্তা তৈরি করাকেই পাকিস্তানের উন্নয়নের প্রধান উপায় হিসেবে তুলে ধরেন ও সে রকম যাবতীয় পরামর্শ দিয়ে যান। যার ফলে ২২ পরিবারের জন্ম হয়। পাপানেক অবশ্য ১০০ পরিবার তৈরির কথা বলেছিলেন। তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা পাকিস্তানে পুঁজিবাদী উন্নয়ন বয়ে আনার জন্য সামরিক সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর মতাদর্শের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদ মাহবুব উল হক। 'পাপানেক ও মাহবুব উল হক দুজনেই জেনেশুনে এই বিশেষ ধরনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন-প্রক্রিয়া সমর্থন করেছিলেন, যা কিনা দুই অঞ্চলের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য তৈরি করেছিল। তাদের কাছে এই ব্যাপক বৈষম্য কোনো বিষয় ছিল না যতক্ষণ পর্যন্ত পরিকল্পনায় সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচক গুরুত্ব পেত।' (পৃ-১০৭) মজার বিষয় হলো ১৯৭১ সালে পাপানেক এক লেখায় পাকিস্তানের উন্নয়নের প্রশংসা করে বলেছিলেন যে অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের জন্য পাকিস্তান গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয়। অথচ এত বড় অর্থনীতিবিদ তখনো টের পাননি যে সংযুক্ত পাকিস্তান বলে আর কিছু থাকছে না। বছরের পর বছর পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তর করে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে বিনিয়োগে বঞ্চিত করে যে আর্থসামাজিক বৈষম্য তৈরি করা হয়েছিল, তা এসব অর্থনীতিবিদের কাছে কোনো গুরুত্বই পায়নি। বরং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে এ রকমটি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়—এই ধারণাই তাদের মগজে গাঁথা ছিল।

আবার আরেকটি আশ্চর্যের বিষয় হলো, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাপানেক বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে কাজও করেছিলেন। আর তাই ২০১৩ সালে তাঁকে ৬৮ জন বিদেশি বন্ধুর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা প্রদান করা হয়। তার আগে তিনি ২০১০ সালে বিনিয়োগ বোর্ডের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতে বাংলাদেশে এসেছিলেন।

মোকাররাম হোসেন পূর্ব পাকিস্তানের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক বঞ্চনা ও তা থেকে সৃষ্ট বৈষম্যের ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। বস্তুত মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের নেপথ্যে এই বৈষম্য ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যে বিরাট চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে, এই প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে তিনি আরেকটু জোরালো করেছেন।

তিন.

একদিকে বঞ্চনা-বৈষম্য, অন্যদিকে স্বকীয়তা-স্বতন্ত্রতায় আঘাত—এই দুইয়ের মধ্য থেকেই পাকিস্তান আমলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ নতুনভাবে জেগে ওঠে। ১৯৪৮ সালে জিন্নাহর উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এর প্রতিবাদ—এর মধ্য দিয়েই বাঙালি সত্তায় আঘাত ও এই সত্তার নবরূপে জেগে ওঠার আভাস মিলেছিল। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয় যে ভাষা আন্দোলনের রক্তস্নাত পথ বেয়ে বাঙালির স্বকীয়তা সমুন্নত রাখার পাশাপাশি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নিরন্তর লড়াইয়ে লিপ্ত হতে হয় পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিকে, যার প্রতিফলন ঘটে শেখ মুজিবের ছয় দফা ঘোষণা ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মধ্য দিয়ে। এ-সংক্রান্ত ঘটনাপ্রবাহ সংক্ষেপে তুলে ধরার পাশাপাশি বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে লেখক অগ্রসর হয়েছেন। দেখিয়েছেন যে এই প্রতিবাদ-আন্দোলনের তীব্রতাই সামরিক শাসক আইউব খানের পতন ঘটাতে বড় ভূমিকা রাখে। এরপর সত্তরের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু স্বভাববশত পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। মূলত ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার স্পষ্ট অনীহা প্রকাশ করেন। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গণ-আন্দোলন ও রাজনীতির গতিমুখকে কার্যত বদলে দেন। পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্ব ও রাজনীতিকদের বিশ্বাসযোগ্যতার সামান্য যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, সেটুকুও শেষ করে দেন। আর সেনাবাহিনীর সঙ্গে আঁতাতকারী জুলফিকার আলী ভুট্টো এরপর ঢাকায় এসে শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় বসার ঘোষণা দেন। লেখকের মতে, ভুট্টো একটা তামাশা করছিলেন। একদিকে তিনি জাতীয় পরিষদে মুজিবের সঙ্গে বসবেন না, অন্যদিকে আবার জাতীয় পরিষদের বাইরে মুজিবের সঙ্গে আলাপ করবেন। এর মধ্যে ইয়াহিয়া ঢাকায় আসেন ৩ মার্চ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার জন্য।

১৯৭১ সালের মার্চের উত্তাল দিনগুলোতে ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণকে ঘিরে ঢাকা ও আশপাশে যে টানটান উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, লেখক নিজে তার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ায় এ সম্পর্কিত বিবরণ ও

বিশ্লেষণে কিছুটা আবেগের ছোঁয়া পাওয়া যায়। তিনি এই পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন, 'শেখ মুজিব কখনোই পূর্ব পাকিস্তানিদের স্বার্থের সঙ্গে আপস করেননি এবং আরও অনেক পূর্ব পাকিস্তানি রাজনীতিকদের মতো পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে যোগ দেননি। যখন কেউ বাঙালিদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলেনি, শেখ মুজিব বলেছেন। শুধু বলেনইনি, জোরালোভাবে বলেছেন। পাকিস্তানের অগণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে তিনি অনেক সুযোগ পেয়েছেন, যেখানে বাঙালির স্বার্থে নেওয়া নিজের কঠোর অবস্থান থেকে পিছু হটতে ও আপস করতে পারতেন। কিন্তু তিনি গণতান্ত্রিক অধিকার ও অগ্রাধিকারের প্রতি নিজের প্রতিশ্রুতিতে অটল থেকেছেন। তিনি কোনো সুবিধাবাদী নেতা ছিলেন না।' (পৃ-২১৬)

সে কারণেই ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় তিনি কী বলবেন, তা নিয়ে নানা জল্পনাকল্পনা ছিল। মোকাররাম হোসেন বলছেন, '৭ মার্চ মুজিবের ভাষণ ছিল অসাধারণ। তিনি কোনো একতরফা ঘোষণা দেননি, কিন্তু রাজনৈতিক গতিময়তা উজ্জীবিত রাখার জন্য সবই বলেছেন এবং নিজ নেতৃত্বের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাননি। জনগণ তখন এতটাই উদ্বেলিত ছিল যে তা আরও উপচে উঠে গণ-অভ্যুত্থানকে গণবিধ্বংসী করে তুলতে পারত, যার ওপর কোনো নেতারই নিয়ন্ত্রণ থাকত না। ... পুরো দেশ মুজিবের কথা শুনেছে। জনগণের সমর্থন ও আনুগত্য মুজিবকে কার্যত পুরো দেশের নেতা বানিয়ে দেয়। ইয়াহিয়া বা পাকিস্তানি প্রশাসন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে। মুজিব স্বাধীনতার (আনুষ্ঠানিক) ঘোষণা দেননি এ জন্য যে তা আর দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। ... মুজিব আসলে অবিভক্ত ভারতের গান্ধীর অনুসরণে অসহযোগ ও অহিংস আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন বিরাট সাফল্য বয়ে এনেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ প্রথমবারের মতো বুঝতে পেরেছিল যে তাদেরও কিছু ক্ষমতা আছে। তারা উপলব্ধি করতে পারে যে একতাই বল। মুজিব সমঝোতার দ্বার খোলা রেখেছিলেন যদিও অসহযোগ আন্দোলন বেশ ভালোভাবেই চলছিল। মুজিব শুধু পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত সদস্য ও রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সভাপতিই ছিলেন না, তিনি এই ভূখণ্ডের সবচেয়ে শক্তিশালী নেতা হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তাঁর সেরার সেরাটা প্রদর্শন করেছিলেন। আর অনেক উঁচুতে উঠেও তিনি কখনোই বিনয়ী ও সহানুভূতিপূর্ণ স্বভাব থেকে বিচ্যুত হননি।' (পৃ-২১৭-২১৮)

মোকাররাম হোসেনের বিশ্লেষণের সারকথা হলো, শেখ মুজিব শান্তিপূর্ণ উপায়ে ন্যায্য ও যৌক্তিক দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন পরিচালিত করেছেন, কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ভুট্টো ও অন্যান্য রাজনীতিবিদের সঙ্গে মিলে তা দমনের

সহিংস পথ বেছে নেয়, যা পাকিস্তানের ভাঙন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অনিবার্য করে তোলে। ২৫ মার্চ রাতে নিরীহ বাঙালির ওপর বর্বরোচিতভাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে যে গণহত্যার সূত্রপাত পাকিস্তান ঘটায়, তা ইতিহাসে ক্ষমার অযোগ্য বলেই বিবেচিত।

চার

বইটির অষ্টম অধ্যায়টির ওপর একটু বিশেষ পর্যালোচনা করা যেতে পারে। 'জেনোসাইড : হোয়াট দ্য ওয়ার্ল্ড ইগনোরড' শিরোনামের মধ্য দিয়েই পরিষ্কার হয়ে যায় যে লেখক এখানে কী তুলে ধরতে চেয়েছেন। ১৯৭১ সালের গণহত্যাকে বিশ্ব যে কতটা উপেক্ষা করেছে, তার কিছু প্রমাণও দিয়েছেন তিনি। লেখক জানাচ্ছেন যে ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশবিষয়ক ১৯৬৫-১৯৭৩ সময়কালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোপন ও সংরক্ষিত দলিলপত্রের কিছু দলিল বরাবরই গোপন রাখা হয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্র সরকার কখনোই প্রকাশ করেনি। যে দলিলপত্রগুলো প্রকাশ করা হয়েছে, তার মধ্যে ১৯৭১ সালের ১৬ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল পর্যন্ত শুধু ২৯ মার্চ তারিখের একটি বাদে আর কোনো দলিল বা নথি নেই। ২৯ মার্চ তারিখের দলিলটিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রসঙ্গ রয়েছে। 'যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৯৭১ সালের ১৬ মার্চ থেকে ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল পর্যন্ত সময়কালের দলিলপত্রগুলো যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে জনসমক্ষে প্রকাশ করেনি। তবে এসব দলিল অবমুক্ত না করার মধ্য দিয়ে এটাই প্রতীয়মান হয় যে নিক্সন প্রশাসন ও পাকিস্তানের ইয়াহিয়া সরকারের মধ্যে আলোচ্য সময়কালে যেসব যোগাযোগ ঘটেছিল, সেসব তারা প্রকাশ করতে আগ্রহী নয়। প্রকাশিত দলিলগুলো বরং এই ধারণা দেয় যে পূর্ব পাকিস্তানে ওই সময়কালে কোনো গণহত্যা বা গণনিধন হয়নি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কোনো সার্চলাইট অপারেশন পরিচালনা করেনি।' (পৃ-২২৬) অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোপন দলিলপত্র নিয়ে লেখকের পর্যবেক্ষণে কিছুটা অসম্পূর্ণতা আছে। কেননা, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড ওয়াশিংটনে যেসব টেলিগ্রাম বা তারবার্তা প্রেরণ করেছিলেন, সেগুলো পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছে, যা ব্লাড টেলিগ্রাম নামে পরিচিত। তার মানে ১৬ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল সময়কালের কোনো গোপন দলিল প্রকাশিত হয়নি, বিষয়টি ঠিক নয়। মোকাররাম হোসেন বাঙালি গণহত্যার ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিদের দৃষ্টিভঙ্গিও তুলে ধরেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে যে নৃশংসতা ও নির্মমতা সংঘটিত হয়, তা পশ্চিম পাকিস্তানিরা পুরোপুরি উপেক্ষা বা অস্বীকার করেছিল।' (পৃ-২৩০) তিনি আরও দেখিয়েছেন, 'শুধু নিক্সন প্রশাসনই ইয়াহিয়াকে সমর্থন জানায়নি।

আরও অনেকগুলো আন্তর্জাতিক সংস্থা যেগুলো যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অধীনে ছিল, সেগুলো পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতিকে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃত্বের প্রচারণার মতো করেই দেখেছিল। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট একটি পর্যবেক্ষণে বলেছিল : বাস্তবতা হলো, একটি বেসামরিক সরকারের বহিরাবরণে সেনাবাহিনীর নীতি ও কার্যক্রম ক্রমাগত ও গভীরভাবে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠীকে বিরূপ করে তুলছে। বিষয়টা যেন এমন যে ২৫ মার্চ রাতের সেনা অভিযান তখনো বাঙালিদের বিরূপ মনোভাবাসম্পন্ন করে তোলেনি। রাজনীতি বড় বিচিত্রভাবে অগ্রসর হয়। ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তান সরকারের নিন্দা জানাতে পারছিল না, কিন্তু কিছু ব্রিটিশ সাংবাদিক পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতার যে চিত্র তুলে ধরেছিল তাতে করে ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা পাকিস্তানি নির্মমতাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।' (পৃ. ২৩৩-২৩৪)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি গণচীনের সমর্থনও গণহত্যাকে ইন্ধন জোগায়। মোকাররাম হোসেন লিখেছেন, 'পাকিস্তানি জেনারেলরা যখন যুদ্ধ অপরাধ করছিল ও গণহত্যা চালাচ্ছিল তখন তারা কোনো নিন্দার মুখে পড়েনি এ জন্য যে তারা চীনের কমিউনিস্ট শাসক ও যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদী শাসকদের কাছ থেকে রাজনৈতিক সমর্থন পেয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান চীন সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপনে নিক্সনকে সহযোগিতা করার মাধ্যমে নিক্সনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হন। কিসিঞ্জার ও তাঁর চীনা অনুরূপের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে ইয়াহিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।... প্রেসিডেন্ট নিক্সন আইউব খানকে পছন্দ করতেন আর ইয়াহিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করায়। তবে এই বন্ধুত্বের জের ধরে নিক্সন গণহত্যাকে "অভ্যন্তরীণ বিষয়" হিসেবে উল্লেখ করে উপেক্ষা করেন এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও পাকিস্তানের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব বজায় রেখে ভুট্টোর নতুন পাকিস্তানকে সহায়তা করেন।...এটাই রাজনীতির প্রকৃতি। যখন হাজার হাজার নিরীহ মানুষ গণহত্যার শিকার হচ্ছিল, যখন তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল, যখন নারীরা ধর্ষিত হচ্ছিল, তখন বিশ্বের দুই শক্তিধর জাতি—আমেরিকা ও চীন—কূটনৈতিক বোঝাপড়ায় লিপ্ত ছিল। আর এই কাজ সহজীকরণে যিনি ছিলেন, তিনি ছিলেন গণহত্যার মূল আয়োজক।' (পৃ. ২৩৮-২৩৯)

তবে এই অধ্যায়ে গণহত্যার নীরব সমর্থক হিসেবে বা বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের বিপক্ষে ও পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান গ্রহণকারী মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশসহ অন্যান্য দেশের বিষয়ে কোনো তথ্য বা বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়নি। সেগুলো তুলে ধরা গেলে বিশ্ব যে গণহত্যাকে কী মাত্রায় উপেক্ষা করেছে, সে

বিষয়ে বিস্তৃত ধারণা পাওয়া যেত।

পাঁচ

বইটির শেষ অধ্যায়ে বাঙালির প্রতিরোধ, মুক্তিবাহিনী গঠন ও পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। এখানে লেখক একপর্যায়ে বলেছেন, 'সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম প্রায় নয় মাস অব্যাহত ছিল আর তা প্রতিবেশী ভারতের কাছ থেকে বিপুল সমর্থন পেয়েছে। এই দুনিয়ায় সংগ্রামরত জনগণের অন্য দেশের কাছ থেকে সমর্থন-সহায়তা পাওয়া কখনোই সমস্যা হয়নি। ভিয়েতনামে ভিয়েতকংদের আশ্রয় দিয়েছিল কম্বোডিয়া আর বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছিল ভারত।' (পৃ. ২৪৬)। এই অধ্যায়সহ বইটি শেষ হয়েছে ঢাকায় নিয়াজী আত্মসমর্পণের ঘটনার বিবরণী তুলে ধরার মধ্য দিয়ে।

সার্বিকভাবে বইটির মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসকে একটি বিস্তৃত পটভূমিতে তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে। বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক জোরালো বিশ্লেষণই এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য যেন পাঠক বিশেষত ভিনদেশিরা ঘটনাগুলোর তাৎপর্য ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে। লেখক অবশ্য নতুন প্রজন্মের জন্য বইটি লিখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। এই নতুন প্রজন্মের মধ্যে আছে যারা বাংলাদেশের বাইরে বড় হয়েছে ও বেড়ে উঠেছে কিন্তু বাংলাদেশি পিতা-মাতার সন্তান বা পরের প্রজন্ম তারা। বাংলা পড়তে-লিখতে না জানার কারণে মুক্তিযুদ্ধের এই বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাস তাদের জন্য প্রয়োজনীয়। আবার যারা বাংলাদেশ ও এর ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী হবেন, তাঁদের জন্যও এটি একটি সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

বইটিতে লেখক অন্যদের গবেষণা ও লেখনী থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন নিজের বর্ণনা ও বিশ্লেষণের সমর্থনে। এই ধরনের কাজে সেটা স্বাভাবিক। তবে সূত্রসহযোগে যেভাবে এই উদ্ধৃতিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, তা স্বাচ্ছন্দ্যে বই পড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করে। কেননা, বারবার বন্ধনীতে লেখক বা সম্পাদকের নামসহ প্রকাশনার বছর ও বই বা পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা [যেমন : (Frank, 1998:127) বা (Wheeler, 1970:163)] তুলে ধরায় তা যেমন দৃষ্টিকটু হয়েছে, তেমনি পড়তে গিয়ে কিছুটা হোঁচট খেতে হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথভাবে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়নি বা বাদ পড়ে গেছে। এতে করে কোনটুকু সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে সরাসরি উদ্ধৃত তা বোঝা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। বরং, প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে সূত্রগুলো পাদটীকা হিসেবে অথবা প্রতি অধ্যায় শেষে দেওয়া যেত। যদিও বইয়ের শেষে তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহৃত বই, জার্নাল ও

অন্যান্য প্রকাশনার বিস্তারিত অধ্যায়ভিত্তিকভাবে ভাগ করে তুলে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন বইয়ের পাশাপাশি লেখক লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের আর্কাইভ থেকে *লন্ডন টাইমস*, *গার্ডিয়ান*, *পাকিস্তান অবজারভার*, *ডন* ও *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার পুরোনো সংখ্যা ঘেঁটেছেন। এই ব্যয়বহুল কাজে তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের স্প্রিংফিল্ড ভার্জিনিয়ার সফল বাংলাদেশি ব্যবসায়ী হাবিব খান যে সমর্থন জুগিয়েছেন, তা তিনি ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

বইটির একটি বড় দুর্বলতা হলো ভারসাম্যহীন পুনরাবৃত্তি। ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ উপস্থাপন ও বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ একটি স্বাভাবিক কাজ। কিন্তু এই বইয়ে যেভাবে বিভিন্ন ঘটনার ও বিশ্লেষণের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, তাতে মনে হয় যে লেখক যথেষ্ট পরিকল্পনামাফিক অগ্রসর হননি বা বইয়ের অধ্যায় বিন্যাসের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার ঘাটতি ছিল। আর তাই অনেক ক্ষেত্রেই পাঠকের আগ্রহ হারিয়ে ফেলার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বইটির আরেকটি বড় দুর্বলতা হলো মুদ্রণপ্রমাদ, যা অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি তৈরি করে, তথ্যগত বিকৃতি ঘটায় ও অর্থহীন হয়ে ওঠে। বোঝাই যায়, চূড়ান্ত সম্পাদনায় যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয়নি। সাহিত্য প্রকাশের মতো দেশের একটি খ্যাতনামা প্রকাশনা সংস্থার কাছেও এই ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি কাম্য নয় মোটেও। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের ক্ষেত্রে।

সব মিলিয়ে বইটি হাতে নিয়ে প্রথম দিকে যে প্রত্যাশা তৈরি হয়, পরের দিকে এসে সে প্রত্যাশায় ভাটা পড়ে যায়। তাই উল্লেখিত ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনসহ ভালোভাবে সম্পাদনা করে পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের চেষ্টা করা উচিত। তা না হলে বাইরের দুনিয়ার ও নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস তুলে ধরার এই শ্রমসাধ্য প্রয়াসটি কাঙ্ক্ষিত মূল্যায়ন পাবে না।

বই আলোচনা

মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধাপরাধ ও জেনোসাইড : অমীমাংসিত বিষয় ও মানবতার দায়

মো. ফজলে রাব্বি

দ্য লিবারেশন ওয়ার—মোহাম্মদ আইয়ুব ও কে সুবরামনিয়াম, এস চান্দ অ্যান্ড কো. (প্রাইভেট) লি. : নয়াদিল্লি, ১৯৭২। *ওয়ার ক্রাইমস অ্যান্ড জেনোসাইড : দ্য ট্রায়াল অব পাকিস্তানি ওয়ার ক্রিমিনালস*—বি এন মেহরিস, ওরিয়েন্টাল পাবলিশার্স : নয়াদিল্লি, ১৯৭২

সমসাময়িক বাস্তবতায় অনেক সময় স্মৃতি বা ঘটমান অতীত রোমন্থন করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে সংঘটিত জেনোসাইড, যুদ্ধাপরাধ বা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারকার্য পরিক্রমা এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে এই বিচারযজ্ঞের ন্যায্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে ব্যাপকভাবে বাংলাদেশে এবং আন্তর্জাতিক মহলে আলোচনা, সমালোচনা ও পর্যালোচনা হয়ে আসছে। এই নিবন্ধে সামগ্রিকভাবে বর্তমান পরিস্থিতি বিচারে কোনো পর্যালোচনা করা হচ্ছে না, বরং ১৯৭২ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং জেনোসাইড ও যুদ্ধাপরাধের বিচারবিষয়ক দুটি গ্রন্থের কিছু অধ্যায়বিশেষের পর্যালোচনা করা হবে।

বি এন মেহরিস তাঁর *ওয়ার ক্রাইমস অ্যান্ড জেনোসাইড : দ্য ট্রায়াল অব পাকিস্তানি ওয়ার ক্রিমিনালস* গ্রন্থে 'যুদ্ধাপরাধের বিচার বিষয়টি সব সময় খুব বিতর্কিত ও জটিল' ভাববাচ্য দিয়ে মুখবন্ধের সূচনা করেছেন। গ্রন্থটি ১৯৭২ সালে দিল্লির ওরিয়েন্টাল পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। ২৫ মার্চ-১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১, নয় মাসে বাংলাদেশের ওপর কোনো পূর্ব ঘোষণা ব্যতীত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অতর্কিত সামরিক হামলা, রাষ্ট্রীয় শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিস্থাপনের

নামে বিরোধী রাজনৈতিক মত-পথের অনুসারী ও ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘুদের ওপর পরিকল্পিত আক্রমণ এবং তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করার যে নৃশংস প্রয়াস লক্ষ করা গেছে, সে বাস্তবতায় যুদ্ধাপরাধ ও জেনোসাইডের জন্য পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নে জুলাই, ১৯৭২ প্রকাশিত জে এন মেহরিসের গ্রন্থটি সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদিকে, মোহাম্মদ আইয়ুব ও কে সুবরামনিয়াম বিরচিত *দ্য লিবারেশন ওয়ার* গ্রন্থের মুখবন্ধের সূচনা বাক্য হচ্ছে, 'রাষ্ট্রপতি নিক্সন কংগ্রেসে তাঁর পেশকৃত পররাষ্ট্রনীতি-বিষয়ক প্রতিবেদনে ১৯৭১ সালের সমস্যা দক্ষিণ এশিয়াকে পরিবর্তিত করেছে এবং আমরা ১৯৭২ সালে বর্তমানের নব্য পরিস্থিতিতে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জগুলোর ব্যাপারে সচেতন।' এই গ্রন্থটি ১৯৭২ সালে নয়াদিল্লির এস চান্দ অ্যান্ড কো. (প্রাইভেট) লি. কর্তৃক প্রকাশিত হয়। মুখবন্ধের উদ্বোধনী বাক্যটির মর্মার্থ বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্পষ্টতরভাবে ধারণা করা যায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে শুধু বাংলাদেশ নয়, পাকিস্তান ও ভারত এবং তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গণচীনের স্বার্থ জড়িত ছিল। গ্রন্থটির তাৎপর্য শুধু ওই সময়ে উত্থাপিত বিষয়ের সমসাময়িকতায় নয়, বর্তমানের সমকালীন প্রেক্ষাপটেও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বি এন মেহরিস তাঁর গ্রন্থকে চারটি অধ্যায়ে—আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধাপরাধ এবং জেনোসাইড, উল্লেখযোগ্য যুদ্ধাপরাধ ও জেনোসাইডের বিচারসমূহ: বিচারপ্রক্রিয়ার পরিসংখ্যান এবং মানদণ্ড, পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারসম্পর্কিত কিছু সমস্যা ও প্রশ্ন এবং সামগ্রিক পর্যবেক্ষণে বিভক্ত করেছেন। অন্যদিকে মোহাম্মদ আইয়ুব এবং কে সুবরামনিয়াম তাঁদের গ্রন্থকে তিনটি পর্বে—প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংঘর্ষ এবং মুক্তিযুদ্ধ—বিভক্ত করে পর্যালোচনা করেছেন। অধ্যায়বিন্যাস পর্যবেক্ষণে গ্রন্থদ্বয়ের বিষয়গত প্রাধান্য স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। মোহাম্মদ আইয়ুব এবং কে সুবরামনিয়ামের গ্রন্থ অনুসারে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম ও মুক্তিযুদ্ধের সম্ভাবনার বীজ ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের মধ্যে নিহিত ছিল। পাশাপাশি ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতা, উপর্যুপরি সামরিক হস্তক্ষেপ এবং পাকিস্তানের ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন দুটি ভূখণ্ডের মধ্যে মৌলিক ভিন্নতা ও ক্রমবর্ধিত বৈষম্যও পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভিত্তি ও তথাকথিত ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক জাতীয় ঐক্যকে ক্ষয়িষ্ণু ও পতনমুখী করে। অন্যদিকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ ও জেনোসাইডের অপরাধের জন্য আন্তর্জাতিক আইন, প্রাগুক্ত বিচার অভিজ্ঞতা এবং প্রচলিত বিষয়সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অধ্যাদেশ ও বিচারব্যবস্থায় পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্ন, বিচারের দাবির ন্যায্যতা, বিচার-প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ, বিচারের সম্ভাবনা

ও উদ্যোগ বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে।

দুটি গ্রন্থের সমন্বিত পর্যালোচনার সার্থকতা নিয়ে দোদুল্যমানতা থাকলেও গ্রন্থিত বিষয়গুলোর মধ্যে সূত্র ও পরিণামগত সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্নের কোনো অবকাশ নেই। দুটি গ্রন্থ ১৯৭১ সালে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বেআইনি ও অনৈতিক আক্রমণ এবং আত্মরক্ষা ও অস্তিত্ব রক্ষায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে। গ্রন্থ দুটিতে আলোচিত অধ্যায়ভিত্তিক বিষয়বস্তুগুলোর ভিন্নতা রয়েছে কিন্তু বিষয়গুলোর মধ্যে গভীর আন্তসম্পর্ক বিদ্যমান।

পাকিস্তানের জন্ম এবং বাংলাদেশে জেনোসাইডের বিষবৃক্ষ রোপণ

আইয়ুব এবং সুবরামনিয়ামের গ্রন্থের প্রথম ভাগে কীভাবে ধর্মান্ধতার ভ্রান্তির ওপর ভিত্তি করে ধর্মান্ধ ও ধর্মভীরু দুই ধরনের ধর্মানুসারীর বিশ্বাসকে পুঁজি করে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ নামক ফানুস জাতীয়তাবাদের জন্ম ও বিকাশের বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে। বস্তুত, এই ফানুস জাতীয়তাবাদের ওপর নির্ভর করে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামে একটি তাসের দেশ তৈরি করা হয়েছিল। রাষ্ট্রটির ধর্ম ভিন্ন কোনো ভিত্তি-কলাম ছিল না। পাকিস্তান নামক ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রটির মেয়াদ ক্ষণস্থায়ী হবে তার আলামত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিবিদ এবং ভারতীয় আধুনিক জাতীয়তাবাদের অগ্রজ প্রবক্তা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর আত্মজীবনী *ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম* গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন, 'জিন্নাহ ও তাঁর অনুসারীরা বুঝতে পারছেন না যে, ভৌগোলিক অবস্থান তাঁদের বিরুদ্ধে...এই দুই অঞ্চলের মধ্যে (পশ্চিম পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ) কোনো ধরনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ নেই। অঞ্চল দুটির অধিবাসীরা একে অপর থেকে যেকোনো বিচারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, শুধু ধর্মীয় পরিচয় ব্যতিরেকে। ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, ভাষাতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে ঐকমত্য স্থাপনের প্রচেষ্টা জনগণের সাথে ধোঁকাবাজি ব্যতীত কিছু নয়।...সর্বাপেক্ষা আশাবাদী ব্যক্তিও আশা করবে না যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান তাদের সকল মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে একটি জাতিতে পরিণত হবে? (আইয়ুব ও সুবরামনিয়াম, পৃ. ১)

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মত্রুটির সাথে ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) সংঘটিত জেনোসাইডের কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের নৃগোষ্ঠীগুলোর অন্যতম পাঞ্জাবিরা পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ও কেন্দ্রীয় রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করত। পাঞ্জাবিদের মধ্যে বিশেষত যারা সামরিক

বাহিনী বা প্রশাসনে কর্মরত তাদের মধ্যে একধরনের বর্ণবাদী ও আমিত্ব মানসিকতা লক্ষ করা যায়। বাঙালিদের তারা নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়ভাবে এবং আর্থসামাজিক মর্যাদায় নিম্নবর্গের বিবেচনা করত। বাঙালি মুসলিমদের তারা সনাতন ধর্মাবলম্বী নিম্নবর্গের মুসলিম মনে করত। ১৯৭১ সালে বাঙালিদের হেয় করে দেখার মনোভাব জেনোসাইডের মতো মানব ইতিহাসের নিকৃষ্ট অপরাধ করতে প্রবৃত্ত করেছিল বলে অনুমেয়। ১৯৭১ সালে ব্যাপক হারে বাঙালি নারীদের ধর্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাঙালির জন্মপরিচয় পরিবর্তন করে তাদের নিম্নশ্রেণি থেকে মধ্যশ্রেণিতে উত্তীর্ণ করা। জেনোসাইডের সর্বজনীন সংজ্ঞায়নে বলা হয়েছে, কোনো রাজনৈতিক, নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক বা ধর্মীয় জাতিগোষ্ঠীকে সমূলে অথবা আংশিকভাবে ধ্বংস বা নিধনের জন্য পরিকল্পিতভাবে হত্যা বা হত্যাচেষ্টা বা তাদের অস্তিত্ব বৈশিষ্ট্য বিলীন করতে শারীরিক অথবা মানসিক আগ্রাসন জেনোসাইড হিসেবে পরিগণিত হবে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানের আগ্রাসী সামরিক অভিযানে জেনোসাইড সংজ্ঞায়নে বর্ণিত সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের গঠনকাঠামোর সমস্যার কারণে রাজনৈতিক পরিকাঠামোতে আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থগুলোকে সম্মিলিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি (আইয়ুব ও সুবরামনিয়াম, পৃ. ২)। পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমাজে এক অঞ্চলের নেতৃত্বের অন্য অঞ্চলের প্রতি সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উচ্চমার্গীয় ও প্রভুত্ববাদী আচরণ বর্ণবাদী রূপ পরিগ্রহ করে। আইয়ুব খান এই বর্ণবাদকে তাঁর মৌলিক গণতন্ত্রের নামে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানিদের সম্পর্কে বলেছিলেন, 'এ দেশের জনসংখ্যার সিংহভাগ ভারতীয় গোত্রভুক্ত। পাকিস্তানের জন্মের পূর্বে এদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। তারা এ যাবৎ হিন্দু বর্ণপ্রথা, মুঘল, পাঠান ও ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে। ফলে তাদের মধ্যে এখনো হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি এবং ভাষাতাত্ত্বিক প্রভাব রয়েছে। তারা সব সময় নতজানু জাতি এবং মানসিকভাবে তারা এখনো নব্য-স্বাধীনতার সাথে মানিয়ে নিতে প্রস্তুত নয়' (আইয়ুব ও সুবরামনিয়াম, পৃ. ২-৩)। পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের এ ধরনের আচরণ আতে ঘা সৃষ্টি করে। অথচ পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক উপাদান পূর্ব বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ই জোগান দিয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্য সত্ত্বেও শুধু অবিভক্ত ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণের কারণে পূর্ব বাংলার জনগণ, বিশেষত মুসলিম সম্প্রদায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন করেছিল (পৃ. ৩)। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অবশ্য নব্য শাসকগোষ্ঠীর পূর্বসূরিদের মতো শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখলে অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত ও কৃষক

সমাজের স্বপ্নের সলিল সমাধি ঘটে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের আগে ব্রিটিশরাজে অন্তত সমতার প্রশ্নে কিছু সহযোগিতা পাওয়া যেত। পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজ কলকাতাকেন্দ্রিক বাবুদের 'ভদ্রলোক' বলে বিদ্রূপ করলেও পাকিস্তান রাষ্ট্রে নিজেরা 'ভদ্রলোক' রূপে আবির্ভূত হয়। পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজ পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের শাসকশ্রেণিকে 'অভদ্র' মনে করত, কারণ তারা রবীন্দ্রসংগীত বা কবি কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টি সম্পর্কে জানত না, বুঝত না, কদর করত না (আইয়ুব ও সুবরামনিয়াম, পৃ. ৪)। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা নিজেদের ইন্দো-ইসলামি সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হিসেবে বাঙালিদের নিম্নশ্রেণির এবং রাজনৈতিকভাবে বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন মনে করত। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ সাগরসম ব্যবধান ও বিরোধিতা তৈরি করে এবং ভৌগোলিকভাবে দূরবর্তী অঞ্চল দুটির মধ্যে সম্পর্কের সেতু নির্মাণের আদৌ কোনো সুযোগ অবশিষ্ট ছিল না (আইয়ুব ও সুবরামনিয়াম, পৃ. ৫)। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ঘটনাপরম্পরায় অনিবার্যভাবে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধিতা শুধু সাংস্কৃতিক নয়, বরং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণেও ত্বরান্বিত হয়েছে। আইয়ুব ও সুবরামনিয়াম তাঁদের গ্রন্থে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সামগ্রিক শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের একটি তুলনামূলক ছক উপস্থাপন করেছে (আইয়ুব ও সুবরামনিয়াম, পৃ. ৩৫)। তাঁরা পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের একটি ছকচিত্রও তাঁদের গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন (আইয়ুব ও সুবরামনিয়াম, পৃ. ৪২)। ভিয়েনা স্টাডির ১৯৫৮-৬৮ সময়কালের পরিসংখ্যান অনুসারে, পাকিস্তানের মোট রপ্তানির ৪১ শতাংশ হতো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অথচ মোট আমদানির ৭০ শতাংশ আমদানি করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনে। অথচ পূর্ব বাংলার পাকিস্তানের মোট রপ্তানিতে অংশগ্রহণ ছিল ৫৯ শতাংশ কিন্তু মোট আমদানির মাত্র ৩০ শতাংশ যেত পূর্ব পাকিস্তানে (আইয়ুব ও সুবরামনিয়াম, পৃ. ৪২)। বাজেটের ৭৭ শতাংশ বরাদ্দ থাকত পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য এবং অবশিষ্ট পূর্ব বাংলার জন্য। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দর্শন ছিল 'লোভীদের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা' ভিত্তিক। যার ফলে জাতীয় অর্থনীতির অসমতা আরও সম্প্রসারিত হয় (আইয়ুব ও সুবরামনিয়াম, পৃ. ৪৫)। পূর্ব বাংলার পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গণ-অসন্তুষ্টির প্রধান নিয়ামক ছিল কৃষিক্ষেত্রে বৈষম্য। তৎকালীন সময়ে পূর্ব বাংলার একটি বৃহৎ অংশ কৃষিনির্ভর অর্থনৈতিক জীবনে যুক্ত ছিল। পূর্ব বাংলার কৃষকেরা যেখানে ব্যাপক ধান উৎপাদনের মাধ্যমে 'সবুজ বিপ্লব' ঘটিয়েছিল, সেখানে পূর্ব বাংলার জন্য কৃষি উপকরণ যেমন: বীজ, সার, চাষ ও সেচের যন্ত্রপাতির সীমিত সরবরাহ কৃষকদের জীবন ও জীবিকাকে দুর্বিষহ করে

তোলে (আইয়ুব ও সুবরামনিয়াম, পৃ. ৪৬-৪৭)। রাজনৈতিক আদর্শগত ভিন্নতা এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রশ্নেও ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পাকিস্তানে কখনো আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক সমাজে দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিতে পাঞ্জাবের কর্তৃত্ব বিস্তার এবং পাঞ্জাবি সামরিক-আমলাতান্ত্রিক সভ্যদের অন্যদের, বিশেষত পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজের প্রতি বৈরী মনোভাব ও প্রতিক্রিয়াশীল আচরণ শুধু জাতিগত ঘৃণা ও হিংসা বৃদ্ধি করেছে। জাতিগত এই অসহিষ্ণুতা বাংলাদেশ জেনোসাইডের প্রধান উপজীব্য জাতিগত ঘৃণা পাঞ্জাবি-নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে বাঙালি জাতিকে নৃশংসভাবে নিশ্চিহ্ন করতে প্রণোদিত করে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক কাঠামো পূর্ব বাংলার স্বার্থবিরোধী ছিল (আইয়ুব ও সুবরামনিয়াম, পৃ. ৩০)। আইয়ুব খানকে উৎখাতে গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার জনগণ ইসলামাবাদের প্রতি তাদের অনাস্থা জ্ঞাপন করে। ১৯৫০-এর দশকে আওয়ামী লীগ তরুণ নেতৃত্বের হাত ধরে নবরূপে আবির্ভূত হয়। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবি আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির পাশাপাশি বঞ্চনা ও শোষণে অতিষ্ঠ জনগণের খণ্ডিত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বপ্নগুলোকে এবং রাজনৈতিকভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনায় সংগঠিত করে এবং নব্য জাতি হিসেবে নতুন আত্মপরিচয়ে পরিচিত করে তোলে। ১৯৬৯ সালে ছাত্র-শ্রমিকদের আওয়ামী লীগের ৬ দফাসহ ১১ দফা এবং আইয়ুববিরোধী গণ-অভ্যুত্থান আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তাকে উচ্চশিখরে নিয়ে যায়। ১৯৭০ সালের পাকিস্তানে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তার প্রতিফলন ঘটে (আইয়ুব ও সুবরামনিয়াম, পৃ. ৭৩-৯২)। পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা যত বৃদ্ধি পেয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী, ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী আমলা ও সামরিক সদস্যদের মধ্যে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি অসহিষ্ণুতা ও ঘৃণা তত বেড়েছে (আইয়ুব ও সুবরামনিয়াম, পৃ. ৯৪-১১০)। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাপ্তি সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি, কালক্ষেপণ এবং আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর ও উসকানিমূলক বিদ্বেষী প্রচারণা চালান পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক প্রশাসক এবং পশ্চিম পাকিস্তানে পাঞ্জাবিদের পছন্দের দল হিসেবে আবির্ভূত পিপলস পার্টির কান্ডারি জুলফিকার আলী ভুট্টো। জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর পূর্ব কর্মসূত্রে পাঞ্জাবি-নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র ও সামরিক প্রশাসনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সুসম্পর্কের ফায়দা নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগকে নিষ্ক্রিয় করতে সচেষ্ট হন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে

জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক প্রশাসনকে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং কর্মী ও সমর্থকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণে ইন্ধন জোগান। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে জাতিগত, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক বৈষম্য জাতিগত ঘৃণা, পারস্পরিক মতবিরোধ তৈরি করে এবং গণতান্ত্রিক ও মানবিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতার অপমৃত্যু ঘটায়। অবিভক্ত পাকিস্তানের শাসকশ্রেণির স্বৈরাচারী ও বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণের জন্য পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মতৈক্যের শেষ সম্ভাবনাও নস্যাৎ হয়ে যায় ।

বাংলাদেশ জেনোসাইডের সংক্ষিপ্তসার

বাংলাদেশে পাকিস্তানের সামরিক অভিযান যে পূর্বপরিকল্পিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৭১ সালে *দ্য টেলিগ্রাফ*-এর দক্ষিণ এশীয় সংবাদদাতা ডেভিড লোসাকের বক্তব্যে, '১৯৭১ সালের শুরুর দিকে করাচি থেকে ঢাকাগামী পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক বিমানের ফ্লাইটে আসন খালি পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার ছিল...রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান অভিযানের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন...ইতিমধ্যে ২০ হাজার পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য পূর্বাঞ্চলে পাঠানো হয়েছে।...জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তাদের পরিকল্পনা অনুসারে দখলদার সেনাবাহিনীর জনবল ৩৫-৪০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৬০ হাজার করা হয়েছে এবং ৩ হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে সৈন্যদের তাদের নতুন কর্মস্থলে যোগদান করতে হয়েছে।'[১]

পাকিস্তানি সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে ব্রিটিশ দৈনিক *গার্ডিয়ান*-এ দেওয়া সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবুর রহমানের অর্থবিষয়ক উপদেষ্টা রেহমান সোবহান বলেন, 'আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের শক্তির যে পরিচয় পাওয়া গেছে, তা বিবেচনায় রেখে দুই বছর ধরে সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা রচনা করা হয়।...লে. জেনারেল ইয়াকুবের স্থলে পাঞ্জাবি জেনারেলদের মধ্যে ভয়ংকর হিসেবে পরিচিত লে. জেনারেল টিক্কা খান ৭ মার্চ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।'[২]

২৫ মার্চ, ১৯৭১ থেকে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানিরা যে নৃশংস হামলা শুরু করে তার প্রস্তুতি কয়েক মাস ধরে চলছিল। ৭ মার্চ, ১৯৭১ ওয়ার্কিং পিপলস ডেইলি (রেঙ্গুন) প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, জাহাজ ও বিমানে করে পূর্ব পাকিস্তানে বিপুল পরিমাণে সমরাস্ত্র ও জনবল পাঠানো হচ্ছে (আইয়ুব ও সুবরামনিয়াম, পৃ. ১৩৮)। ১৯৭১ সালের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানে চারটি ব্রিগেড ছিল কিন্তু ২৫ মার্চের মধ্যে ব্রিগেড সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। ২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে পাঞ্জাবি ও বেলুচ সেনাদের ২৭টি ব্যাটালিয়ন অবস্থান নিয়েছিল। ২৫ মার্চ

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হামলা শুরু হলে কোনো পক্ষের আর পিছু হটার বা বিকল্প পন্থায় বিরোধ নিষ্পত্তির শেষ সুযোগটুকুও শেষ হয়ে যায়। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হামলা শুরুর পর জীবন বাঁচাতে ভারতে আশ্রয়প্রার্থী শরণার্থীদের প্রথম দলটি ছিল আওয়ামী লীগের কর্মী এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সদস্যদের। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ধারণা অনুযায়ী, পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু বা সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় মূলত ভারতের নাগরিক। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর হামলার অন্যতম লক্ষ্য ছিল সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নিধন।[৩] পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হামলা থেকে জীবন রক্ষার্থে এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে ভারতে আশ্রয়প্রার্থী সনাতন ধর্মাবলম্বী শরণার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৬ আগস্ট, ১৯৭১ ভারতীয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী আগত শরণার্থীদের মধ্যে প্রায় ৭০ লাখ সনাতন ধর্মাবলম্বী, প্রায় ৬ লাখ মুসলিম ধর্মাবলম্বী এবং প্রায় ১ লাখ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছিল।[৪] পাকিস্তানের ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ জেনোসাইডে যদি বাংলাদেশ দাবিকৃত নিহতের সংখ্যা অর্ধেকও ধরা হয় তবুও এটি বিশ্ব ইতিহাসে অন্যতম নৃশংসতম জেনোসাইড। এত স্বল্প সময়ে এত মানুষ হত্যার ঘটনা আগে কোনো জেনোসাইডে ঘটেনি। অথচ দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিশ্বের তৎকালীন মোড়ল ও মানবাধিকারের কান্ডারি রাষ্ট্রগুলোর অভিব্যক্তি, মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোসেফ সিসকোর ভাষায়, 'সম্পূর্ণভাবে অভ্যন্তরীণ বিষয়' (মেহরিস, পৃ. ২)। বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হামলায় নিহত মানুষের সংখ্যা হিরোশিমায় ৭৫ বার পারমাণবিক হামলা চালানো হলে যে পরিমাণ মানুষ নিহত হবে তার সমান। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাংলাদেশে জেনোসাইড ও যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত করেছে তার প্রমাণ মেলে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের বয়ানে। বিদেশি পর্যবেক্ষকেরা তালিকা অনুসারে পাকিস্তানি সামরিক সদস্যদের অনেক বাঙালিকে আটক করতে দেখেছেন, যাঁদের পরে কোনো হদিস পাওয়া যায়নি বলে তাঁরা জেনেছেন। বিশ্বব্যাংকের মাঠপর্যায়ের অনুসন্ধানী দলের প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলাদেশের শহরগুলোর পরিস্থিতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপে কৌশলগত বোমা হামলার পর শহরগুলোর মতো।[৫]

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী এবং আলবদর, আলশামস ও রাজাকার নামে পরিচিত বাংলাভাষী ও উর্দুভাষী দোসরদের সমন্বয়ে গঠিত বেসামরিক সশস্ত্র দলগুলো কর্তৃক সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ ও জেনোসাইডের জন্য প্রাগুক্ত ট্রাইব্যুনালগুলোর আদলে বিচার এবং দণ্ডাদেশ প্রদান যুক্তিযুক্ত কি না তা একটি গুরুতর প্রশ্ন হিসেবে আবির্ভূত হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যা ঘটেছে, তা বিশ্বের মানবিক মনোভাবাপন্ন দেশগুলোর সরকার ও জনগণকে আচম্বিত করেছে। মাত্র ৯ মাসের মধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করলেও,

বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছে। দখলদারির সময় পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলাদেশের সর্বত্র হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। শিশু, যুবা, নারী, বৃদ্ধ কেউ তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করেছে, গ্রাম অবরুদ্ধ করে সব গ্রামবাসীকে হত্যা করেছে। হত্যার সাথে সাথে তারা হাজার হাজার যুবতী, কিশোরীকে ধর্ষণ করেছে, বহু নারীকে শিবিরে আটকে রেখে ধর্ষণ করেছে দিনের পর দিন। এসব নারী যাতে আত্মহত্যা না করতে পারে সে জন্য অনেক শিবিরে তাদের বিবস্ত্র রাখা হতো। পাকিস্তানিরা বাঙালি ও এদেশীয় সংখ্যালঘুদের নিম্নস্থ মানুষ মনে করত। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ধর্ষণকে বাঙালি জাতির মান উন্নয়ন-প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করত। তাদের প্রত্যাশা ছিল তাদের নির্যাতনের কারণে অন্তঃসত্ত্বা বাঙালি নারীদের গর্ভজাত সন্তানেরা বাংলাদেশে উন্নত মুসলিম নাগরিক হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহক হবে। সাধারণ সেনাসদস্য থেকে সামরিক কর্মকর্তা নিয়াজি পর্যন্ত সবাই এই জঘন্য কাজে অংশ নিয়েছে। পাকিস্তানিদের অত্যাচার, উৎপীড়নে প্রায় ১ কোটি লোক শরণার্থী হয়ে আশ্রয় নিয়েছে ভারতে। পাকিস্তানিদের এসব জঘন্য কাজে মদদ দিয়েছে শান্তি কমিটির লোকজন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছে আলবদর, আলশামস ও রাজাকার নামে গঠিত বাহিনীগুলো। সহযোগিতা করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, নিজেরাও পাকিস্তানি সৈন্যদের মতো খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠনসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে অংশ নিয়েছে। শত্রুমুক্ত হওয়ার প্রাক্কালে রাজাকার, আলশামস, আলবদর বাহিনী পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তাদের নীলনকশা অনুসারে দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের গুম ও হত্যা করে।

পরিসংখ্যান ও নৃশংসতার বিচারে বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে সংঘটিত জেনোসাইড, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ ছিল জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা হামলা বা ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসন কিংবা হিটলার যুগে জার্মানিতে ইহুদি নিধনের অপেক্ষা লোমহর্ষক। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের বৃহত্তর নৃগোষ্ঠী বাঙালিসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে পরিচালিত নিধনযজ্ঞকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায় শুরু হয় ঢাকাতে মার্চের শেষভাগে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান মারফত জানা যায়, মার্চের শেষ সপ্তাহে ঢাকাতে পাকিস্তানি সেনারা লাগাতার হত্যাযজ্ঞ ও সন্ত্রাস চালিয়েছে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশি শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সমাজ। এ সময়কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ অন্তত শতাধিক শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানরত সব ছাত্রী নিখোঁজ ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ের নিধনযজ্ঞ ঢাকা অভিযানের পরপর শুরু হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ

নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হচ্ছে আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল সম্পূর্ণ বাঙালি সমর্থকগোষ্ঠীকে ধ্বংস করা। পাকিস্তানিদের বাঙালি জনগোষ্ঠী ধ্বংসের পাঁয়তারা যে পূর্বপরিকল্পিত ছিল, সে বিষয়ে আরও নিশ্চিত হওয়া যায় পাকিস্তানিদের বর্বরতা সম্পর্কে মার্কিন সিনেটর অ্যাডলি স্টিভেনসন বলেছিলেন, 'বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংসের জন্য সুপরিকল্পিত কৌশল।'[৬] বস্তুত, পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষের বাঙালি নিধন আক্ষরিক অর্থে জেনোসাইড ছিল। কারণ, এ ক্ষেত্রে পরিকল্পনানুসারে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয় ও ভাষাগতভাবে ভিন্নতাহেতু স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠীর লোকদের ধ্বংসের লক্ষ্যে হত্যা, ব্যাপকভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে। ডিসেম্বরে বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর যৌথ বাহিনীর অভিযান শুরু হওয়ার পর তৃতীয় পর্যায়ের নিধনযজ্ঞ শুরু হয়। পাকিস্তানি বাহিনী এবং তাদের আলবদর ও রাজাকারদের সমন্বয়ে গঠিত আধা সামরিক বাহিনী তাদের সামরিক ব্যর্থতার হতাশাপ্রসূত ক্ষোভ ও জিঘাংসা চরিতার্থ করতে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের গুম ও হত্যা করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শেষে নিখোঁজ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে শুধু ২০০ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। অনেকের মৃতদেহ ও শেষ অবস্থান সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোনো খবর পাওয়া যায়নি। পরিকল্পিতভাবে ব্যাপক হারে এ ধরনের গুমের ঘটনার নজির কেবল আর্জেন্টিনা ও চিলির 'ডার্টি ওয়ারে' পাওয়া যায়।[৭] সন্দেহাতীতভাবে বাংলাদেশে বাঙালিদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী পরিচালিত নৃশংস হামলাকে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ন্যুরেমবার্গ সামরিক ট্রাইব্যুনালের বিচারে ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এ ধরনের অপরাধের জন্য দায়ী অক্ষশক্তির সামরিক কর্মকর্তাদের শাস্তির বিধান করা হয়। ট্রাইব্যুনাল নাৎসি সামরিক কর্মকর্তাদের ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগে ও যুদ্ধের সময় হিটলার কর্তৃক পরিকল্পিত জেনোসাইডের বাস্তবায়নে যুক্ত থাকার জন্য দোষী সাব্যস্ত করে দণ্ড দেয়। আর জে রামেল তাঁর *ডেথ বাই গভর্নমেন্ট* (১৯৯৪) গ্রন্থে বাংলাদেশ জেনোসাইড সম্পর্কে বলেন, শুধু ২৬৭ দিন ধরে মানুষের মৃতের সংখ্যা ছিল অবিশ্বাস্য। বাংলাদেশ পত্রিকার সূত্রমতে এবং তদন্ত কমিটি প্রকাশিত শুধু আঠারো জেলার মধ্যে পাঁচটির পরিসংখ্যান অনুসারে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কুমিল্লায় পঁচানব্বই হাজার, ঢাকায় এক লাখ, খুলনায় এক লাখ পঞ্চাশ হাজার, যশোরে পঁচাত্তর হাজার এবং চট্টগ্রামে এক লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছে। আঠারো জেলার প্রাথমিক পরিসংখ্যান অনুসারে, মোট নিহত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ১২,৪৭,০০০ (মেহরিস, পৃ. ৩)। হতাহতের সংখ্যা তত্ত্বের বিচার কিংবা উদ্দেশ্যের বিচারেও বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সামরিক অভিযানের নামে যে বাঙালি পরিচয়ে পরিচিত জাতিকে

নিশ্চিহ্ন করতে চেষ্টা করেছে, তা অনস্বীকার্য।

পাকিস্তান সরকার অধিকাংশ বিদেশি সংবাদদাতাকে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগে বাধ্য করলেও তাঁদের অনেকে বাংলাদেশ পরিস্থিতির সংবাদ গোপনে সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন (মেহরিস, পৃ. ১১১)। পাকিস্তান সরকার ৩৫ জন বিদেশি সাংবাদিককে বহিষ্কারের বিষয়টি ২৮ মার্চ, ১৯৭১ *নিউইয়র্ক টাইমস*-এ গ্রেস লিকটেনস্টেইনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ও রয়টার্সের দুজন সাংবাদিক এই সময় হোটেলে উপস্থিত ছিলেন না। প্রতিবেদনে দ্য *টাইমস*-এর স্যুয়েনবার্গের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, যখন তিনি ওই এলাকার ভারপ্রাপ্ত লে. কর্নেলকে তাঁদের ঢাকা ত্যাগের নির্দেশ প্রদানের কারণ জানতে চান তখন অফিসারের মন্তব্য ছিল, 'আমরা তোমাদের নিরাপত্তা ঝুঁকির জন্য তোমাদেরকে চলে যেতে বলছি। এখানে অনেক রক্তারক্তি হবে।' দ্য *টাইমস*-এর পক্ষ থেকে পাকিস্তান সরকারের কাছে পাঠানো একটি টেলিগ্রামে স্যুয়েনবার্গ এবং অন্য সাংবাদিকদের সঙ্গে পাকিস্তান সামরিক প্রশাসনের অশোভন আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।[৮] ৩১ মার্চ, ১৯৭১ *গার্ডিয়ান*-এ প্রকাশিত 'দ্য ম্যাসাকার ইন পাকিস্তান' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়, '...বাঙালিরা মারা যাচ্ছে...ঢাকার ভাগ্যে যা ঘটছে তা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ...সবার এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া উচিত।'[৯]

আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধাপরাধ ও জেনোসাইড

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশেষত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে জেনোসাইড-বিষয়ক ঘোষণা স্বাক্ষরের পর আন্তর্জাতিক অপরাধসংক্রান্ত আইনের প্রয়োজনীয়তা ও প্রায়োগিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় (মেহরিস, পৃ. ৪)। আন্তর্জাতিক আইনানুসারে অপরাধের সংজ্ঞায়নের সঙ্গে কোন ধরনের ব্যবস্থার মাধ্যমে এ ধরনের অপরাধের বিচার হবে তা সম্পর্কিত। সর্বজনীন আইনের লঙ্ঘনের (ডেলসিটি জুরিস জেনথাম) বিষয়টি আন্তর্জাতিক আইনের ক্লাসিক্যাল দলিল প্রস্তুতকারীদের দ্বারা স্বীকৃত এবং বিভিন্ন দেশের সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় ঘোষণাপত্র প্রণয়নে প্রয়োগ হয়ে আসছে (মেহরিস, পৃ. ৪)। ১৯ শতকে প্রচলিত ঘোষণাপত্রসমূহ অনুসারে রাষ্ট্রীয় আদালতগুলোর শুধু অপরাধের বিচারের বিচারিক ক্ষমতা ছিল কিন্তু অপরাধের সংজ্ঞায়ন বহুলাংশে আন্তর্জাতিক আইনের ঘোষণাপত্রসমূহের ওপর নির্ভরশীল ছিল (মেহরিস, পৃ. ৫)। কুইন্সি রাইট আন্তর্জাতিক আইনের মূলনীতিগুলো বিশ্লেষণ এবং অপরাধ আইন অনুসারে আন্তর্জাতিক আইনের বিরুদ্ধে অপরাধের সংজ্ঞায়নে বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ হলো এমন ধরনের আইন পরিপন্থী কার্যক্রম, যা আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা সংরক্ষিত সর্বজনীন কিছু

অধিকার অথবা আইন লঙ্ঘন সম্পর্কিত ধারণা, এবং এ ধরনের পরিপন্থী কার্যক্রম কোনো রাষ্ট্রের প্রচলিত অপরাধ আইনের দ্বারা বিচার্য নয় (মেহরিস, পৃ. ৫)।' ১৯৭০-এর দশকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনের অন্তত ছয়টি মতবাদ প্রচলিত ছিল। ওই সময়কাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আইনে অপরাধসংক্রান্ত আইন বিবর্তিত হয়নি। জাতিসংঘে কিছু রাষ্ট্রের ভেটো নামক বিশেষ ক্ষমতা অনেকাংশে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনের প্রয়োগকে পক্ষপাতদুষ্ট এবং অন্তঃসারশূন্য করে ফেলে। যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রশ্ন আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞদের মধ্যে বিতর্কের জন্ম দেয়। ন্যুরেমবার্গ বিচারের মূলনীতিগুলোর ন্যায্যতার প্রশ্নে আইনজ্ঞদের মধ্যে পরিস্থিতি বিচারে দুটি তাত্ত্বিক ধারা তৈরি হয়। প্রথম ধারা অনুসারে, বিশ্বে কোনো সর্বজনীন আন্তর্জাতিক আইনব্যবস্থা নেই, যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ করে আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচার করা সম্ভব। অন্য ধারা অনুসারে, ক্ষতিগ্রস্ত জাতি বা গোষ্ঠীর অবশ্যই তার বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের জন্য বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালে বিজেতা ও বিজিতদের যুদ্ধে ভূমিকার ওপর ভিত্তি করে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিচার করা হয়। এই ধারাটি আমেরিকার আইনজ্ঞরা বিশেষভাবে সমর্থন করেন এবং ন্যুরেমবার্গ ও টোকিও ট্রাইব্যুনালের বিচারের বৈধতা ও ন্যায্যতার প্রশ্নে তাঁরা বিজয়ী ন্যায় প্রতিষ্ঠিত, এই যুক্তি দিয়ে থাকেন।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে জেনোসাইড মানব ইতিহাসে পুরোনো একটি বিষয়। পশ্চিমা সভ্যতার ইতিহাস খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে রোমের জেনোসাইডের মাধ্যমে তা সূচিত হয়েছে (মেহরিস, পৃ. ২৭)। অবশ্য পশ্চিমা বিশ্বের মতানুসারে হিটলারের ইহুদিদের বিরুদ্ধে হোলকাস্ট সর্বাপেক্ষা নৃশংস জেনোসাইড। মাত্রার বিচারে বাংলাদেশের জেনোসাইড কোনো অংশে হোলকাস্টের চেয়ে কম নৃশংস ছিল না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিশ্বরাজনীতির মেরুকরণের মারপ্যাঁচে এবং অস্বীকৃতির রাজনীতির কুটিল ষড়যন্ত্রে বাংলাদেশ জেনোসাইড বিশ্বসমাজে অজানা রয়ে গেছে।

বিশ্বের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধাপরাধের বিচার ও বাংলাদেশের করণীয় এবং স্মরণীয়

বিশ্ব ইতিহাসে যুদ্ধাপরাধের বিচার নতুন কোনো বিষয় নয়। গ্রিক পৌরাণিক কাহিনি ও মধ্যযুগে যুদ্ধাপরাধের বিচারের একাধিক নজির পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রিসে অনেক যুদ্ধবন্দী যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত হওয়ার পর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন (মেহরিস, পৃ. ৩৬)। ইউরোপের ত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক আইনের বিবর্তনে বিপ্লব ঘটে। এই বিপ্লব যুদ্ধাপরাধের বিচারের ইতিহাস পরিবর্তন করে। আঠারো শতকের মধ্যভাগে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে

অনেক ব্যক্তির আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের জন্য বিচার করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ ১৭৯৬ সালে ব্রিটিশ আদালত একজন কর্মকর্তাকে ফরাসি বন্দীদের নষ্ট ও খারাপ খাবার পরিবেশনার মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজকে কলঙ্কিত করার কারণে দণ্ডিত করে (মেহরিস, পৃ. ৩৭)। বাংলাদেশের পাকিস্তানি সামরিক ও বেসামরিক যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নে স্বাধীনতার পর যে বিচার-প্রক্রিয়ার উদাহরণ ছিল তার মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের জন্য অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত লিপজিগ ট্রাইব্যুনাল, ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল, টোকিও ট্রাইব্যুনাল, ইতালিতে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ট্রাইব্যুনাল উল্লেখযোগ্য (মেহরিস, পৃ. ৩৭-৫৮)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য অধিকাংশ ট্রাইব্যুনাল ছিল সামরিক কিন্তু যেসব দেশ এই বিচারের ব্যবস্থা করেছিল তাদের অধিকাংশ সে সময়ে বেসামরিক ও গণতান্ত্রিক সরকারের শাসনাধীনে ছিল। মূলত যুদ্ধাপরাধ সাধারণত সামরিক ও সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত হয়, এই চিন্তাধারা থেকে সামরিক ট্রাইব্যুনালগুলো গঠন করা হয়েছিল বলে অনুমেয়। পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের কোনো স্বতন্ত্র সামরিক বাহিনী ছিল না। একটি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নামে শুধু একটি সামরিক রেজিমেন্ট ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে সামরিক বাহিনী তখনো শৃঙ্খলিতভাবে ও কাঠামোবদ্ধভাবে গড়ে ওঠেনি, কারণ প্রাক্তন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তরে অবস্থান করছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে স্বভাবতই বাংলাদেশ সাংবিধানিক এখতিয়ার অনুসারে আইন প্রণয়ন করে বেসামরিক আদালতের মাধ্যমে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার প্রয়াস পায়।

যুদ্ধাপরাধী ও যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রশ্ন

যুদ্ধ একটা অস্বাভাবিক অবস্থা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যা হয়েছে তা শুধু জেনোসাইড শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর মধ্যে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড এবং নির্বিচারে গণহত্যাও রয়েছে। ১৯৭১-৭২ সালে আমাদের দেশে আন্তর্জাতিক সাংবাদিকেরা এবং পরবর্তী সময়ে সফরকারী বিদেশি পর্যবেক্ষক দলগুলো তাদের প্রতিবেদনে বাংলাদেশে চরম মাত্রায় জাতিগত গণহত্যা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে। সফরকারীরা বিভিন্ন শরণার্থী শিবির, নির্যাতিতদের জবানবন্দি শোনার পর আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞরা ১৯৭২ সালে নিশ্চিত করেছেন যে বাংলাদেশে পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম বৃহত্তম জেনোসাইড সংঘটিত হয়েছে।

যুদ্ধাপরাধের বিচারের বিষয়টি সব সময় জটিল ও কুটিল। মধ্যযুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন পরিসরে ও পরিমণ্ডলে যুদ্ধাপরাধের বিচার করা

হয়েছে। আঠারো শতকে আন্তর্জাতিক অপরাধের জন্য অনেক ব্যক্তির বিচার হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বেসরকারি উদ্যোগে আন্তর্জাতিক আইনের প্রশাসক হিসেবে আন্তর্জাতিক আদালত গঠন করে জাতীয় আইন ও বিধি পরিপন্থী অপরাধের বিচারের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ্ব ইতিহাসে অবশ্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধাপরাধ বিচারের বিচারিক আদালত হচ্ছে ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল এবং টোকিও ট্রাইব্যুনাল। অবশ্য নাৎসি যুদ্ধাপরাধী অ্যাবলফ আইকম্যানের বিচার যুদ্ধাপরাধ বিচারের অনন্য উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হবে। এই ট্রাইব্যুনালদ্বয়ে যুদ্ধাপরাধের বিচারের বিচারিক অধিকার, এখতিয়ার এবং ট্রাইব্যুনালের গঠন-প্রক্রিয়া নিয়ে অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যেমনটি ঘটছে এখন বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে। এই ট্রাইব্যুনালগুলোর রায়সমূহও বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রদত্ত রায়গুলোর মতো বিভিন্ন ধরনের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। ন্যুরেমবার্গ ও টোকিও ট্রাইব্যুনালের অভিজ্ঞতার পর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত দুর্বিষহ ঘটনামালা এবং পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী যে ধরনের নৃশংসতার উদাহরণ সৃষ্টি করেছে তাতে করে যুদ্ধাপরাধ ও জেনোসাইডের পুনঃপাঠ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

হামুদুর রহমান কমিশনের প্রতিবেদন মোতাবেক পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীর মোট সংখ্যা ছিল ৯০ হাজার ৩৬৮, যার মধ্যে স্থলবাহিনীর ৫৪ হাজার ১৫৪ জন, নৌবাহিনীর ১ হাজার ৩৮১ জন, বিমানবাহিনীর ৮৩৩ জন, পুলিশসহ প্যারামিলিটারির ২২ হাজার জন, বেসামরিক ১২ হাজার লোক ছিল। বাংলাদেশ জাতিসংঘ স্বীকৃত রাষ্ট্র না হওয়ায়, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে স্বাক্ষরিত আত্মসমর্পণের দলিল ও জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ ডিসেম্বর তারিখে গৃহীত ৩০৭ (১৯৭১) নম্বর রেজল্যুশন মোতাবেক জেনেভা কনভেনশন ১৯৪৯-এর আওতায় প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যে সব যুদ্ধবন্দীকে নিয়ে যাওয়া হয় ভারতে।

বাংলাদেশ সরকার প্রথম থেকে যুদ্ধাপরাধ-বিষয়ক জেনেভা কনভেনশন অনুসারে কেবল যুদ্ধাপরাধ ও জেনোসাইডের দায়ে অভিযুক্ত পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দী এবং তাদের দোসরদের বিচারে সংকল্পবদ্ধ ছিল। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপর বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালের জুলাই মাসের মধ্যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরুর নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়।[১০] বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর দোসর ও রাজাকার এবং যুদ্ধবন্দী যেসব সামরিক কর্মকর্তা ও সদস্যের বিরুদ্ধে প্রাথমিক পর্যায়ে অভিযোগ পাওয়া গেছে, তাদের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ তদন্ত এবং বিচার-প্রক্রিয়া শুরুর প্রয়াস নেয়। পাকিস্তানের তৎকালীন জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল টিক্কা খানকে হুকুমের আসামি করার পরিকল্পনা নেয়। বাংলাদেশ সরকার ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল এবং জাতিসংঘের

জেনোসাইড কনভেনশনের ভিত্তিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ নেয়। বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধ বিচারে প্রধান অন্তরায় ছিল তখন পর্যন্ত পাকিস্তান জেনোসাইড কনভেনশন স্বাক্ষর করেনি। অন্যদিকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং প্রতিশোধস্পৃহার কারণে যাতে কোনো যুদ্ধবন্দীর জীবন বিপন্ন না হয় সে জন্য পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের ভারতীয় বাহিনীর হেফাজতে রাখা হয়েছিল। বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগকে ঘিরে বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয় :

- যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বাংলাদেশের আইনি এখতিয়ার আছে কি?
- বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল ও আইকম্যানের মামলা উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করার যথার্থতা কতটুকু?
- বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে কী ধরনের প্রক্রিয়া এবং আইনি রূপরেখা অনুসরণ করা হবে?

বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তান সরকারকে যুদ্ধাপরাধ ও জেনোসাইডের দায়ে অভিযুক্ত যারা পাকিস্তানে অবস্থান করছে তাদের বাংলাদেশ সরকারের কাছে হস্তান্তর করার জন্য চাপ সৃষ্টির প্রয়াস নেয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে এম কামারুজ্জামান ১৯৭১ সালের ২৪ ডিসেম্বর ঘোষণা করেন, বাংলাদেশ ৩০ জন শীর্ষস্থানীয় পাকিস্তানি সরকারি কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করেছে এবং গণহত্যায় সহযোগিতার জন্য অচিরেই তাদের বিচার হবে। শেখ মুজিবুর রহমান ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের বন্দিত্ব ঘুচিয়ে দেশে ফেরার পর আমেরিকান ব্রডকাস্টিং করপোরেশন বা এবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নে বলেন, 'আমি অবশ্য তাদের বিচার করব। কোনো দেশ কি ৩০ লক্ষ লোকের হত্যাকারীদের (বিনা বিচারে) মুক্তি দিতে পারে?' স্বাধীনতার পরপর বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে সরকারি ও বেসরকারি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে শুমারির মাধ্যমে হতাহতের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করার কার্যক্রম শুরু করে। ১২ সদস্যবিশিষ্ট সরকারি তদন্ত কমিটির সভাপতি আবদের রহমান মার্চ, ১৯৭২ অদ্যাবধি সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নিহত ব্যক্তির সংখ্যা তিন লাখে পৌঁছেছে বলে সংবাদমাধ্যমগুলোকে জানান। বাংলাদেশে ১৫ জানুয়ারি, ১৯৭২ বুদ্ধিজীবীরা জেনোসাইড ও পৈশাচিক নিপীড়নের দায়ে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজি ও মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলির বিচার দাবি করেন (মেহরিস, পৃ. ১০৯)। বাংলা একাডেমির তৎকালীন পরিচালক কবির চৌধুরী বলেন, 'এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অবিলম্বে এসকল যুদ্ধাপরাধীকে শাস্তি প্রদানের জন্য তাদের অপরাধ তদন্তে তদন্ত কমিশন গঠনের জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের ওপর চাপ সৃষ্টি করা।'[১১] তিনি আরও বলেন, 'পাকিস্তানি

সেনারা এবং তাদের দোসররা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তারসহ বহু বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে।'[১২] তিনি এই হত্যাকাণ্ডকে পরিকল্পিত এবং জেনারেল নিয়াজি ও রাও ফরমান আলিসহ অন্য পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। তিনি ভারতের হেফাজতে থাকা অভিযুক্ত পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তাদের বিচার দাবি করেন। কবির চৌধুরীসহ আন্দোলনকারীরা ওয়ার্ল্ড জুরিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিল, সোভিয়েত রাষ্ট্রপতি লরেড ব্রেসনেভ, হ্যারল্ড উইলসন, সিনেটর অ্যাডওয়ার্ড কেনেডিসহ অন্যান্য বিশ্বনেতাকে দায়ী পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের বিচারে যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবি জানিয়ে চিঠি দেন (মেহরিস, পৃ. ১০৯)। ভারত সরকার জেনোসাইড, যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের জেনেভা ঘোষণা অনুসারে অব্যাহতি পাওয়া সমীচীন নয় বলে জাতিসংঘকে অভিহিত করে। এসব অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আন্তর্জাতিক আইন ও সংক্ষুব্ধ ক্ষেত্রের বিধি অনুসারে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বাহিনীর কাছে বাংলাদেশের পক্ষে হেফাজতে দেওয়ার দাবি জানানো হয় (মেহরিস, পৃ. ১০৮)। জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সামার সেন ভারত সরকারের এই অবস্থানের বিষয়টি জাতিসংঘ মহাসচিব কার্ট ওয়াডহেইমকে ১৪ জানুয়ারি, ১৯৭২ প্রেরিত চিঠিতে অবহিত করেন।[১৩] ২১ জানুয়ারি, ১৯৭২ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মাটিতে সংঘটিত জেনোসাইডের বিচারকল্পে ট্রাইব্যুনাল গঠনের জন্য জাতিসংঘের প্রতি অনুরোধ জানান (মেহরিস, পৃ. ১১০)। উল্লেখ্য, তৎকালীন সময়ে জাতিসংঘ যেহেতু ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রস্তাব বিবেচনা করেনি, সেহেতু বর্তমান প্রেক্ষাপটে নৈতিকভাবে বাংলাদেশের স্বউদ্যোগে গঠিত ট্রাইব্যুনালের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে না। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিলকে জাতিসংঘের যুদ্ধাপরাধ বিচারে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে অনুরোধ করতে আহ্বান জানান।[১৪] পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে প্রথম সরকারি পদক্ষেপ হিসেবে অভিযুক্ত যুদ্ধবন্দীদের হস্তান্তরের জন্য ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারকে অনুরোধ করে। ভারত সরকার প্রাথমিক অভিযোগ (প্রাইমাফেসি) প্রমাণিত এমন যুদ্ধবন্দীদের বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তরে রাজি হয়। ১৯৭২ সালের ২৯ মার্চ লে. জে. এ এ কে নিয়াজি, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলিসহ ১ হাজার ১০০ পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিচারের সরকারি পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়।[১৫] বাংলাদেশ সরকার দুই স্তরবিশিষ্ট একটি বিচার পরিকল্পনা পেশ করেছিল। সে সময় ভারত শুধু সেসব পাকিস্তানি সৈন্যকে হস্তান্তর করতে রাজি হয়, যাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার প্রমাণিত অভিযোগ হাজির

করতে সক্ষম হয়েছিল।[১৬] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ এপ্রিল ১৯৭২ বাংলাদেশের মাটিতে যেকোনো মূল্যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে বলে পুনরায় সংকল্প ব্যক্ত করেন। আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটির বৈঠকে তিনি বলেন, 'যারা অভিযুক্ত নন তাদের প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা হবে।'[১৭] পরবর্তী সময়ে তিনি এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালি ও যুদ্ধাপরাধীদের অভিন্নভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে না।'[১৮] কানাডার আলব্রাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক আইনের অধ্যাপক এল সি গ্রিন ১৯ এপ্রিল, ১৯৭২ নয়াদিল্লিতে ইন্ডিয়ান ল ইনস্টিটিউটে বক্তৃতাকালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়ে বলেছিলেন যে এই বিচার-প্রচেষ্টা অনেক সমস্যা ও প্রশ্নের জন্ম দেবে (মেহরিস, পৃ. ১১১)। তাঁর মন্তব্যটি সময়ের পরিক্রমায় আজ অবধি সত্য প্রমাণিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ সরকারের সংগৃহীত প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের ১৪ জুন ভারত সরকার প্রাথমিকভাবে নিয়াজিসহ ১৫০ জন যুদ্ধবন্দীকে বিচারের জন্য বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তরে সম্মত হয়।[১৯] পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার-প্রক্রিয়া রুখতে মরিয়া জুলফিকার আলী ভুট্টো গণচীনকে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ অর্জন ভেটো ক্ষমতা ব্যবহার করে স্থগিত করতে সম্মত করে। ১৯৭২ সালের ২৫ আগস্ট পাকিস্তানের স্বার্থে গণচীনের প্রদত্ত ভেটোর কারণে বাংলাদেশের জাতিসংঘে যোগদান সম্ভবপর হয়নি।[২০] উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংসদে পাস করে। তবে ১৫০ যুদ্ধবন্দীকে বিচারের জন্য বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করতে রাজি হয়নি ভারত।

চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৩ (১) (ঘ) অনুসারে যুদ্ধবন্দীদের বিচারের প্রসঙ্গে শর্ত ছিল যে অভিযুক্ত যুদ্ধবন্দীদের বিচারের জন্য সভ্য জাতিসমূহের স্বীকৃত বিচারিক সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করার মাধ্যমে নিয়মসম্মতভাবে গঠিত আদালতের রায় দ্বারা তাদের বিচার ও রায় কার্যকর করা যাবে। বাংলাদেশকে এই অনুচ্ছেদের প্রয়োগ থেকে বিরত রাখতে ১৯৭৩ সালের ২৭ মে, ভুট্টো পাকিস্তানে আটক ২০৩ জন জ্যেষ্ঠ বাঙালি কর্মকর্তাকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে একই ধরনের আদালতে বিচার করা হবে বলে হুমকি দেন।[২১] ভুট্টোর হুমকি সত্ত্বেও, বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩ প্রণয়ন করে। আইনটি জেনেভা কনভেনশনের সঙ্গে যাতে বিরোধপূর্ণ না হয় সে জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ নম্বর ৪৭-এ একটি অতিরিক্ত ধারা সংযুক্তির দ্বারা গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধসহ অন্যান্য অপরাধের বিচারের পথ সুগম করা হয় এবং ৪৭(ক) নামে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন দ্বারা এসব বিচারের ক্ষেত্রে বিচারাধীন অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মৌলিক অধিকার সীমিত করা হয়।

বাংলাদেশ আইনটি প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে ভারত যাতে যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত যুদ্ধবন্দীদের বাংলাদেশের হাতে তুলে না দেয়, সে জন্য ভুট্টো ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসে মামলা দায়ের করেন।[২২] ১৯৭৩ সালের ২৮ আগস্ট ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিল্লি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা যথাক্রমে ড. কামাল হোসেন, শরণ সিং এবং আজিজ আহমেদ। এই চুক্তি অনুসারে অভিযুক্ত ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী ব্যতীত সব পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দী এবং পাকিস্তানে আটক সব বাঙালির স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত হয়। চুক্তির অন্যতম সিদ্ধান্ত ছিল বাংলাদেশ সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদায় পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশে অবস্থানরত উর্দুভাষী পাকিস্তানি এবং অভিযুক্ত যুদ্ধবন্দীদের ভাগ্য প্রশ্নে প্রত্যক্ষভাবে আলোচনা করবে। ঘটনাপরম্পরায় সে সময় পাকিস্তানে আটকে পড়া কয়েক হাজার ভারতীয় সেনাসদস্য, সরকারি কর্মকর্তা ও বেসামরিক কয়েক লাখ মানুষকে মিথ্যা বিচারের মুখোমুখি করার ঘোষণা দেয় পাকিস্তান। ফলে ভারতের তৎকালীন সরকারের ওপর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও সামরিক চাপের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে পাকিস্তানে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের জীবন রক্ষার্থে ও নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের স্বার্থে এবং সর্বোপরি বিশ্বরাজনীতির তৎকালীন হর্তা-কর্তা-বিধাতাদের চাপে ভারতের নয়াদিল্লিতে ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করে। অভিযুক্ত যুদ্ধবন্দীরা বাংলাদেশের হেফাজতে ছিল না বিধায় বাংলাদেশ এসব যুদ্ধবন্দীর অন্যায্য প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। ভারত সরকারের দায়কে হয়তো লঘু বিবেচনা করা হবে, কারণ নিজ দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তার প্রশ্নকে সে অগ্রাধিকার দিয়েছিল।

আন্তর্জাতিক আইনের আধুনিক স্থপতি ওপেনহেইম যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে বলেছেন, ব্যক্তিগত লালসা, জিঘাংসা ও লাভের জন্য কোনো সৈনিক বা ব্যক্তি নিজ বা শত্রু ভূখণ্ডে প্রযোজ্য সর্বজনীন আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করলে তা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তিনি বিচারের জন্য দোষী বিবেচিত হবেন।[২৩] ওপেনহেইমের মতে, 'যুদ্ধাপরাধ হলো রাষ্ট্রসমূহ এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশগুলোর আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে অপরাধের দায়' (মেহরিস, পৃ. ১৭৫-২১০)। ওপেনহেইম চার ধারার যুদ্ধাপরাধের উল্লেখ করেছেন :

- সামরিক বাহিনীর সদস্য কর্তৃক যুদ্ধের স্বীকৃত কোনো বিধির লঙ্ঘন।
- শত্রু সামরিক বাহিনীর সদস্য নয়, এমন বেসামরিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের সশস্ত্র আঘাত।
- অঘোষিত গুপ্ত হামলা এবং উৎখাতের উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলক গোপন হামলা।
- লুণ্ঠনের অভিলাষে যেকোনো ধরনের হামলা।

ওপেনহেইম তাঁর গ্রন্থে যুদ্ধের ২০টি বিধি উল্লেখ করেছেন, যেগুলো লঙ্ঘন করলে লঙ্ঘনকারী সামরিক বাহিনী বা বাহিনীর সদস্য যুদ্ধাপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবে।[২৪] বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের সমন্বয়ে গঠিত আধা সামরিক বাহিনীসমূহ ওপেনহেইমের নির্দেশিত ২০টি বিধির সবগুলো প্রত্যক্ষভাবে লঙ্ঘন করেছিল।

৭ অক্টোবর ১৯৪২ জাতিসংঘ যুদ্ধাপরাধ কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধীদের অভিযোগের ধরন ও মাত্রার বিচারে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করে। কমিশনের শ্রেণি বিভাজন অনুসারে পাকিস্তানি অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধীদের অনেকের বিরুদ্ধে 'এ' শ্রেণিতে অভিযোগ আনয়ন সম্ভব।[২৫] ১১ ডিসেম্বর ১৯৪৬ সাধারণ পরিষদ ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালে অনুসৃত মূলনীতিগুলো অনুমোদন দিয়ে ৯৫(১) প্রস্তাব পাস করে। ১৯৭১ সালে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের জন্য ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালে অনুসৃত মূলনীতিগুলো অনুসারে অভিযুক্ত পাকিস্তানি সামরিক সদস্যদের বিচার করার ন্যায্যতা বাংলাদেশের থাকলেও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নব্য রাষ্ট্রের বৈধতা অর্জনের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত অপরাপর সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের স্বীকৃতির রাজনীতির কারণে এবং আন্তর্জাতিক সর্বজনীন বিচারব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নে খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেনি।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে জেনোসাইড অপরাধ মানব ইতিহাসে নতুন কোনো বিষয় নয়। মধ্যযুগে রোমে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেনোসাইড সংঘটিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার ইহুদিদের বিরুদ্ধে জেনোসাইড অপরাধ করেছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা জেনোসাইড অপরাধ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিতের পর ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ২৬০ক (৩) প্রস্তাবের মাধ্যমে জেনোসাইড কনভেনশন সর্বসম্মতভাবে সাধারণ পরিষদে অনুমোদন করে। জেনোসাইড মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধসহ আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচারের জন্য একটি সর্বজনীন বিচারিক আদালত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৭১ সালে এবং পরবর্তী কয়েক বছরেও এই বিচারিক আদালত পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আন্তর্জাতিক বিচারিক কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতি রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক কূটকৌশল-সংশ্লিষ্ট জেনোসাইড, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের মতো আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচার-প্রক্রিয়াকে অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে দিয়েছিল। ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘ আয়োজিত জেনোসাইড-বিষয়ক সম্মেলনে তৎকালীন বিদগ্ধ আইনজ্ঞরা জেনোসাইডের একটি সর্বজনীন সংজ্ঞা প্রদান করেন। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, জেনোসাইড

বলতে কোনো জাতিগত, নৃতাত্ত্বিক, বর্ণগত অথবা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করার প্রবৃত্তি হতে সম্পাদিত নিম্নে বর্ণিত যেকোনো কর্মকাণ্ডকে নির্দেশ করা হবে—

ক. জাতি বা গোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা করা।
খ. জাতি বা গোষ্ঠীর সদস্যদের মারাত্মক শারীরিক বা মানসিক ক্ষতিসাধন।
গ. উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোনো গোষ্ঠীকে সমূলে বা আংশিকভাবে নিধনের জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাপ্রসূত আরোপিত ব্যবস্থাপনা।
ঘ. জাতি বা গোষ্ঠীর বংশগতি রোধে আরোপিত ব্যবস্থাপনা।
ঙ. জোরপূর্বক কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর শিশুদের অন্য জাতি বা গোষ্ঠীতে স্থানান্তর।

এই সম্মেলনের গৃহীত ঘোষণার প্রথম অনুচ্ছেদ অনুসারে, যুদ্ধাবস্থায় বা শান্তিকালীন যেকোনো সময়ে সংঘটিত জেনোসাইড শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং চতুর্থ অনুচ্ছেদ দ্বারা শাসনতান্ত্রিক প্রধান, সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা হয়েছে। জেনোসাইড সম্বন্ধীয় দুটি বিষয় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। প্রথমত, জেনোসাইড সংঘটনে রাষ্ট্রীয় প্রধানের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ জরুরি নয়, যদি তাঁর অধস্তনদের সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়। অধস্তনদের দ্বারা যদি জেনোসাইড অপরাধ সংঘটিত হয়, তবে তাদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা ও অপরাধের জন্য সরকারপ্রধানও সমভাবে দায়ী।

মানবতার দায়মুক্তির বিচার অনিবার্য

সন্দেহাতীতভাবে পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালিদের এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনসাধারণের প্রাপ্য বেসামরিক ব্যক্তিদের অব্যাহতি বিষয়ক বিধি লঙ্ঘন করেছে এবং ১৮৯৯ সালের দ্বিতীয় হেগ কনফারেন্স এবং ১৯০৭ সালের চতুর্থ হেগ কনফারেন্সের অনেকগুলো অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করেছে।[২৬] জাতিসংঘের সনদের মূলনীতিগুলো অনুসারে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী বাংলাদেশে যা ঘটিয়েছে, তা কোনোভাবে ন্যায্যতা পায় না। উপরন্তু পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশে সংঘটিত জেনোসাইডের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত ও প্রকাশিত সংবাদ ও প্রতিবেদন অনুসারে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা। মাদ্রিতে ১৯৩৩ সালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে কোনো নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয় ও সামাজিক গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার অপচেষ্টাকে আন্তর্জাতিক আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়।[২৭] রাফায়েল ল্যামকিন তাঁর 'অ্যাক্সিস রুল ইন অকুপাইড ইউরোপ' (১৯৪৪) গ্রন্থে জেনোসাইডের সংজ্ঞায়নে

বলেন, 'পদ্ধতিগতভাবে কোনো জনগোষ্ঠীকে বা জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস।'[২৮] ল্যামকিনের সংজ্ঞানুসারে বাংলাদেশ জেনোসাইডকে যথার্থ বা আদর্শ জেনোসাইড বলা যেতে পারে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সর্বসম্মতভাবে জেনোসাইডকে মানবজাতির বিরুদ্ধে অপরাধ ঘোষণা করে ১১ ডিসেম্বর, ১৯৪৬ ৯৬(ঝ) প্রস্তাবটি পাস করে। জেনোসাইড কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৬ অনুসারে অপরাধের প্রশ্নে সমকালীন আন্তর্জাতিক বিচারব্যবস্থার ক্ষমতা রয়েছে বিচার করার যত দিন পর্যন্ত অন্য কোনো বিচারিক অবকাঠামো তৈরি না করা হয়। জাতিসংঘ যদি সংক্ষুব্ধ দেশগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের অনুপস্থিতিতে বিকল্প আন্তর্জাতিক বিচারব্যবস্থার আয়োজনে অসমর্থ হয়, তবে যে দেশে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সে দেশ নিজস্ব উদ্যোগে জেনোসাইড অপরাধ বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে পারবে (মেহরিস, পৃ. ১৭১)। মানবাধিকার-বিষয়ক কমিশনের ২১তম অধিবেশনে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের সংজ্ঞায়ন জটিলতা সমাধানের প্রয়াস নেওয়া হয়। কমিশনের সদস্যদের মতে, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিচার ও দণ্ডাদেশ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে জনমনে আস্থা বিনির্মাণে মানবাধিকার ও মানবতার স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করবে।[২৯]

বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে যা ঘটেছে তা জেনোসাইড ভিন্ন কিছু নয়। হিটলার জার্মানি ও পোল্যান্ডে তাঁর জাতিগত ঘৃণার যে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন, তার সঙ্গে কেবল বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি নৃশংসতা ও হত্যাযজ্ঞ তুলনীয়। পাকিস্তানিদের নৃশংসতা ও পাশবিকতায় তাদের অপরাধ উদ্দেশ্য (মেনস রে) স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে (মেহরিস, পৃ. ১৭৩)। ন্যুরেমবার্গে অনুসৃত 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও যথার্থভাবে প্রযোজ্য। আইন, মানবতা ও ন্যায়ের স্বার্থে যুদ্ধাপরাধের বিচার করা অনিবার্য। যুদ্ধাপরাধের বিচার অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে হওয়া উচিত, প্রতিশোধস্পৃহা থেকে নয়। বিচার যেমন হিংসাত্মক হতে পারে না, তেমনি অহিংস হতে পারে না। সাধারণ অপরাধের পরিস্থিতি এবং যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের পরিস্থিতি এক মানদণ্ডে বিচার্য নয়। দণ্ডের উদ্দেশ্য সম্পর্কে হুগো গ্রোসিয়াস বলেছেন, 'হয়তো এটি অপরাধী, ক্ষতিগ্রস্ত এবং সম্প্রদায়ের ভালোর জন্য।'[৩০]

যুদ্ধবন্দীদের পরিবারগুলো তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রত্যাবর্তনের জন্য মুখিয়ে থাকবে—সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ওই সব যুদ্ধবন্দীকে যুদ্ধাপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর একটিই প্রার্থনা থাকে, দোষীদের বিচার ও শাস্তি বিধান। শুধু সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা পরিবারের জন্য নয়, মানবতার বৃহত্তর স্বার্থে জেনোসাইড, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত যেকোনো অপরাধের বিচার অপরিহার্য। নচেৎ মানব ইতিহাসে এ ধরনের পাশবিক ও নৃশংস অপরাধের পুনরাবৃত্তি নিরোধ

সম্ভব নয় (মেহরিস, পৃ. ১৭৪)।

পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন অনুসারে অপরাধের বিচার যখনই সুযোগ তৈরি হোক না কেন সম্পন্ন করা উচিত। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে আন্তর্জাতিক অপরাধ অন্যান্য অপরাধের চেয়ে দ্রুতগতির প্রচার ও প্রসার পায়। আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহকে বিচার-প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে না এলে এই অপরাধের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা থাকে। এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মীরা স্বভাবত জড়িত থাকে বলে প্রায়ই অপরাধের অস্বীকৃতির রাজনীতি লক্ষ করা যায়। অস্বীকৃতির রাজনীতিকে প্রকারান্তরে সর্বজনীন মানবতার বিরুদ্ধাচরণ বা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ আখ্যায়িত করা যায়। আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচার প্রশ্নে স্বভাবজাতভাবে অপরাধীর স্বরাষ্ট্র আগ্রহী হয় না, কারণ সংঘটিত অপরাধের সঙ্গে প্রায়ই রাষ্ট্রযন্ত্রের সম্পৃক্ততার প্রমাণ মেলে। কিন্তু যেকোনো জাতিরাষ্ট্রের অপরাধের দায় থেকে অবমুক্ত হওয়া উচিত। কোনো সভ্য ও মানবিক জাতি নিশ্চয়ই চাইবে না তারা হন্তক পাশবিক জাতি হিসেবে বিশ্ব ইতিহাসে পরিচিত হোক। বিচারের সঙ্গে দণ্ডাদেশের ওতপ্রোত সম্পর্ক থাকলেও বিচার সম্পন্ন করা প্রাধিকারযোগ্য। যুদ্ধাপরাধ ও জেনোসাইডের জন্য শাস্তি প্রদানে সমর্থ না হলেও অন্তত অভিযোগ প্রমাণ সাপেক্ষে ভর্ৎসনা ও দণ্ডাদেশ ঘোষণা করা উচিত। মানবতার দায়মুক্তির জন্য বিষয়টি অপরিহার্য।

তথ্যসূত্র :

১. Devid Loshak, Pakistan Crisis, London, 1971, P. 59.

২. Guardian (Manchester), June 5, 1971.

৩. Government of India, Ministry of External Affairs, Bangla Desh Documents, P. 446.

৪. প্রাগুক্ত।

৫. Institute for Defence Studies & Analyses, News Review on Pakistan, Pak 5/71, P. 21.

৬. Statement of Hendrik Van Der Heijden, Economist, Pakistan Division of the World Bank, included in Thousand My Lais published by Society for Human Rights, Bangla Desh.

৭. http://www.globalsecurity.org/military/world/war/argentina.htm

৮. Rummel, R J. "*Death by Government".* New Brunswick and London: Transaction Publishers, 1994.

৯. Lickttenstein, Grace. "Armey Expels 35 Foreign Newsmen from Pakistan", *The New York Times*, March 28, 1971.

১০. Bangla Desh Documents, P. 387-388.

১১. The *Hindustan Times*, New Delhi, January 16, 1972, P. 1.

১২. প্রাগুক্ত।

১৩. *The Hindustan Times*, New Delhi, January 22, 1972, P. 1.

১৪. *The Hindustan Times*, New Delhi, January 18, 1972, P. 1.

১৫. *The Hindustan Times*, New Delhi, January 22, 1972, P. 1.

১৬. নিউইয়র্ক *টাইমস*, ৩০ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ৩।

১৭. "India opens way for Dacca trials", *The New York Times*, March 18, 1972, P. 1.

১৮. *The Hindustan Times*, New Delhi, April 8, 1972, P. 1.

১৯. প্রাগুক্ত।

২০. "India to deliver 150 P.O.W.'s to Bangladesh to face trial", *The New York Times*, June 15, 1972, P. 11.

২১. "A veto by Peking", *The New York Times*, August 27, 1972; P. E3.

২২. "Bhutto threatens to try Bengalis held in Pakistan", *The New York Times,* May 29, 1973; P. 3

২৩. Maj Gen Sukhwant Singh AVSM, "India's Wars Since Independence", Lancer International, USA, Pp. 536-538.

২৪. L. Oppenheim, International Law, Vol. 2 (Ed. By H. Lauterpacht, 7th ed., London, 1952). Pp. 566-567.

২৫. প্রাগুক্ত, P. 567.

২৬. প্রাগুক্ত, Pp. 567-568.

২৭. History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of the Laws of War, London, His Majesty's Stationery Office, 1948.

২৮. International Law Reports, Vol. 36 (1968), P. 32.

২৯. প্রাগুক্ত।

৩০. প্রাগুক্ত, P. 27.

লেখক পরিচিতি

নুরুল ইসলাম

একজন উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিতে স্নাতক নুরুল ইসলাম ১৯৫৫ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিকসে (যা পরে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে পরিণত হয়) পরিচালক পদে যোগদান করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি বাংলাদেশ প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হন। ১৯৭৫ সাল থেকে পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ফেলো এবং FAO-এর সহকারী মহাপরিচালক ছিলেন। বর্তমানে অধ্যাপক ইসলাম ওয়াশিংটনে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (IFPRI) একজন উপদেষ্টা ও ইমেরিটাস ফেলো হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি এখন পর্যন্ত ২৫টি বই প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন জার্নাল ও বইয়ে অসংখ্য নিবন্ধ, গবেষণা ও নীতিপত্র লিখেছেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : *Development Planning in Bangladesh: A Study in Political Economy (1979, reprinted in 1993), Foodgrain Price Stabilization in Developing Countries: Issues and Experiences in Asia (1996), Making of a Nation Bangladesh: An Economist's Tale (2003), Looking Outward: Bangladesh in the World Economy (2005).*

পাভেল পার্থ

লেখক ও গবেষক। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা—মধুপুরের প্রাণবৈচিত্র্য, অরণ্যের লড়াই, খাদ্য-লঙ্ঘন ও লড়াই, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা, কৃষকের বীজ অধিকার ইত্যাদি। ছোট কাগজ, জার্নাল ও নানান স্থানীয় প্রকাশনাসহ পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেন। বারসিক নামক লোকজ্ঞানবিষয়ক একটি বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

মোহাম্মদ আতিক রহমান

সহকারী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে পিএইচডি গবেষণারত, ডিপার্টমেন্ট অব কনফ্লিক্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, গেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, বেলজিয়াম। গবেষণার বিষয়বস্তু : প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা, উন্নয়নমূলক স্থানান্তর/বাস্তুচ্যুতি এবং গণপ্রতিরোধ ও সহিংসতা।

অ্যালেন ব্যাল

ভিইউ ইউনিভার্সিটি আমস্টারডাম-এর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক। তিনি ২০০০ সালে ইরাসমাস ইউনিভার্সিটি রটরডাম থেকে ইতিহাস বিষয়ে পিএইচডি সম্পন্ন করেন এবং পিএইচডির বিষয় ছিল বাংলাদেশের গারো সম্প্রদায়। তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম ছিল 'তারা জিজ্ঞেস করে আমরা ব্যাঙ খাই কিনা : বাংলাদেশের গারো নৃগোষ্ঠী'। গবেষণার বিষয় : দক্ষিণ এশিয়া, বাংলাদেশ, ভারত, নৃতত্ত্ব এবং বহুত্ববাদ, অভিবাসন, আদিবাসী জনগোষ্ঠী ইত্যাদি।

আবুল মোমেন

কবি, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা—বাঙালির আধুনিকতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ (সময়, ২০০৯); বাংলাদেশের হৃদয় হতে (প্রতিক্ষণ, ১৯৯৯); বাংলা ও বাঙালির কথা (সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৫)।

আসজাদুল কিবরিয়া

লেখক ও সাংবাদিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন। অর্থনীতি বিষয়ে লেখালেখি বেশি করেন। ইতিহাসে আগ্রহী। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : *অর্থনীতির অনর্থ* (জাগৃতি প্রকাশনী, ২০১৪); *ট্রানজিটের টানাপোড়েন* (জাগৃতি, ২০১২)। *ভাষা আন্দোলনের গল্প* (প্রজাপতি, ১৯৯৪) গ্রন্থের জন্য পেয়েছেন অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার।

মো. ফজলে রাব্বি

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাস, ক্ষুদ্র রাষ্ট্র অধ্যয়ন, মিয়ানমার, আর্কাইভস এবং সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণারত। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক দ্বৈমাসিক পত্রিকা *ফরেন অ্যাফেয়ার্স ইনসাইটস অ্যান্ড রিভিউস*-এর (এফএআইআর) সদস্য সম্পাদক এবং ল্যাঙ্কেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়-ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ গবেষণা প্রকল্পে জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহযোগী হিসেবে কর্মরত আছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়ন করেছেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে *প্রতিচিন্তা*র গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। অফিসে সরাসরি উপস্থিত হলেই শুধু নগদ টাকা গ্রহণ করা হবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ২০০ (দুই শত) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ (চার শত) টাকা ও ৬০ (ষাট) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/ বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/ দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/ পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি রসিদ দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ (সিএ ভবন), কারওয়ান বাজার
ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৮১